মুক্তিযুদ্ধে
বাংলার নারী

কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ
বীর প্রতীক

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মা-বোন ও নারী যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। যোদ্ধা-লেখকদের নিজের লেখা-জানা-উপলব্ধি-সাক্ষাৎকার এবং অকুস্থল পরিদর্শনের বাইরে বিশেষ কিছু নেই গ্রন্থের বর্ণনায়। তবে অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা নারীদের অবদান ও কৃতিত্বের বর্ণনায় তিনি একজন সফল পর্যবেক্ষক ও হৃদয়বান মানুষের পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের একাংশের গৌরবগাঁথাই **'মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী'**।

লেখক কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ-এর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৬ অক্টোবর, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার কৈলাইন গ্রামে, সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম জমিদার পরিবারে। তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৮ নং সেক্টরের 'ই' কোম্পানিসহ ৫ নং গেরিলা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত হন। লেখক একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেনাসদর, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন এবং আর্মি স্কুল অব এডুকেশন এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন-এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি আই.ইউ.বি.এ.টি.-তে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলা একাডেমীসহ বিভিন্ন বিদ্বত সংঘের সঙ্গে জড়িত।

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | লেখক

প্রকাশকাল | মার্চ ২০০৩
ফাল্গুন ১৪০৯

প্রচ্ছদ | রায়হান জামিল

বর্ণবিন্যাস | কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | একশত বিশ টাকা মাত্র

MUKTIJUDDYE BANGLAR NARI [Women of Bengal in the War of Liberation]—by Colonel (Retd.) Mohammad Shafique Ullah, BP. (b. 1941-) Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : March 2003
Price : Tk. 120.00 only.
ISBN 984-11-0550-9

উৎসর্গ–

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সাহসিনী বীরাঙ্গনা
ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণাদায়িনী
মা-বোন-বধূদের পাদপদ্মে

তব্য গ্রন্থ

যুদ্ধে চট্টগ্রাম

যুদ্ধে কুমিল্লা

যুদ্ধে নৌ-কমান্ডো

সেক্টর কমান্ডারের শুভেচ্ছা বক্তব্য

১৯৭০ এর সমাপনী মাস ডিসেম্বর। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালিদের জয়জয়কার। জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের ১৬৮টি তথা মেজরিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দখলে। সঙ্গত কারণেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবেন আওয়ামী লীগ। আর, পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হবেন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২২ বছরের ইতিহাসে এটাই হবে বাঙালিদের অভিষেক। বিচ্ছিরি ব্যাপার! "ইয়ে হো নেহি সেকতা"–পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বুলন্দ আওয়াজ–"প্রজার জাত রাজা হতে পারে না। শুরু হলো নির্বাচনী ফলাফল বাঞ্চাল করার ভয়াবহ তৎপরতা। আর, তারই নীল নক্সাপ্রসূত 'অপারেশন সার্চলাইট' নিরস্ত্র বাঙালির ওপর শতাব্দীর ভয়াবহতম গণহত্যা। সময় একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত ১২ টা ১ মিনিট।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসক লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান (কসাই টিক্কা নামে খ্যাত) কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রদত্ত দাম্ভিক আশ্বাসবাণী "দো-চার লাখ বাঙালি খতম করনে ছে ছব কুছ ঠাণ্ডা হো যায়েগা"। রাত ১২টার পর থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে পাকিস্তান জল্লাদবাহিনী লক্ষ লক্ষ বাঙালি খতম করলো বটে, কিন্তু টিক্কার দেওয়া আশ্বাস মাফিক বাঙালি 'ঠাণ্ডা' তো হলোই না বরং "যার যা আছে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে–মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে দেশব্যাপী প্রতিরোধ। শুরু হলো বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র অধ্যায়, মুক্তিযুদ্ধ। প্রাথমিকভাবে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ ও ইপিআর সদর পিলখানায় বাঙালি সৈনিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ। পরিস্থিতির সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই দেশের চতুঃসীমায় নিয়োজিত ইপিআর কর্তৃক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা সংগঠন তৈরি হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ত্বরিৎ সৈনিকদের একত্রিকরণ ও সংগঠনোত্তর নেতৃত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে দেশের ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, কামার-কুমার, কন্যা-জায়া-জননী, তথা সর্বস্তরে জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণে "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে" ৯ মাসের যুদ্ধেই পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করে একটি 'স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র–বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স আজ ৩২ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার ওপর রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে অনেক বই, অনেক সংকলন। যোদ্ধারাও অনেকে বই লিখেছেন তাঁদের যুদ্ধকৌশল ও অভিজ্ঞতার আলোকে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর ভূমিকাও যে একটা অতিসহায়ক শক্তিরূপে আমাদের যুদ্ধে অবদান রেখেছে তার স্বীকৃতি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মৎ প্রণীত 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বইতেও মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

অবহেলিত। কোথাও সামান্যতম গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের এই ত্রুটি বিচ্যুতি, আমাদের এই ব্যর্থতার গ্লানি কিঞ্চিত হলেও লাঘব করতেই প্রকাশিত হচ্ছে আমার যুদ্ধসঙ্গী কর্নেল (অব:) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক রচিত এবং জনাব মোহাম্মদ সা'দাত আলী সুসম্পাদিত "মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী"। সন্দেহ নেই যে এই বইটি মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর অবদান নামক অবহেলিত দিকটি জাতির কাছে উন্মোচিত করবে। এর পূর্বে, মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, বীর প্রতীক-এর কথা অনেক দেরিতে হলেও আমরা জানতে পেরেছি, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বদৌলতে ক্যাপ্টেন সেতারা বেগমের কথাও জাতি অনেকপূর্ব থেকেই অবগত। কর্নেল মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক-এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক অজানা তথ্য আমাদের কাছে উন্মোচিত। এর দ্বারা ইতিহাস- পিপাসু প্রজন্ম তথা জাতীয় ইতিহাস রচনায় ইতিহাসবিদগণ অবশ্যই গবেষণার উপাদান খুঁজে পাবেন, জাতি উপকৃত হবে।

কর্নেল (অব:) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক একজন অসামান্য মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য বলতে গেলে শূন্য হাতে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন, স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবও পেয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অপূর্ণতার কথা চিন্তা করেই তিনি এই দুরূহ কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন যার জন্যে জাতি তাঁর কাছে ঋণী হয়েই থাকবে। বইটির উপাদান সংগ্রহ করায় যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছেন তারাও জাতির কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনাসহ বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ধানমন্ডি, ঢাকা
৩০ জানুয়ারি ২০০৩

লেঃ কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী
মুক্তিযুদ্ধে ৮ নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক

মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বাংলার মা-বোন-বধূদের অবদান অপরিসীম। একটি মাত্র গ্রন্থের সীমিত কয়েকটি পাতায় কিছু উচ্ছ্বাসভরা কথা লিখলেই তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি শেষ হয়ে যায় না। তবু লিখতে হয়। কারো মহত্তম অবদানকে স্বীকার করে নেওয়ার এটাই সহজতম রীতি।

এই গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীদের অবদানের কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়; অকথিত, বিস্মৃত ও বিলীয়মান অধ্যায়ের একটি খণ্ডিত চিত্র মাত্র। স্মৃতির প্রতারণার কারণে নিজের দেখা অনেক মা-বোনের সীমাহীন আত্মত্যাগের কাহিনী বাদ পড়েছে। সবকিছু লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বয়স বড় একটি বাধা। জীবনের পড়ন্ত বেলায় সে-সবের গ্রন্থনা আর সম্ভব না-ও হতে পারে। একাত্তরের বাংলার মা-বোনেরা এবং পরবর্তী প্রজন্মের সন্ধিৎসু তরুণী-তরুণেরা আমাকে ক্ষমা করবেন।

একাত্তরে বাংলার যে-সব কন্যা-জায়া-জননী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছেন, তাঁদের বীরত্বের কাহিনী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অব্যক্ত রয়ে গেছে। জীবিত গেরিলাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণে সে-সব আজ বিলুপ্তির পথে। অজপাড়াগাঁর আমাদের যুদ্ধাঞ্চলগুলির মা-বোনদের অবদানের কথা গ্রন্থিত হলে এক বেদনাবিধুর অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চের চেয়েও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রোমাঞ্চিত কাহিনী হয়ে সংরক্ষিত হতো। একটি সত্য ঘটনার বিবরণ হাচন রাজা ও ময়মনসিংহ গীতিকা-ধর্মী কাহিনীকে ম্লান করে দিতো

"কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি,
শুনিয়া জগত রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

বাংলার বীর যোদ্ধা-রমণীগণ, আমি শুধু সন্ধ্যা পিদিম জ্বালিয়ে গেলাম। বাকি কাজটা পরবর্তী প্রজন্মের কেউ করার দায়িত্ব নিলে একটা সময়ে পূর্ণাঙ্গ না হোক, অন্ততঃ কাছাকাছি একটা চিত্র উপহার পাবে বাংলাদেশের সন্ধিৎসু পাঠক-গবেষক।

বিভিন্ন সময়ে আমার লেখা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণে নারী যোদ্ধাদের অবদান এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক। নিজের দেখা-জানা-উপলব্ধি-সাক্ষাৎকার-অকুস্থল পরিদর্শনের বাইরে বিশেষ কিছু এ-বইতে নেই।

'বাংলার বধূ বুক ভরা মধু'র বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না। তাঁদের এখন তো আর ফাটার কিছু বাকি নেই। একাত্তরের দুর্গ্রহের স্মৃতিজড়িত বর্বরতার শিকার বাংলার দু'লক্ষ মা-বোনের স্মৃতি কি ভুলা যায়? একাত্তরের কুলবধূ নারীরা এবার জাগুন। আপনাদের হাতে নিয়েছি অনেক, দিইনি কিছুই। অনেকের নাম জানা তো দূরের কথা,

চেহারাও দেখিনি। অথচ আপনাদের অবদান ধন্য বাংলার এই স্বাধীনতা। আপনাদের অরক্ষিত রেখে, সতর্কতা সংকেত না দিয়ে, নির্মম নিয়তির হাতে রেখে দেশ ছেড়ে পালিয়েছি। আজ যতো তন্ত্রমন্ত্রই উপহার দেওয়া হোক না কেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সে ব্যর্থতা কিংবা অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে।

যার যতো বড়াই স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, পরাধীন ভূমিতে সশক্তিতে নিজস্ব সম্পদে লড়া স্থানীয় গেরিলা যোদ্ধাদের সালাম জানাই। যুদ্ধদিনের শুরুতে নেতৃত্বহীন নেতিয়ে পড়া জনতার মনোবল চাঙা রেখেছিলেন অভ্যন্তরীণ স্থানীয় গেরিলা যোদ্ধাগণ। তাঁরা সকলে নমস্য। কারো না-খোশ হবার কিছু নেই, স্বাধীনতা যুদ্ধে যার যা অবদান তাকে তা দিতেই হবে।

বিদেশের মাটিতে এক কোটির মতো শরণার্থীর মধ্যে কতোজন নারী, কতোজন পুরুষ সে হিসাব নিলে বোঝা যাবে, কারা কতোটা সাহসী। কে ভেগেছে কার আগে! ২৫শে মার্চের প্রথম ধাক্কায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টগুলির আশপাশে নারীদের ওপর অত্যাচারের যে ধকল গেছে, সে-সব ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য। শত্রু-কবলিত বাংলায় অরক্ষিত মা-বোনের টিকে থাকার, বেঁচে থাকার, দুঃখ-বেদনার, আত্মত্যাগের কাহিনীর বিশেষ কিছুই গ্রন্থিত হয়নি। আমরা সেনানিবাস থেকে পলাতক, বাড়ি-ঘর,মা-বোন-নারী-সন্তানদের অরক্ষিত রেখে পলায়ন করা লোকরাই আবার এসে উঠেছি, যেখানে যাকে রেখে পালিয়েছিলাম। যুদ্ধকালে আমাদের আশ্রয় দিয়ে কতো মা-বোন নিজের জীবন দিয়েছেন, সয়েছেন অকথিত অত্যাচার, হারিয়েছেন সহায়-সম্পদ-ইজ্জত। সপ্তকাণ্ড রামায়নে উপেক্ষিতা লক্ষ্মণ-উর্মিলার মতোই তাঁরা উপেক্ষিতা। যশোরের খরদহ ঘাটের যুদ্ধে গেরিলা নারীর সম্মিলিত যুদ্ধে পাক আর্মি পালায়। তখন রোজার দিন। বিক্ষুব্ধ মহিলারা আমাকে ঝাঁটাপেটা করে। খাবার দিতে অস্বীকার করে। বেটায় যদি যুদ্ধ জানতো তবে এমন প্যাঁচকল থেকে পাক আর্মি পালায় ক্যামনে? ছোটবেলায় মায়ের হাতের নারিকেল শলার পিটনি খেয়েছিলাম ঠ্যাটামির জন্য, কপোতাক্ষি তীরের মহিলাদের দেয়াটা আমার প্রাপ্য ছিলো অযোগ্যতার জন্য। এমনি করে লম্ফ-ঝম্ফের যোদ্ধাদের বাংলার নারী যোদ্ধারা ঝাঁটাপেটার চাবকানি দিলে "জাগিয়ে দেরে চাবুক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন"।

কনভেনশনাল বা প্রথাগত যুদ্ধ-ব্যর্থতার পর গেরিলা যুদ্ধে পরাধীন বাংলার গভীরে প্রবেশ না করলে বাংলার মা-বোনের যুদ্ধ চেতনার প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যেতাম। মা-বোনের গেরিলাপ্রীতি ও গেরিলা-আশ্রয়ে ধন্য মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১। নিজেদের নিয়মিত সেনাদের হিসাব মেলাতেই আমরা গলদঘর্ম। প্রত্যেকে মনে করে, তিনিই বীর। অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধা ও নারী যোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের গ্রন্থনা সত্যিই দুরূহ। দুঃসাধ্য, তবে অসাধ্য নয়। একবার শুরু হলে, সবটা না হোক, অনেকটা বাঁচবে বিস্মৃতির হাত থেকে। যতোদিন ১৯৭১ এর যুদ্ধকালীন বাংলার মা-বোনের, যোদ্ধা নারীর অবদান সংযোজিত না হবে, ততোদিন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী

ইতিহাস থাকবে অপূর্ণ। আমাদের মা-বোনদের অবদানের ইতিহাস রচনা করে জানাতে হবে, একাত্তরে তাঁদের অবদান আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। সত্যিকথা কি, অন্তত আমি বিশ্বাস করি, সে-সময়টায়, যখন বাংলার মায়েরা নিজেরা অযুত গেরিলাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, তখন তাঁদের এই সহযোগিতা না পেলে আরো বহু বছর এই স্বাধীনতা প্রলম্বিত হতে পারতো। তাই প্রাণ খুলে আজ গাই মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীর জয়গান।

এ-গ্রন্থ রচনায় তথ্য সরবরাহ, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সার্বক্ষণিক সাহায্য-সহযোগিতা করে যাঁরা আমায় ঋণী করেছেন, তাঁদের জানাই প্রীতি-ভালোবাসা। [illegible] স্ত্রী নাছিমা আখতার পারভীন, একমাত্র জীবিত পুত্র ক্যাপ্টেন সাইফউল্যা ও পুত্রবধূ [illegible] জোৎস্না আরা–অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম। এই লেখার পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে তাঁদের অশ্রুমোচনের দীর্ঘশ্বাস লেখার প্রতি আমাকে বিশেষভাবে বিশ্বস্ত রেখেছে। বিশেষ করে অনুজপ্রতিম লেখক-গবেষক ও অত্র গ্রন্থের সম্পাদক মোহাম্মদ সা'দাত আলীকে জানাই প্রাণ-ভরা আশীর্বাদ, তাঁর এমন উৎসাহভরা উদ্দীপিত প্রাণ-চাঞ্চল্য জীবনভর অটুট থাকুক, এ-দোয়াই করি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী অনুগ্রহপূর্বক বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে আরো ঋণী করলেন। আজ এইদিনে তাঁকে জানাই একান্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশ কালে মনে পড়ে স্নেহাস্পদা মাহবুবা খাতুন ও নাসরিন আক্তার-এর কথা। তাঁরা পেন্সিলের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে কষ্ট স্বীকার করে পুরো গ্রন্থটি কম্পোজ করেছেন। তাঁদেরও আজকের আনন্দের অংশিদার ঘোষণা করছি। পরিশেষে, অখ্যাত লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় প্রকাশক পুত্রপ্রতিম মেছবাহউদ্দিন আহমদকে জানাই প্রীতিভালবাসা। মহান আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ করুন।

মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক

ট্রেজারার
আই.ইউ.বি.এ.টি.
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

সম্পাদকের কথা

বাঙালি-হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত একটি শব্দ 'মুক্তিযুদ্ধ'। পাকিস্তানি শাসকদের নিকট থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করার জন্য, পরাধীনতার শৃংখল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য, একটি স্বাধীন দেশের জন্য, একটি পতাকার জন্য, জাতির অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সম্মিলিতভাবে লড়েছিলো পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে, ১৯৭১ সালে। তার নাম মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের সেনানীরা জাতীয় বীর। যে-যেভাবেই অংশগ্রহণ করে থাকুন, যাঁদের অবদান রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, তাঁরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়। জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাঁদের। কিন্তু এর জন্য আবশ্যক তাঁদের কীর্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যাওয়া। নিরপেক্ষ ইতিহাসবেত্তারা এসব গবেষণা করে ভবিষ্যতে রচনা করবেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস। আমরা সেই কাহিনীর যোগানদার মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধে কোনো দল বা গ্রুপের একক অবদান পৃথক করার সুযোগ নেই। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-যেভাবে সম্ভব লড়েছেন। এঁদের একটা অংশ 'বাংলাদেশের নারী'। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীদের সেই কৃতিত্বের কথা ও বীরত্বগাঁথা গীত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এটি রচনা করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-অধ্যাপক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক। আমি তাঁর কথা ও কাহিনী গ্রন্থনায় শরিক হতে পেরে আনন্দিত। গ্রন্থের প্রয়োজনে কোথাও শব্দের গাঁথুনিতে মালা গাঁথতে সাহায্য করেছি। গ্রন্থের প্রকাশকালে এ-কারণেই আমার তৃপ্তি।

'মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী' ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, শুধুমাত্র লেখকের দেখা ও তাঁর ফ্রন্টের যোদ্ধাদের কাহিনী দু'একজন এসেছেন সহকর্মিদের বর্ণনায় এবং কাহিনী-চরিত্রের আপন মহিমাগুণে।

সময়ের স্বল্পতা না থাকলে এ-গ্রন্থ কলেবরে আরো বৃহৎ হতে পারতো। অনেক কথা ও কাহিনী রিজার্ভ থাকলো পরবর্তী সংস্করণের জন্য। জেনেশুনেই করা হয়েছে এ-কাজটি। কিছু যোদ্ধাদের কথা লিপিবদ্ধ করতে সময় নিচ্ছেন লেখক পুনরায় তথ্য যাচাইয়ের স্বার্থে। কথাটি আমি বলতে চেয়েছি শুধুমাত্র গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা বোঝাতে।

আমার ধারণা, বইটি প্রচণ্ড পাঠক-প্রীতি পাবে। বিশেষ করে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বইটি হবে অবশ্য পাঠ। গ্রন্থনায় কোথাও যদি দুর্বলতা থেকে থাকে, সে দায় সম্পাদকের। 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী' গ্রন্থটির সফল প্রচারের অপেক্ষায় থাকলাম।

মোহাম্মদ সা'দাত আলী

লাইব্রেরি এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী ❑ ১৩ – ৬২

খালেদা জিয়া/১৫ ✪ ফজিলাতুন্নেসা/১৫ ✪ বার আউলিয়ার মাজেদা খাতুন /১৭ ✪ বেগম হিমাংশু ব্যানার্জি / ১৭ ✪ নড়াইলের বীর কন্যা ১১ নারী/ ১৭ ✪ আলেখার চরের ছাফেরা খাতুন/১৮ ✪ জাহানারা/১৮ ✪ নেছারন ও রিজিয়া খাতুন/১৯ ✪ নাদিরুন্নেসা/২১ ✪ কুসুম কুমারি/২২ ✪ আতিমা আনোয়ার/২৪ ✪ বেগম আতিয়ার/২৪ ✪ গোলাপজান/২৫ ✪ নাছিমা আখতার পারভীন/২৮ ✪ মঙ্গল রানী /৩২ ✪ সূর্যবান/৩৩ ✪ শামসুন্নাহার রাব্বি/৩৫ ✪ মহিলাদে পতাকা যুদ্ধ / ৩৫ ✪ মমতাময়ী আমিরুন্নেসা/৩৬ ✪ হরিণাকুন্ডের হারু-চাঁদ/৩৯ ✪ আইচপাড়ার বীরাঙ্গনা ছুরমান বিবি/৪৩ ✪ মুক্তিযুদ্ধে লাইলি/৫৭ ✪ লাউডুবির যোদ্ধা রমণী/৫৯ ✪

ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম, বীর প্রতীক ❑ ৬৩
তারামন বিবি, বীর প্রতীক ❑ ৭০
মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি ওরফে নূরজাহান ❑ ৭৫
মুক্তিযুদ্ধে রওশন আরা ❑ ৮৬
অগ্নি কন্যা নাজিয়া ওসমান ❑ ১০৭
বীরাঙ্গনাধন্য হেমায়েত বাহিনী ❑ ১২৭
পয়সার হাটে মুক্তি হাসপাতাল ❑ ১৩২
হোমফ্রন্টে মুক্তিযুদ্ধ ❑ ১৪৫

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী

"কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কতো বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা"।

সাধারণ মানুষের অনেকেরই ধারণা যে, মুক্তিযুদ্ধ কেবল করেছে পুরুষেরা। পুরুষ শাসিত সমাজের এমন ধারণা প্রকৃতার্থে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা অস্বীকার করারই নামান্তর। চোখের সামনে কতো বধূর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। স্বামী হারা, সন্তানহারাদের অহর্নিশ ক্রন্দন আজো থামেনি। কতো মা, কতো বধূ আজো প্রিয়জন হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদ। একটু সহায়ের উদ্দেশে ঘুরে পথে পথে দ্বারে দ্বারে, সম্বলহীনের মতো। কে রাখে এদের খবর? মুক্তিযোদ্ধাদের আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে, কিসের জন্য লড়েছি আমরা! একসময় দেশমাতা বাংলা মায়ের মাঝে দেখেছিলাম বিশ্ব মায়ের রূপ। নির্যাতিত দেশবাসীর মাঝে দেখেছি প্রিয়জনের বিমূর্ত অবয়ব। পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ থেকে একবার বিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে লক্ষাধিক জনতার ভিড় ডিঙিয়ে। মানুষের যে দুঃখ-দৈন্য দেখেছি, লা-জবাব। সহযাত্রী সুবেদার মেজর মোজাফফর শেষে প্রশ্ন করলেন, "স্যার, আপনি আমাদের কতো আশার বাণী শোনান, কতো বীর জীবনের কথা শোনান, আজ এতো নীরব কেন?" নিজের অজান্তে কখন যে ঝরছে অবিরল অশ্রুধারা, জানিনা। অগণিত শরণার্থীর মাঝে দু'চোখ কেবল খুঁজছে আপনজন ও প্রিয়তমার মুখ।

মুক্তিযুদ্ধকালে ঘর-সংসার-প্রিয়জনদের হারিয়ে বাংলার বধূ-মাতা-কন্যা তথা নারী-সমাজ আমাদের আশ্রয়-শুশ্রূষা-নিরাপত্তার ভার নিয়েছিলেন। এমনি সব অজ্ঞাত-অখ্যাত কিন্তু মহিয়সী নারীর স্মৃতি এখনো ভাসে স্মৃতির মণিকোঠায়। সে-সবেরই একটা খণ্ডিত চিত্ররূপ দেবার প্রয়াস এ-গ্রন্থ।

মায়ের দুধে মায়ের কোলে মানুষ। সে-মায়ের নারিকেল শলার পিটানো যেন দুষ্টের ভূত ছাড়ানো। শিশুকালের আবছা স্মৃতি এখনো মনে আসে। মনে পড়ে পাশের পাড়ার দু'বধূর কথা। রাবির বাপ বিয়ে করে আনলেন এক সুন্দরী বালিকা-বধূ। ভদ্র ঘরের সুন্দরী মেয়ে। ঘোমটার আড়ালে দেখাই যায় না। সলজ্জ চরণে চলা। সবাই খুশি কাঁচা হলুদ-

বরণ সোনার প্রতিমা দেখে। ডেকে নিয়ে লিচু-আমরুজ-ডাশা পেয়ারা খাওয়ায়। আমরা সবাই খুশি। কতো ভালো রাঙা চাচি। মায়ের আদুরে মেয়ে চাষার ঘরের বৌ। চাষবাসটাই চাচি কম জানেন। চাচির ওপর চাষা তাই ক্ষেপা।

সকালে পাশের বাড়িতে অবাক কাণ্ড। হালের পাচনে রাঙা চাচিরে চাষা ব্যাটা দেয় খিচন। চার পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জালা ধান। চাচার পা জড়িয়ে চাচির কান্দন, "বাবাগো, আমারে মাইরো না।"

চাচা গেছেন ক্ষেত বানাতে। খলা তৈরিতে গলা শুকিয়ে চাচা গলদঘর্ম। ভাদ্রের প্রকৃতি। আজব তার গতি। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় বাদলের ঠেলা সামলানো দায়। জালা ফেলার বহু জ্বালা। তৈরি খলায় জালা ফেলতেই এলো ঝড়। পুরা পরিশ্রম মাটি। পানির তোড়ে কোথায় ভেসে যায় ধান। কয়েক ঘন্টার মাথায় ধানের অংকুর মাটিতে শেকড় গাঁড়লে আর ভাবনা থাকে না। চাচার তাই তাড়া। ধানের জালি চাচিরে ভাংতে দিয়ে চাচা গেলেন খলা বানাতে। খাড়ি ভর্তি ধানের অংকুর দেখে চক্ষু স্থির! এতো অংকুর ভাংবেন কখন! কিচ্ছার রাজকন্যারে ছিটানো শস্য-কণা তুলে নিতো ক্ষেতের পিঁপড়ারা। তাঁর জালি ভাঙার জ্বালা জুড়াতে তো কেউ আসে না। শরমে চাচি কাউকে কিছু জিগান না। আল্লার নাম নিয়ে ধানের অংকুর একটা একটা করে আলগা করতে লাগলেন। এতে আর কি হয়!

চাচার তাড়া, এখনি জালা ফেলতে হবে। চাচি ভয়ে খাড়া, ব্যাপার কি? "রে শালী, এই তোর ভাংগা জালি। তোর বাপরে চিনসনি...?"। এ-কথা বলেই আর দেরি করে না। গরু পিটানোর মতন করে বউরে পিটিয়ে মনের ঝাল মিটায়। চাষা আর কয় কারে! পিটনির তোড়ে চাচি তার স্বামীরে বাপ ডাকে তবু মাপ পায় না। এমন আরো কতো কাহিনী যে আছে শৈশবের।

কৈশোরে দেখলাম নারীর আরেক চেহারা। বড় ভাবী দেলারা খুবই খুশ দেল। বাসর রাতে তাঁর চোখ-চাহনি দেখে ভাই যে সেই কাত, আর চোখ তুলে চায়নি। সেজ ভাবী নিলুফার যারে কয় ধারালো তলোয়ার। খিল এঁটে ভাইকে লাগায় বেদম কিল... রে বখিল, আর করবিনি গোল। দৌড়ে গিয়ে লৌহ হাতে তাঁদের ঝগড়া থামাই। সেই থেকে ভাই যেন আস্ত একটা ভেজা বেড়াল।

নারীর যা রূপ দেখলাম যৌবনে। লজ্জা শরমের মাথা খাই। আমার পিচকি বেগম যখন ফোঁস-ফোঁসায়, কাল নাগিনা তার কাছে কোন ছাড় !

অবিস্মরণীয় বিস্মরণ বাংলার নারী

পুরুষ শাসিত বঙ্গ সমাজে নারীর আসল রূপ দেখার তখনো অনেক বাকি। মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গ নারীর বীরত্বের কাহিনী পুরুষ শাসিত সৈনিকদের তুলনায় কোনো অংশেই অকিঞ্চিতকর নয়। বিস্মৃত স্মৃতির কিছু অধ্যায় সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

বেগম খালেদা জিয়া

২৫শে মার্চ কাল রাতে যোল শহর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কোয়ার্টার গার্ডে সশস্ত্র স্যান্ট্রির কক্ষ। অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে চায় শত্রুপক্ষ। পাঞ্জাবি সিও লেঃ কর্নেল জানজুয়া নিজে এলেন এদের নিরস্ত্র করতে। অবস্থাদৃষ্টে হতচকিত বাঙালি সৈনিকরা। আকস্মিকভাবে অকুস্থলে ছুটে এলেন বেগম জিয়া। বাঘিনীর দাপটে তিনি বলেনঃ "বাংলার সম্পদ ইবিআরের অস্ত্রে আপনাকে হাত দিতে দেবো না কর্নেল জানজুয়া।" এবার দুঃসাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ায় ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা। বাংলার স্বাধীনতায় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাসের সাথে দুর্জয় সাহসে অক্ষয় হয়ে আছে বেগম খালেদা জিয়ার কীর্তি। ইতিহাসের চমক খেলায় আজ তিনি বিধবা। তবে দেশের সক্রিয় রাজনীতিতে সমর্পিত রেখেছেন নিজেকে।

বেগম জিয়া শুধুমাত্র নিজেই ইতিহাস নন, তিনি অন্যকেও সম্মানিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বীরমুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক-কে বীর প্রতীকের পদক প্রদান করে তাঁকে জাতীয় বীর হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁর সক্রিয় চেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল থেকে তারামনকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা, এবং প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও আরো ২৫ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়। প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সৌজন্যে তারামন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগপ্রাপ্তা হন। তাঁর সন্তানদের জন্য প্রধানমন্ত্রী পড়াশুনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথাসম্মাননা প্রদর্শনের কারণে আজীবন তিনি সকলের সম্মানিতা হয়ে থাকবেন।

ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

বাংলার স্বাধীনতার রূপকার-দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেসা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাক আর্মি শেখ মুজিবকে ধরে নিয়ে যায় তাঁর ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের বাসভবন থেকে। বাংলার মানুষের নির্বাচিত জনবন্দিত নেতাকে তাঁর প্রিয়তমার সামনে থেকে নিয়ে গেলো। হতাশায় ম্রিয়মান হলেও ফজিলাতুন্নেসা হাল ছাড়েন নি। যে স্বামীর জীবন-যৌবন কেটেছে পাক-জিন্দানখানায়, তাঁর জন্য এ আর এমন কি? আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়টাতেই তিনি দেখেছেন পাক-সামরিক জান্তার প্রকৃত রূপ। আজ তিনি সসন্তান বন্দি নিজ গৃহে; কিন্তু তাই বলে অবলার মতো বসে

থাকা যায় না। বড় ছেলে কামালকে পাক চক্রজাল উতরে পাঠালেন মুক্তিযুদ্ধে। সে জুন/জুলাই ১৯৭১ সালের কথা। এক প্রৌঢ় বয়সের দাড়িওয়ালা ছিপছিপে পাতলা-চিতলা গড়নের ভদ্রলোক সাতক্ষীরা সীমান্তে আমার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এলেন। সে-আট নম্বর সেক্টরের 'ই' কোম্পানির ক্যাম্প তখন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে। কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খান ও আজাদ পত্রিকার মাওলানা আকরাম খাঁর স্মৃতিধন্য হাকিমপুর খান বাড়িতে মুক্তি ক্যাম্প। ভদ্রলোক ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। বহু সংকোচ ও ইতস্ততায় তিনি যেন কি বলি বলি করে থেমে যান। সবাইকে সরিয়ে গভীর রাতে তাঁকে একান্তে ডাকলাম। তিনি অগণিত শরণার্থীর মাঝে মিশে গেলেও ভয় পান, কেউ যেন তাঁকে ফলো করছে। পাক-মুক্তি-ভারত আর্মির সবটাকেই তিনি এড়িয়ে চলতে চান। এতো কিছুর পরও তিনি মুক্তি আর্মি ক্যাম্পে কেন এলেন জানতে চাইলাম। তিনি হাকিমপুর মুক্তি ইয়ুথ ক্যাম্পে কয়েকদিন কাটিয়ে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিশেষ করে মুক্তি ক্যাপ্টেনকে তিনি কয়েকদিন দেখেছেন অতি নিকট থেকে। আমি নাকি দাড়িওয়ালা খালি-পা লুঙ্গি পরা ব্যতিক্রমী কাপ্তান। তাঁকে ধানাই-পানাই ছেড়ে কাজের কথা থাকলে বলার জন্য অনুরোধ জানাই। অন্যথা, ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার আদেশ শুনিয়ে দিলাম। অবশেষে জানালেন, তিনি অতি সংগোপনে কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমদ-এর কাছে যেতে চান। আমার অবাক করা প্রশ্ন: বর্ডার তো খোলা। হাজার শরণার্থী প্রতিদিন আসে-যায়। কে রাখে কার খবর! তাঁর জবাব, ভারত নিজেকে অরক্ষিত রেখে বর্ডার খোলেনি। ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) তাঁকে নাঙ্গা করতে বাকি রেখেছে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি একটি হলুদ মলাটের মুখ বন্ধ খাম আমার হাতে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি শেখ মুজিব-পত্নী ফজিলাতুন্নেসার চিঠির নিরাপত্তা চান। এ চিঠি তাজউদ্দিনের উদ্দেশে লেখা। শেখ মুজিবের নির্দেশনার বিশেষ কিছু গোপন তথ্যের নিরাপত্তায় তাঁর এতো সতর্কতা। তাঁকে সবিনয়ে জানালাম, ভাই আমার নিজের জীবনেরই ভরসা নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি আকুলতা ভরা উচ্ছ্বাসে আমার পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের পরিচয় দিলেন। নীলিমা ইব্রাহিম, আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির প্রসঙ্গও তিনি টেনে আনলেন। বুঝলাম, একটা সুদূরপ্রসারী নেটওয়ার্কের তিনি একজন বাহক মাত্র। ভারতভূমে আমার দুর্দিনের সহায় নকশাল ত্রাণ সংস্থার ছদ্মাবরণে তাঁকে কলকাতায় তাজউদ্দিন-সান্নিধ্যে পাঠালাম।

কি ছিলো সে পত্রে জানিনা। কারণ সে পত্র খোলা আদৌ সঙ্গত মনে করিনি। পরবর্তীতে তাজউদ্দিন, ওসমানী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের সাথে তিনি হাকিমপুর ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তাজউদ্দিন সাহেব সংকেতের মাধ্যমে সেই পত্রের প্রাপ্তির স্বীকৃতি জানান।

বাস্তবে এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার নিয়ন্ত্রণ বিএসএফ এর নিকট থেকে ভারতের নিয়মিত বাহিনীর হাতে চলে যায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ যেন নতুন চেতনা লাভ

বীর প্রতীক পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহকে

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নারী নাজিয়া ওসমান এবং তার কবরের এপিটাফ

বেগম ফজিলাতুনেছা

মুক্তিযোদ্ধা ছুরমান বিবি

ছাফেরা খাতুন

ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম, বীর প্রতীক (অব.)

মুক্তিযোদ্ধা জোৎস্না আরা

সস্ত্রীক গেরিলা ক্যাপ্টেন

আমোদ পত্রিকার সম্পাদিকা শামসুন্নাহার রাব্বী ও লেখক

করে। স্বল্পদিনের ব্যবধানে মুজিববাহিনী সাতক্ষীরা সীমান্তে প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ আর্মির হাতে ধরা পড়ে।

আজ সে-পত্রের রেফারেন্সের কুশিলবদের সবাই পরপারে। তথাপি কেউ যদি সে-পত্রের সন্ধান পান, ইতিহাসের একটা অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হতো। ফজিলাতুন্নেসা 'মৃত্যুরে অন্তরে পশি অমৃত যদি না পাই খুঁজি'র মতো অসাধ্য সাধনের যে পত্র তাজউদ্দিনকে পাঠাতে পেরেছিলেন, সে এক দুঃসাধ্য ও কঠিন বাস্তবতার নাম।

বার আওলিয়ার মাজেদা খাতুন

২৫শে মার্চের ভয়াল রাতের চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি)। সে-দিনের নায়েক ক্লার্ক (পরবর্তীকালের অনারারি লেঃ) মিজান সপরিবারে পাহাড় ডিঙিয়ে এলেন বারআওলিয়া। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলি ভূঁইয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করছেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় সাগর তীরের বিজন বেলায় আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছে মিজানের পরিবার। বারআউলিয়ার মহাপ্রাণ মাজেদা খাতুন তাঁদের সাদরে ঘরে আশ্রয় দেন। মাজেদার মা, মাজেদা ও তার ভাই মিলে তিনজনে কাজ করে। কোনো রকমে সংস্থান করে দু'বেলার অন্ন। গরিবের ঘর, আশ্রিত অতিথির খাবারের ব্যবস্থা নেই। মাজেদা নিজের খাবার মিজানের বাচ্চা তিনটাকে খাওয়ান। নিজে উপোষ থাকেন। মুক্তিযুগে বাঙালি এক জাতি এক জ্ঞাতি সহমর্মিতায় লড়েছে। তারই নিদর্শন বার আওলিয়ার মাজেদা খাতুনের আত্মত্যাগ।

বেগম হিমাংশু ব্যানার্জি

স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গে কাঁপছে যশোর। শহরের পাশে নিউ টাউন নোয়াপাড়ার আমবাগানে বিদ্রোহী বাঙালির ক্যাম্প। যোদ্ধাদের সেবায় পুরনারী-কুলবধূ ঘরের বাইরে। যোদ্ধাদের রান্না-বান্না জাতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন মহিলারা। ২৯ মার্চ নারী স্বেচ্ছাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন বেগম হিমাংশু ব্যানার্জি।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুলনা মুখে চলমান সশস্ত্র আর্মির সাথে সম্মুখ-যুদ্ধে পুলিশ নেতা হিমাংশু মৃত্যুবরণ করেন ৩০ মার্চ। বেগম হিমাংশু পরবর্তীকালে কিভাবে আছেন, কিংবা জীবিত কিনা আর জানা যায়নি।

নড়াইলের বীরকন্যা ১১ নারী

যশোর-নড়াইলের যুদ্ধ প্রস্তুতি খুলনা অঞ্চলের মানুষের সুপ্ত বীর্যকে নাড়িয়ে তোলে। নড়াইলের লোহাগড়ার মানুষের স্বাধীনতা-প্রস্তুতির ইস্পাত-দৃঢ় মনোবল অবিস্মরণীয়। ইতোমধ্যে নেভীর শামসুল আলম কর্তৃক আয়োজিত মুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ। তাঁর নেতৃত্বে জঙ্গি মিছিল যাত্রা করে যশোর অভিমুখে। লোহাগড়ার লৌহমনা ১১জন বীর

নারীর যশোরমুখী সেই জঙ্গি মিছিলে অংশগ্রহণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মুক্তিবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য ঘটনা হিসেবেই তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেন। সবাই স্কুল-কলেজের ছাত্রী। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার পাকানো এবং যুদ্ধাহতদের শুশ্রূষার প্রধান দায়িত্ব ছিলো তাঁদের হাতে। এগারোটি অকুতোভয় বীর কন্যা জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে যুদ্ধসাজে দৃপ্ততেজে অস্ত্রহাতে মার্চ করেন যোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে নড়াইল টু যশোর। আহা! জাতির সে-পবিত্র আমানত সেই বীর কন্যারা আজ কোথায়? যদি পেতাম তাঁদের পরিচয়! তাঁদের যুদ্ধ সাজের জঙ্গি মিছিলের মার্চ আর শত্রুর সাথে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর সহযোদ্ধা কাউকে যদি পেতাম। কারো কাছে যদি পেতাম তাদের ক্যামেরা-চিত্র। লোহাগড়ার লৌহকন্যারা, অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে তোমরা বাংলার জাগ্রত নারী জাগরণের অগ্রদূত।

আলেখার চরের ছাফেরা খাতুন

কুমিল্লা সেনানিবাসের সন্নিকটবর্তী পুবের গ্রাম আলেখারচর। আলেখা সংখ্যায় সেখানে চলে পাক-আর্মির হামলা। একবার পাকসেনাদের ঘেরে পড়ে মুক্তি। স্টেনগানসহ পালাচ্ছেন মুক্তি-কমান্ডার শফিক। সঙ্গীরাও দৌড়ুচ্ছে যে-যেদিকে পারে। সবাই ভয় ও আতংকে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। যে-অস্ত্র মুক্তি-কমান্ডারকে বাঁচাতো সেটিই আজ তার কাল। কিশোর পাক মিলিশিয়া কাশেমের-মা (ছাফেরা খাতুন) মুক্তি-কমান্ডারের অস্ত্র লুফে নেন। মৃত্যুর মুখে নিপতিত মুক্তি-কমান্ডার শফিককে জনারণ্যে মিশে যেতে সুযোগ দিলেন তিনি। সিমের মুড়ায় স্টেন লুকিয়ে রাখেন ছাফেরা খাতুন। হন্যে হয়ে খোঁজা সশস্ত্র পাকসেনাদের সামনে বেতসলতার মতো কাঁপতে থাকে ছাফেরা। সংসারে যেন কেউ তাঁর নেই। তাই তো ভয়ে কাঁদে ভেউ ভেউ। পাক আর্মি তাদের প্রাণের দোসর রাজাকরসহ বৃথাই খুঁজলো অস্ত্র। যমদূতের অগ্রদূত শত্রুসেনার নাকের ডগায় ছাফেরা খাতুনের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, ও নারীর মোহনীয় চাতুর্যে বাঁচায় মুক্তিকে। এমনিভাবে, বাংলার মা-বোনেরা বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর জুড়ে ছিলেন বলেই দেশ মুক্ত করতে পেরেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

জাহানারা বেগম

সাতক্ষীরার তালা-আশাশুনি অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সকল আপদ-বিপদে তিনি আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। যুদ্ধের হানাহানিতে সবাই বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে। তিনি আমার পাহারায় স্বামী মুক্তিযোদ্ধা মকবুল ইসলামের অসীম সাহসে রয়ে গেলেন। আধামাইল দূর থেকে শত্রুকবলিত নদী থেকে পরিচ্ছন্ন পানি এনে তাঁদের ঘরে অবরুদ্ধ কাপ্তানের স্নানের ব্যবস্থা করতেন মা জাহানারা। এঁদের ঋণ জাতি কি দিয়ে শোধ করবে জানিনা।

নেছারন বিবি ও রিজিয়া খাতুন

মুক্তি-গেরিলা এরফানের মাতা মোসাম্মত নেছারন বিবি। পুত্র-প্রতিম গেরিলা মইজুদ্দিনের মাতা মোছাম্মত রিজিয়া খাতুন। তাঁদের পিতার নাম যথাক্রমে আবদুল জব্বার সরদার ও মোজাম্মেল হক। মুক্তি-গেরিলা এই দু'জনের বাড়ির ঠিকানাঃ গ্রাম-নোওয়াকাঠি, ডাকঘর-মির্জাপুর, থানা-তালা, জিলা-সাতক্ষীরা।

২২ নভেম্বর ১৯৭১-এ বিয়াল্লিশ জনের সশস্ত্র গেরিলা দল নিয়ে ক্যাপ্টেন সফিক ও সেকেন্ড লেঃ (এমপি) আলাউদ্দিন তালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নিশার আঁধারে পথের বিভ্রান্তিতে পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাঁরা। বিচ্ছিন্ন গ্রুপের দু'গেরিলা এরফান ও মইজউদ্দিনের মামা-ভাগ্নের বাড়িতে ২৪ নভেম্বর ১৯৭১-এর শেষ রাতে পৌঁছেন ক্যাপ্টেন সফিক।

পরেরদিন ২৫ নভেম্বর ১৯৭১, চাষির সরলতায় সিকিউরিটি আউটের কারণে মুক্তি শেলটার ঘেরাও করে পাক আর্মি। রাজাকারের সহায়তায় নিশ্ছিদ্র মুক্তি-শেলটারের সঠিক নিশানার খবরে পাক-ঘেরাওয়ে পড়ে মুক্তি-আশ্রয়স্থল।

বাস্তবে, দু'জন মুক্তি অফিসারের তালা যাত্রার সঠিক খবর পেয়ে পাক গোয়েন্দা তাদের অনুসরণ করছিলো। পথে তাদের বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতই কাকতালীয় ব্যাপার।

উপস্থিত সকল মুক্তিগ্রুপকে গোপন আস্তানায় অস্ত্র লুকানোর নির্দেশ দেন গেরিলা কাপ্তান। জনগণকে যে-কোনো মূল্যে আশ্রয় শেল্টারগুলির নিরাপত্তা বিধানের জন্য বজ্রকঠোর হুশিয়ারি প্রদান করেন। মুক্তিরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, অফিসারের নির্দেশ মানেন।

রাজাকারসহযোগে পাক আর্মি এদিকে ধেয়ে আসছে। কুকুরের বেদনার্ত দূরপাল্লার চিৎকার যেন আগাম শুনিয়ে দিচ্ছে শত্রু আগমনের খবর। মুক্তি-শেলটার বাড়িটির গজ-চল্লিশেক দূরে কয়েক ফুটের জংলায় গেরিলা এরফান ও ময়েজকে নিয়ে প্রবেশ করেন ক্যাপ্টেন সফিক। আশ্রয়-বাড়ির নারী-পুরুষের দেখার মধ্যেই তাঁদের যাত্রা। তিনজনের একত্রে আত্মাহুতি এড়াতে গেরিলা দু'জনকে সরে পড়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। একান্ত অপরিচিত পরিবেশে ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে যেতে গেরিলারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলো। গেরিলা-জীবনের চরম শপথের নামে নেতার নির্দেশে তাঁরা ক্যাপ্টেনকে জংলায় রেখে ইরি ধানের ক্ষেত চষে সামনে এগুলেন। পাক আর্মি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা হারালেন আত্মশক্তির স্থৈর্য-ধৈর্যের স্থিরতা। আমার দেখা বিশ-পঁচিশ গজের মধ্যে তাঁরা মাতালের মতো টলে পড়ছেন-উঠছেন-ছুটছেন। তাঁদের নার্ভ শক্তির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ফেল। পাক আর্মি তাঁদের ধরলেন। গরুর দড়িতে বেঁধে বাপের নাম ভুলানো মাইর দিলো তাঁদের। সে-গ্রামের রাজাকাররাই মুক্তিদের বাড়িতে গোলপাতার ঘরে পাটকাঠির আগুন লাগিয়ে দিলো। আগুনের ছাইর ফুলকি নিকটের জংলায় আমার গায়ে এসে লাগে।

ঘরে আগুন লাগিয়ে সবকিছু লুটে নেয় শত্রুরা। সীমাহীন মাইরের পরও মুক্তিরা

অফিসারের সন্ধান দেয় না। আপন বাসভবনে মা-বাবা-ভাইবোন-আত্মীয়-স্বজনের সামনে তারা সহ্য করে বিরামহীন নির্দয় মাইর। পাষাণ প্রতিমার মতো সবাই দেখছে এসব। বাড়ির সুন্দরী মহিলার প্রতি পাক-নমুর লোভাতুর চোখ পড়ে। ইরফানের নানি কারবালার সখিনাসম ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে ওঠেঃ বটি-দা'খান আন তো, ইজ্জত বাঁচাই। এবার প্রতিটি মহিলা দা-বটির অস্ত্রে সজ্জিত হয়। হায়, কেউ শত্রুর ওপর আক্রমণের সূচনা করলে হয়তো হতাহতের মাঝেও দৃশ্যপট পাল্টে যেতো। তবে বাড়ির কোনো মহিলার প্রতি হাত বাড়াতে সাহস পায়নি শত্রুদের কেউ।

নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে দু'জনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ-যেন জমাতে কোরবানির দৃশ্য! ইসলামের ঐতিহাসিক কোরবানির সঙ্গে একটাই মিল, দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা।

কালান্তকাল যমদূতের কাছে আপন রক্তের কেউ তাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলো না। মা নেছারন ও রিজিয়ার আত্মগর্ব বিলাপঃ সন্তানদের আল্লাহর রাহে দেশের নামে কোরবানি দিলাম। ধরে নিলাম আমাদের সোনামানিকরা কোনো কালেই ছিলো না। মানিকেরা, আল্লাহর নামে কিরা-কসম, আমাগোরে খাওয়াইছে।

মুক্তি দু'জন চিৎকার করে বলেঃ মায়েরা, আমরা মরি ক্ষতি নেই প্রফেসরকে বাঁচাইও। তোমগো পোলার মতো বহুত পোলারে হেয় মরণপথে নামাইছে। হেয় বাঁচলে তোমগো পোলাদের মতো বহুত পোলা পাইবা। হেয় বাঁচলে আমরা বাঁচমু। কতো বড় বড় নেতা দেখলাম, মরণ-কবুল করে অচেনা-অজানা-বিরাণ মুলুকে কেউ আইছেনি মা কসম খাও, তোমরা দেখাও তো।

আমগো মাথায় হাত রাইখ্যা কসম খাও মা প্রফেসরকে বাঁচাইবা। নেছারন ও রিজিয়ার বুক ফাটা কান্না, আমগো পোলা গেছে তাদের আমানত কাপ্তান তো বেঁচে আছে। এরফান-মইজুদ্দিনের বোনের কান্নাঃ ধরে নিলাম, কোনো কালেই আমাদের কোনো ভাই ছিলো না। বাংলার হাজার মুক্তিযোদ্ধার মতো আমাদের ভাইরা শাহাদতের পথে গেছে।

সকাল আটটা নাগাদ মুক্তি-ধরা নাটকের সূচনা হয়। বেলা তিনটা নাগাদ মুক্তিরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতেই নেছারন ও রিজিয়ার হায় হায় মাতম। বাবা, তুমি জংলায় যাও। আপন-পর চিনিনা। পাশের বাড়ির লীগারের পোলা শাহাবুদ্দিন মুক্তিদের ধরায়ে দিছে। আমার পোলাদের ছোটাইয়া আনতে টাকা চায়। বাবা কাপ্তান, জলদি পালাও। তুমি মারা গেলে পোলাগরে দেওয়া কসমের কি করমু!

সাহসিনী বাংলা মায়ের এমন রূপ আয়ুষ্কালে দেখবো ভাবিনি। নিজের শিক্ষা ও অধ্যাপনায় ধিক্কার এলো, এ-দেশের আলো-বাতাসে সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর বিচরণ যেন বৃথাই গেলো। ঘরে ঘরে মায়েদের সামান্য অস্ত্রের রাইফেল, স্টেন, গ্রেনেড চালানো শিখালে শত্রুর সাহসই হতো না মায়েদের দিকে লোভাতুর চোখে তাকায়। এ-দেশের ভবিষ্যত প্রতিরক্ষায় অর্ধেক জনশক্তি বাদ দিয়ে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি যেন হাওয়ায় ফানুস উড়ানো। মায়েদের অনুরোধে আমি আবার চলে গেলাম জঙ্গলের গহীন অন্ধকারে।

সন্ধ্যা নামতেই আমি আবার মায়েদের পোড়া ভিটায়। নেছারন-রিজিয়ার আক্ষেপের দুঃখ, বাড়ির মেহমান না-খাই থাহে। সকালে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের সবই ছিলো। সন্ধ্যার পোড়া উঠানে কুড়িয়ে পেলেন আড়াই সেরের মতো পোড়া ধান। স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ বলতে এই পোড়া ধান মাত্র। আক্ষেপে এরফানের বাপ আবদুল জব্বার সরদার-এর দুঃখ-কাপ্তান সাবঃ আপনাকে খাতি দিতে পারলাম না। পৃথিবীতে অতিথি আপ্যায়নের অনেক গল্প শুনেছি। আজ যা চর্ম চোখে দেখেছি, আর হৃদয়-বেদনায় উপলব্ধি করেছি, তার কি তুলনা আছে! স্বদেশ প্রেমে নবতর প্রেমের দীক্ষা দিলেন তাদের চাষি পরিবার। আত্ম-রক্তের এমন স্বেচ্ছা-কোরবানির দৃশ্যের মুখে সকল না-পাওয়ার বেদনা ভুলে গেলাম। মায়েদের পুত্র কোরবানির আত্মত্যাগ-মহিমা ধন্য স্বদেশ প্রেরণায়ঃ

"সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালো বেসে
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বে-নজির মৃত্যুর চোয়াল উতরানো মাইরেও যে গেরিলা তাঁর অফিসারের নাম-পরিচয় মুখে আনে না, যে-মা নেছারন-রিজিয়া পুত্র কোরবানির নামে তাদের কাপ্তানকে রক্ষা করেন, তাঁদের কমান্ড করার দুর্লভ সৌভাগ্যে গেরিলা জনমের সার্থকতা পেলাম।

মুক্তিমাতা নেছারন ও রিজিয়ার উদ্দেশে এদেশের মন্দভাগ্য মুক্তিযোদ্ধা, ৮ নম্বর সেক্টর, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধের ভিখারি আর্মি, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা জগ্রত জনতা, নিজের দুর্বল রণচাতুর্যের ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকারে মুক্তিমাতাদের পাদপদ্মে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এদেশের অনাগত দুর্দিনে তাঁরা অবলা নারীর সবলা নিদর্শন। তাঁদের থেকে জাতিকে শিখতে হবে দেশমাতার মুক্তিমঞ্চের বেদিমূলে কিভাবে দিতে হয় পুত্রের কোরবানি।

আমার যুদ্ধ জীবনের পরম আনন্দ যে, মুক্তি-পুত্ররা মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি ভোগ করে শত্রুর মৃত্যুদণ্ড উতরে জীবিত অবস্থায় মায়ের কোলে ফিরে গেছেন স্বাধীন বাংলায়। সে এক লোমহর্ষক বেদনার ভিন্নতর ইতিহাস।

নাদিরুন্নেসার নদীবহা ক্রন্দন

শহিদ আবদুল আজিজ মোড়ল তালার গেরিলা যুদ্ধের স্মৃতিধন্য। তাঁর গ্রাম: বারাত, ডাকঘর: মৃজাপুর, থানা: তালা, জিলা: সাতক্ষীরা। তাঁর পিতা আমিনউদ্দিন মোড়ল, মা-নাদিরুন্নেসা। মাত্র চৌদ্দ বছরের তারুণ্য দীপ্ত মুক্তি-গেরিলা।

নবম শ্রেণীর বিজ্ঞানে প্রথম স্থানের অধিকারী আজিজ। নিজের একান্ত বিশ্বাস ও মায়ের আশীর্বাদ ভরসা করে মুক্তি যুদ্ধে যান। পররাজ্যে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছুদিন পরই বাড়ি ফেরেন। পাক আর্মির চোখের সামনে তাঁর বিচরণ। এমন কিশোর অজিজকে শত্রুপক্ষ গেরিলা বলে ভাবতেই পারেনি।

খুবই গরিব ঘরের সন্তান আজিজ। মাকে আশার বাণী শোনাতো, সে ডাক্তার হবে। এদেশ

কাউকেই বিনা চিকিৎসায় মরতে দিবে না। বিজ্ঞানের ছাত্র সে, বাড়িতে নিজেই ব্যাঙ কেটে পরীক্ষা করতো। নিজেই যোগাতো পড়ার খরচ। ছাগল পুষতো। স্কুল থেকে ফেরার পথে ঘাস কেটে আনতো ছাগলের জন্য। পুরনো বই কিনে সে-গুলো জোড়াতালির শেলাইতে নতুন রূপ নিতো আজিজের হাতে। নতুন মলাটের সে-সব বই বিক্রির পয়সায় সংস্থান হতো তার পড়ার খরচের কিছুটা অংশ। বাড়ির পাশের বিলে প্রচুর মাছ, ধরে এনে বাজারে বেচে পয়সা জমাতো পড়ার খরচ মেটানোর জন্য। শেষ যুদ্ধের দিন মাকে অভয়-বাণী শুনিয়েছিলোঃ আমি পড়াশুনা করে বড় হলে মা তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না। আজ বিকালে বিল থেকে অনেক মাছ ধরে আনবো। সে মাছ আর ধরা হয়নি আজিজের। তালার গেরিলা যুদ্ধে ফায়ার কন্ট্রোলের সংযমের অভাবে বীর গেরিলা আজিজ শত্রুর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন। শত্রু তাঁর লাশ বা হাতিয়ার কোনোটাই হাত করতে পারেনি। এ মর্মন্তুদ যুদ্ধের কয়েক-শ' গজের ব্যবধানে থেকেও তাঁদের রক্ষায় আমার ব্যর্থতার দায়ভাগ নিয়ে শহিদ আজিজের মাতা নাদিরুন্নেসার শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করি। 'যে ফুল না ফুটিতে লুটায় ধরণীতে'-এর মতোই হারিয়ে গেলেন বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আজিজ। শহিদ আজিজের মাতা নাদিরুন্নেসার নদীবহা ক্রন্দন, কোথায় আমার আজিজ। আপন সন্তানকে জেনেশুনে মৃত্যু পরোয়ানার স্বাধীনতা যুদ্ধে পাঠান যে মা, তাঁরই নাম মুক্তিমাতা নাদিরুন্নেসা।

যুবকেরা দেশের জন্য যুদ্ধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চৌদ্দতে পা দেওয়া তরুণ স্কুল-ছাত্রের করুণ মৃত্যু বড়ই দুর্বহ। শহিদ মাতা নাদিরুন্নেসার সামনে যেতে আমার যেন চলার মরণ যাতনার অন্তর্দাহ গেছে। এদেশের অগণিত তরুণ মুক্তি শহিদ আত্মার পক্ষ থেকে নাদিরুন্নেসার মাতৃহৃদয়ের ঔদার্যের কাছে বেদনার অশ্রু নিবেদন করি। এদেশে যুগে যুগে এমন তরুণ সন্তান উৎসর্গের সাহসিনী মা তৈরি হোক। অনাগত কালের সোনার বাংলা শহিদ আজিজের মতো বীর-পুত্রে ভরে উঠুক। শহিদ মাতা নাদিরুন্নেসার স্বপ্ন সফল হোক।

কুসুম কুমারি

জয়বাংলা থেকে মুক্তি প্রহরায় মাছের লঞ্চে করে পৌঁছুলাম পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটের হাসানাবাদ। খেয়াঘাটে পা রেখেই দেখি এক শরণার্থী মহিলা একটি মাটির পাতিল পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অপলক দৃষ্টি পাতিলের দিকে। জোয়ার-ভাটায় নদীর তীরে কতো কিছুই ভাসে। একটি কুকুর পানিতে নেমে পাতিল টেনে তীরে আনে। কৌতূহলের স্যাপার দেখতে এগিয়ে গেলাম। সুবৃহৎ পাতিলে একটি মৃত শিশু। শরণার্থী শিবিরের অনাগত মরার শ্মশানে কে কাকে সৎকার করে ? মা-তাই মৃত পুত্রকে নদীতে বিসর্জন দিলেন। আজ কুকুরে মানুষে টানাটানি। দু:খিনী মা প্রিয়পুত্রের স্মৃতির তর্পণে কিছু ফুলের পাঁপড়ি ভাসিয়ে দিলেন নদীর জলে। ব্যথাতুরা াকে নাম জিজ্ঞেস করতেই 'কুসুম কুমারিকে মরতে দাও' বলে তিনি জলকাদায় পড়ে তন্য হারালেন।

জীবনে এমন হৃদয় বিদারক মানসিক সমস্যায় পড়বো ভাবিনি। বিষয়টি এখানেই চুকে গেলে ভালো ছিলো। আমি আবার আশাশুনি থানা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের বেড়জালের এলাকা বাড়াতে নৌ-কমান্ডো রহমতুল্লার অধীনে কাজ করছি। মানুষ কম বলে, যুদ্ধের কারণে, মানুষের দেশত্যাগের কারণে, স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান না থাকায় সে অঞ্চলে সাত দিনে বা চৌদ্দদিনে একবার বাজার বসে। বাজারের নামটা, সঠিক মনে আসছে না। এ বাজারেই মুক্তি গেরিলা কমান্ডো নান্নুকে পাঠিয়েছিলাম। বিস্ফোরকের সাহায্যে তাঁর দ্বারা রাজাকার আশ্রয় গ্রহণকারী ভবনটি উড়িয়ে দেবার রিপোর্টটি অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। আজ তাঁর রিপোর্টের সত্যতার প্রমাণ পেলাম। দাড়িওয়ালা ফকিরের ছদ্মবেশে আমি বাজারে। গেরিলারা আমার রক্ষায় উদগ্রিব। বাজারে এক পাগলিনী ভিখারিনীর মতো কাজের মেয়ে ঘুরছেন। গাছের ফুল ও তাজা পাতা নদীতে ভাসিয়ে তিনি শরণার্থী শিবিরে মরা পুত্রের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তাঁর নাম কুসুম কুমারি।

তাঁর ইতিহাস বড়ই করুণ। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও প্রাণভয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খাদ্য-পথ্য-চিকিৎসা-বস্ত্রের অভাবে তাঁর ছেলেটি মারা যায়। মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে মুক্তাঞ্চলের সুন্দরবন পকেটে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। গোলপাতার ঘরের তাঁর সে বাস্তুভিটা বৃষ্টি-বাদলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

জীবিকার তাগিদে তিনি আজ মানুষের দোরে দোরে কাজ করেন। তাঁর জীবনের স্বপ্ন দেশ স্বাধীন হবেই। তাঁর ছেলে মরেছে তাতে কি? দেশে হাজারো মুক্তি ছেলে আছে। তাঁরা দেশ স্বাধীন করবেই করবে। পাগলিনীর বড় শখ তিনি একজন মুক্তি-পুত্রকে খাওয়াবেন। বহু পরিশ্রম করে দুটি টাকা সংগ্রহ করেছেন। সাথে একটি ঝুনা নারিকেল ও কিছু চিনি। নারিকেলের নাড়ু বানিয়ে পাগলিনী মা একজন মুক্তি-পুত্রকে খুঁজছেন।

লোকমুখে এসব কথা শুনে তাঁকে দেখার ইচ্ছা হলো। বাজারের এক পরিত্যক্ত গুদামের পিছনে মুক্তিরা তাঁকে আনলেন। পাগলিনী তাঁর প্রলাপ বকে চলেছেন। এবার আমার ব্রহ্মতালুর বত্রিশ নাড়িতে টান পড়ে। বাঁশের মাচার টুলে লুঙ্গি প্যাঁচিয়ে কি অন্য কারণের জন্যই কিনা জানিনা, চরম হতাশায় টাল সামলাতে না পেরে সটান ভূমিতে পড়ে গেলাম। কাপতানের হতচৈতন্য দশায় মুক্তিরা জাপটে ধরে বুকে পিঠে হাতে মালিশের ম্যাসেজ করে আমাকে সুস্থ করেন। পাষাণ কাপ্তানের এমন কাণ্ড দেখে মুক্তিরা ভেবাচেকা খেয়ে যায়। পুত্র শোকের কারণে পাগলিনীর অবস্থা দেখেই বোধকরি কাপ্তান বেচইন, মুহূর্তে নিজকে সামলে নিলাম।

এইতো আমার ভারত সীমান্তে দেখা সন্তান বিসর্জনের কুসুম কুমারি। মুক্তিদের দ্বারা আমাকে স্যার স্যার করা দেখে মা কুসুম কুমারির ধারণা হলো যে, আমিই হয়তো কমান্ডার। অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। তোমরা আমার সাথে ছলনা করো না। নিশ্চয়ই তোমরা মুক্তি। ছেলে তো ভগবান নিছে। আমি মুক্তিপুত্রদের খাওয়াতে নাড়ু বানাইয়াছি, বলেই তাঁর হাহাকার কান্না। তোমরাই আমার মুক্তি পোলা। তোমরা আমার নাড়ু খাও।

জীবনে ভালোমন্দ বহু খানা খেয়েছি। এমন হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার খানার তুলনা নেই।

রেডিও, টেলিভিশন, রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনার আমার প্রয়োজন নেই। বাংলার এমন দীন দরিদ্র মা-বোনের আশীর্বাদ ধন্য খানাই হোক আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা। মা কুসুম কুমারি, দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য কাপ্তানকে ক্ষমা করো। দেশ স্বাধীনের পর তোমার মতো কুসুম কুমারিদের আমরা স্মরণ করতে পারিনি ঠিক, কিন্তু এই স্বাধীনতায় তোমাদের অবদান কোনও অংশে খাটো করার দুঃসাহস কারো নেই।

আতিমা আনোয়ার

ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার সাহেবের চট্টগ্রাম শহরের বাসাটি ছিলো মুক্তি-নৌকমান্ডোদের অভয়ারণ্য। সে-বাসার ফ্লোরে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত গুলির দাগ দেখেছি। প্রয়াত ক্যাপ্টেন মাহফুজের মতো অনেক গেরিলাই আতিমা আনোয়ারের সহৃদয়তা ও কৌশলে পাক-বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। গেরিলাদের আশ্রয় দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আতিমাদের সে-বাসা ছাড়তে হয়। সেই আতিমা আনোয়ার-ভবনটি আজ একটি ভাড়া করা স্কুল। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের মতো সে-সব রক্ষা পেলে একটা কাজের কাজ হতো। আতিমা আনোয়ার-এর সংস্পর্শে থেকে অনেক নৌ-কমান্ডো আশ্রয় পেয়েছেন, রক্ষা পেয়েছেন জীবনে। আজ কে রাখে সে-সব আতিমা আনোয়ারদের খবর।

বেগম আতিয়ার

যশোর জেলার মনিরামপুর যশোর ঝাঁপা বাওড়ের ব-দ্বীপসম গ্রাম মেদে। মেদেতে গেরিলা সদর স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা নেন ফ্লাঃ লেঃ ফজলুল হক (পরবর্তীকালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী)। মনিরামপুরে সংঘটিত হয়েছে বহুতর জয়পরাজয়ের স্মৃতিধন্য গেরিলা যুদ্ধ। উজলপুর বা উজ্জ্বলপুর গ্রাম প্রায় এক সেকশন শহীদের স্মৃতিতে স্মৃতি-ধন্য। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের চরম হতাশায় বেগম আতিয়ার অসীম ধৈর্য ও সাহসে গেরিলা অস্ত্রাগার সামলে রেখে মুক্তিমাতার গৌরবে ধন্য। যশোর মনিরামপুর গেরিলাদের একান্ত বিশ্বাস-আস্থা ও ভালোবাসার সৌরবের গৌরব-আসনে উপবিষ্ট বেগম আতিয়ার। যশোরের বার ভূঁইয়া-খ্যাত বীর সন্তান প্রতাপাদিত্যের স্মৃতিধন্য মুক্তিমাতা আতিয়ারকে গেরিলা মুক্তি কাপ্তানের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। অখ্যাত বাংলার যশোর গ্রামে এমন সাহসিনী মুক্তিযোদ্ধা নারীর সাক্ষাত পাওয়া যাবে ভাবিনি। গভীর রাতে তাঁর বাড়ির কয়েকশ' গজের ব্যবধানে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। কয়েকজন মুক্তি গেরিলার নিশ্চিত মৃত্যু জেনে চঞ্চল অন্য গেরিলারা। আমার এখতিয়ারভুক্ত ইপিআর গেরিলা প্লাটুন আমাকে রেখে পালিয়ে গেছে। এমনি জীবন-মৃত্যুর খেলায় নির্জন পুরুষ-শূন্য অবস্থায় গেরিলা-অস্ত্রাগার আগলে রেখে আমাকে রক্ষার জন্য প্রহরার দায়িত্ব নেন স্টেন গান-

গ্রেনেড হাতে বেগম আতিয়ার। যুগে যুগে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যতোদিন এমন সাহসিনী আতিয়ার বেগমেরা থাকবেন, সোনার বাংলা ততোদিন থাকবে অক্ষয় ও সুরক্ষিত।

মনিরামপুরের গোলাপজান

যশোর জেলার মনিরামপুর থানা এলাকায় গেরিলা অভিযান চলছে। কপোতাক্ষী নদীর উপদ্বীপ সদৃশ মেদে গ্রামে অবস্থিত গেরিলা সদর। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় পুরো এলাকার গেরিলা যুদ্ধ। স্থান ছেড়ে যাওয়া গেরিলারা রাতের আঁধারে আরামের খোঁজে ফেলে যাওয়া স্থানে ফিরে আসছে। পাকিস্তান আর্মি রাতে বের হয় না, মুক্তিরা এমন কল্পনায় বিভোর। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে তারা পাক আর্মির আক্রমণে পড়ে। অকুস্থলে এক সেকশন প্রায় শেষ। পরিণতিতে, সঙ্গী ইপিআর প্লাটুন কাপ্তানকে ছেড়ে সটকে পড়ে। কাপ্তান সফিক স্থানীয় গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধাঞ্চলে রয়ে গেলেন।

চতুর্দিকে মৃত্যুর মিছিল ও হাহাকার কান্না। পুত্রহারা মায়েরা দেখছেন তাঁদের মন্দভাগা কাপ্তানকে। মৃত্যুর কুয়াশা কাফন-আবৃত যুদ্ধাঞ্চলে জনাপঞ্চাশেক মা তাঁদের সন্তান কোরবানের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অনেকে রোরুদ্যমান কান্নায় সসন্তান হাজির। তারা বলেনঃ শহিদ যারা হবার হয়েছে। আমাদের সন্তানকে নিদাবি করে তোমার হাতে দিলাম। বাইরের সবাইতো ভাগছে। বাবা প্রফেসর, তুমি ভাগলে না কেন? আমগো পোলাগো কি জানাজার লোক নেই? পোলারা কয় তোমার সঙ্গে যুদ্ধের লোক নেই। কইলজার টুকরা তোমারে দিলাম। আমগোরে খালি হাতে ফিরাইও না।

পরাজয়ের মুখে এমন আত্মাহুতির ক্র্যাক-প্লাটুন এসে মিলবে ভাবিনি। নিশুতি রাতে সবাই গেলেও কিছু তরুণী স্থান ছাড়েননি। অতি সাধ্যসাধনা করে তাঁদের ঘরে পাঠালাম। তরুণীদের কথা একটাই, 'আমরা কিন্তু অস্ত্র চালনা শিখেছি। লাগলে পরীক্ষা নেও। রণাঙ্গনে আত্মাহুতির তরুণী। যা ভাবিনি, তাই ঘটছে। এর মধ্যে আমার শক্তি-সাহস বাড়ছে। নামধামের রেকর্ড করতে তাঁরা দিলেন না। শহিদ হলে তাঁদের নাম-ঠিকানা না আবার আত্মীয়দের কলংক বাড়ায়। তাঁদের রিজার্ভ ফোর্সে রাখার প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা ক্ষুব্ধ। প্রশ্ন করে তাঁরা জানতে চাইলেনঃ রিজার্ভ ফোর্স কি? উত্তরে বললাম, সবাই যখন যুদ্ধে ফেল মারে, তখন শেষ ভরসার যুদ্ধে যাবার সৈন্যদের বলে রিজার্ভ ফোর্স। সত্যমিথ্যা যাই হোক, তাঁরা আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন। বোধহয় তাঁদেরই একজন মনিরামপুরের এই মেয়ে গোলাপজান।

পরদিন সকালে আমার বিচ্ছিন্ন ইপিআর গ্রুপের রাজ্জাক এসে হাজির। তাকে দেখে আমার রাগ প্রকাশ করিঃ 'চোরাকারবারের শেয়ারের গ্রুপ ভেগেছে। আপনিও তাদেরই একজন, আপনিও কেটে পড়ুন। রাজ্জাক প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি জীবন দিবেন কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবেন না।' তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। ছুটলাম তার গেরিলা-আশ্রয় বাড়িতে।

ওখানে গিয়ে আমি এক আজব পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। মেয়ে বাবার পা ধরে কাঁদে,

"বাবা, হেয় মরলে বিধবা হবো আমি তোমার কি?" মেয়ের বাবা আমাকে পেয়ে বিচার দিলেন। আপনার ইপিআর জোয়ান পোলা আমার মাইয়ারে যাদু করেছে। তারে অস্ত্র চালনা শিখাইছে। স্টেন-রাইফেল খোলা-জোড়া লাগানো-ছোঁড়া শিখাইছে। রাইত-বিরাইতে মাইয়া কাউরে না কইয়া মুক্তির লগে যুদ্ধে গেছে। আইজ মুক্তিগো মরণ দেইখ্যা হেয়ও মরণের লাইগা ফাল পাড়ে। ব্যাপার গুরুচরণ। প্রেমের ফাঁদে গেরিলা ইপিআর বগা আটকাইছে।

মেয়ের বাবা বিচার চাইতে গিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে জানতে চাইলেন, তারা আমার বিচার মানবে কি না। ইপিআরের সোজা জবাবঃ সামরিক আইনে কাপ্তানের বিচার মানতে তিনি বাধ্য। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে তার চোখে প্রেমের অশ্রু-বন্যা সার। তখন আমাকে সাফ জবানে বলতে হয়, তিনি আমার বিচার মানেন কি না। তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

যুদ্ধ ছেড়ে প্রেম খেলার পরিণতি কি জানতে চাইলে, ইপিআর সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। পরে, তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেও মেয়েকে চান বলে জানান। কারণ, তিনি নিজ হাতে এই মেয়েকে অস্ত্র চালনা শিখিয়েছেন। তাঁকে রাতের আঁধারে গেরিলা আক্রমণে নিয়েছেন কাপ্তানের উপস্থিতিতে। রাতের আঁধারে ক্যাপ্টেন এসব ব্যাপার বুঝতে পারেননি।

আমার রাগ ক্রমশঃ বাড়ছে। রাজ্জাককে মাটির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলাম। মুখোমুখি মৃত্যুদৃশ্য তাঁকে দেখতে দিতে চাইলাম না। উপস্থিত স্থানীয় গেরিলারা আমাকে নিবৃত করতে চাইলে তাঁদের প্রতি নির্দেশ দিলাম, হয়তো আমার বিচার মানবেন, নয়তো এই নিন লোডেড অস্ত্র। আমাকে হত্যা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিন। সবাই চুপ। কলেমা পড়ে রাজ্জাক দাঁড়ালেন। আমার তর্জনী স্টেনের ট্রিগারে গর্জনের অপেক্ষায়। এবার প্রেমিকা ছুটে এলেন প্রেমিক রক্ষায়। বাহু বিকশিত করে তিনি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। আমাকে না মেরে তাঁকে কেন মারবেন। দোষ করছি আমি, মরলে আমি মরমু তারে ছাইড়া দেন।

মেয়েটির প্রতি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। যারে কয় কাঁচা হলুদ বরণী। যশোর-খুলনার বিলের অনঘ্রাতা পদ্মসম আভা। বড় কোমল দুর্বল স্থানে ঘা পড়লো। এমনি আরেকজনকে তো অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে এসেছি। সৈনিকের চোখে দুর্বলতা বেমানান। মেয়ের বাপকে কঠোর হুশিয়ারি দিলাম। মেয়েকে সরিয়ে নিন। ছেলের বিচার আমাকে করতে দিন। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এসেছি, নাটক করার জন্য নয়। প্রেমিক অনঢ়। মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

এসব তো বহির্মহলের কারবার, অন্দর মহলে কি হচ্ছে আল্লায় জানেন। স্থানীয় গেরিলাদের আব্দারের পটানিতে মেয়ের মা কাবু। তাঁদের কথা, নারী ঘটিত ব্যাপারে যুদ্ধের ময়দানের বাইরে আর কাউকে পাওয়া যায়নি। সবার জানার বাইরে ক্যাপ্টেন তাদের মেরে ফেলেছে। নিজের কচি সুন্দরী বউ ফালাইয়া বেডায় যুদ্ধে আইছে। তাঁর মতো পাষাণ-স্বামীর অন্তরে দয়া নেই। সীমার। মা আমগোর যোদ্ধারে বাঁচাও। আমগো

বোন আমগোর লগে যুদ্ধ করেছে। একজন আরেক জনেরে ভালোবেসেছে। তার সতীত্বের পরীক্ষা নিন। মেয়ে তাতেও রাজি।

ঝামেলা কেবল বাড়ছে। আমি মোখতছর কাম সারতে চাইলাম। বললাম, আমার গুলিতে নিহত গেরিলা ইপিআরের লাশ যেন সম্মানের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। একথা শুনে ছেচর বাড়িতে পড়ে যায় কান্নার রোল। আমগ কচি মাইয়ারে বাইরের লোকে মাইরা ফালায়রে। তোরা কে কইরে, আয়রে। আশেপাশের অনেকে ছুটে এলেও তারা নীরব দর্শক মাত্র। এমন বেফজুল ফাইজলামি কাম আর যাতে না হয় তার জন্য তাদের খুশি খুশি ভাব। নারী হত্যায় হাত কলংকিত না করে কাজ সারতে পারছিনা।

মেয়ের বাবাকে তাঁর মা ডেকে নিয়ে কি জানি বললেন জানিনা, এবার মেয়ের বাবাও গুলির মুখে লাইন ধরে দাঁড়ালেন। মেয়ের মারও একই আবদার। নিদারি করে মেয়েকে দিলাম আপনাকে। এবার দু'জনের বিচারই আপনার হাতে, যা করার করেন। রণাঙ্গন ছেড়ে এমন বিদ্ঘুটে অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো ভাবিনি। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। হায় কোথায় আমার প্রিয়তমা।

পকেট থেকে বের করে কিছু টাকা দিলাম। যা, শেষ খানার জন্য যশোরের ক্ষীর নিয়ে আয়। শেষ করার আগে পাক আর্মি মুক্তিদের ক্ষীর দিয়েছে তো সব শেষ। অল্পক্ষণ পরেই গুলিতে মরবে। গেরিলারা প্রমাদ গুণলো। আর বুঝি শেষ রক্ষা হয় না!

বাড়িতে অনেক ডিমওয়ালা তাজা মুরগি দেখলাম। মেয়ের বাবার চারটি তাজা খাসি দেখে ভালো লাগলো। মেয়ের মা-বাবা ও গেরিলাদের বললাম, দণ্ডিতের শেষ খানা ভালোভাবেই হোক। জানাজার আগ-খানাটা তারা খেয়েই মরুক। মা-বাবার চোখে পানি। গেরিলারা কান্নায় বুক ভাসিয়েও কোনো ফায়দা হলো না। চারটি মুরগি জবাই করা হলো। সঙ্গে দুটি সবচেয়ে তাজা খাসি। পূর্বদিনের শহিদদের জানাজার পরও কিছু সাদা কাপড় বাকি ছিলো। সেগুলো সবার সামনে আনা হলো। নিজেদের জানাজার কাপড় নিজেরা প্রত্যক্ষ করে নিক।

এবার খাসি-মুরগি, চিকন চালের ভাতের সঙ্গে পোলাও রেডি। খুশবু ছড়াচ্ছে সবকিছুতে। শেষবারের মতো দণ্ডিতকে প্রেমখেলা ছেড়ে সুপথে ফিরে আসতে উপদেশ দিলাম। তারা নীরব। আমরা মুক্তিযুদ্ধের বলি। এ জনমে না হলেও পর জনমে আরেক জনকে পাবো। কোনও অনুশোচনা নেই তাদের মধ্যে। খেতে বললে, খাওয়ায় রাজি হলো না। নিজেরা অজু করে পবিত্র হতে চাইলো। তাদের অজু করার সুযোগ দেওয়া হলো। আগে থেকেই জানাজার মাওলানা আনা ছিলো। সবকিছু তৈরি।

এবার সবাইকে হতচকিত করে বললাম, বিয়ে পড়ান। কতোক্ষণ নীরব থেকে গেরিলারা বলে, আর কিছু করণ লাগবে নাতো! বললাম, ক্যাপ্টেন যা কয় তা কর। বিয়ের আনন্দ-খানা আন।

এই মেয়ের নাম যদ্দুর সম্ভব গোলাপজান। গোলাপের মতোই দিল তার। মুক্তি-দম্পতি রাজ্জাক ও তাঁর বেগমের গেরিলা-প্রেমের মধুরেণ সমাপেতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মেয়ের বাপের আফসোস, খাসি দুটো গেলো। এবার মুচকি হেসে মেয়ের মা বলেন, বিয়ে দিতে এমন খাসি লাগেই।

খানার শুরুতে কপোতাক্ষী তীরের ঘুটে কুড়োনি মা-মেয়ের খোঁজ নিলাম। ক্যাপ্টেন খানার পাতে হাত দেয় না। ঘুটে কুড়োনি জমিলা ও তাঁর মেয়েকে চাই। গেরিলারা ত্বরায় হতদরিদ্র শীর্ণকায়া মা-মেয়েকে হাজির করলেন।

অতি আদরে জমিলা ও তাঁর মেয়েকে খাওয়ালেন কাপ্তান। তাঁদের পাত্রে নিজের পাত্রের খাবার তুলে দেবার সময় কাপ্তানের চোখে নেমে আসে মহাসমুদ্রের অথৈ লোনা জল। এ-দৃশ্য দেখে সবাই থ বনে যায়।

পূর্বাহ্নে কপোতাক্ষীর তীরে ঘুরছি। মা-মেয়ের চালার পাশে উঁকি দিয়ে দেখি কুলার ওপর মোট সাতটি রুটি। তিনটি ভাঁজ করা। এগুলো যাবে মুক্তির খাবার হিসেবে। জমিলা-গোলাপজান এভাবেই নিজেরা না খেয়ে খাবার জোগাতো মুক্তিদের। মুক্তিরা কি খবর রাখতো, কোত্থেকে কারা এই খাবার দেন? কেমন তাঁদের সঙ্গতি? কে রাখে কার খবর?

এর মধ্যে এলাকার গরিবদের জন্য কাজের বিনিময়ে গম-চালের ব্যবস্থা করলাম। গোপনে পাক-সরকারের গম-চাল এনে লাগালাম রাস্তা মেরামতে। পাক-আর্মির চলাচলেও রাস্তা মেরামত দরকার ছিলো। দেশের রাস্তা পাকা হোক। গরিব লোকের কাজ মিলুক। তাদের ঘরে খাবার থাকলে মুক্তিদের খাওয়াবেন তারা। গেরিলার গোপন কার্যক্রমে আগাম জানান দিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। সে-রাস্তা মেরামত ও ইট ভেঙ্গে আটা জোগাড় করেন ভিখারি মা। মা-মেয়ের ৭টি রুটির তিনটিই মুক্তিদের জন্য বরাদ্দ।

সেদিনটি ছিলো আমার জন্য খুবই বিষাদমাখা ও ধিক্কারের দিন। ঘৃণা এসেছিলো নিজের ওপর। বড় অগ্নিমূল্যের গণসমর্থনের মুক্তিযুদ্ধ। বিজিত দেশে তাঁদের মুখে কি হাসি ফুটবে! অতি পিউরিটান স্থানীয় নকশালিরা শ্রেণী-শত্রু খতমের নামে পাক-সরকার থেকে গম-চাল আনার কন্ট্রাক্টরকে হত্যা করে। ঘাতকরা ধরা পড়ার পর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলো। কিন্তু মঞ্জুর হয়নি তাদের শেষ মিনতি। তরুণ নকশালরা শ্রেণী-শত্রু খতমের নামে যাদের মারলো তারা তো আর ফিরে আসবে না। কিন্তু মনে থাকবে জমিলা ও তাঁর কন্যার অবদানের কথা। তাঁদের দেওয়া রুটি বাঁচিয়েছিলো মুক্তিদের জীবন। বাংলার ঘরে ঘরে মাঠে-প্রান্তরে যতোদিন থাকবে এমন এমন দীন-দরিদ্র মা-বোন, ততোদিন এদেশ থাকবে শত্রুমুক্ত। অজেয়। এঁদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যই তো মুক্তিযুদ্ধ।

নাছিমা আখতার পারভীন

ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক মোহাম্মদ সফিক উল্লাহর পত্নী নাছিমা আখতার পারভীন। স্বামী সফিক একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বাসভবন ছিলো মুক্তির প্রাথমিক অস্ত্রাগার; মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা সেখানে হতো। অধ্যাপক সফিক বাসার কাউকে কিছু না বলেই কুস্টিয়া দখলের মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সম্ভবতঃ দিনটি ছিলো ৩০ মার্চ ১৯৭১। সফিক আহত ও বন্দি পাকসেনাদের

কয়েকজনকে নিয়ে ক্যাডেট কলেজের গেটে এলেন। সর্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত। রণক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি খাবার চাইলেন ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের সকলের কাছে। শিক্ষক-অশিক্ষক, ধনী-নির্ধন সকলের কোয়ার্টার থেকে খাবার এলো তাঁর বাসায়। অবাঙালি-বিহারি প্রফেসর ও অধস্তন বিহারি বাসা থেকেও পারাটা, আটার রুটি, ডিম, ভাজি ইত্যাদি এলো। কে যে রটিয়ে দিলো, বিহারিরা নাস্তায় মুক্তি মারার বিষ মিশিয়ে দিয়েছে জানা যায়নি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এসব সামাল দেন পারভীন। অন্যথায়, তাৎক্ষণিভাবে ক্যাডেট কলেজে বিহারি হত্যায় রক্ত-গঙ্গা বইতো।

প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে সফিকউল্লাহ যশোরের উদ্দেশে যুদ্ধে রওয়ানা দেন। যুদ্ধের জয়-পরাজয়-অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি বাসায় এসেছিলেন। স্বামীকে নিজ হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে পারভীন আবেদন জানান, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে এ-মুহূর্তে বাসায় কেন? আল্লায় নছিবে বৈধব্য রাখলে কিই-বা করার আছে? যাও, যুদ্ধে যাও। দেশ স্বাধীন করে তবে ফিরে এসো। বাংলার অগণিত মা-বোনদের যা গতি, আমারও তাই হবে। টিনএজার ডলপুতুল প্রিয়তমার আদত রূপ দেখে বিমুগ্ধ হন যোদ্ধা স্বামী। সকল বেদনা ভুলে দুরন্ত স্বামী পুনরায় ঝাঁপ দেন মরণযুদ্ধে। এমনি পত্নী ঘরে থাকলে যুদ্ধ করে মরেও সুখ।

পত্নীকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে স্বামীর যুদ্ধ-যাত্রা। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান সফিক। ঝিনেদা-যশোর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক বিপর্যয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে স্বামী সফিকউল্লাহ নিরুদ্দেশ হন। এমতপরিস্থিতিতে ক্যাডেট কলেজের একাউন্টস-অফিসার আবুল হোসেন, তাঁর পত্নী, নিহত অধ্যাপক আবদুল হালিমের পত্নী ও তাদের কাজের মেয়েসহ পারভীন ভাসুরের সন্তানদেরসহ নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। কারণ, ক্যাডেট কলেজের বরাভয় অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মঞ্জুরুর রহমান তমঘা-ই-জংকে ক্যাডেট কলেজ মসজিদ ও ডি-টাইপ কোয়ার্টারের মাঝের লনে হত্যা করেছে পাক আর্মি। হালিমকেও নৃশংসভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও গুলিতে হত্যা করে শত্রুরা। যশোরের ব্রিগেডিয়ার দুররানীর নিশ্চিত নিরাপত্তা-আশ্বাসের পরও সংঘটিত এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে ক্যাডেট কলেজে থাকার আর ভরসা পেলেন না পারভীন। ভাসুরের তিনটি এতিম ছেলে মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, মোহাম্মদ শামসুল আলম ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান–এদের সঙ্গে নিয়ে একাউন্টস অফিসারের সাহায্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ক্যাডেট কলেজ চত্বর ছেড়ে এসে তাঁরা আশ্রয় নেন ফরিদপুরের বালিয়াকান্দা থানার ডোমাইন গ্রামে। সে-গ্রামেরই বাসিন্দা ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের একাউন্ট্যান্ট কাউসার আলি। এঁরা সবাই মিলে ছন্নছাড়া মুক্তিপরিবারের জন্য পরিত্যক্ত একটি হিন্দু বাড়িতে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

বিপদের ওপর বিপদ। ভাসুরপুত্র ছলিমউল্লাহ টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিতিকিচ্ছির কাণ্ড করে। এদিকে যোদ্ধা স্বামীর রেফারেন্সে প্রধান সেনাপতির পাঠানো দূতের সঙ্গে পারভীন গেলেন না ভারতে প্রবাসী জীবনে। দূত কলেজেরই কর্মচারি-ইলেক্ট্রিসিয়ান পারভীনের কাছে চাইলেন তাঁর সোনাদানার অলংকার। উদ্দেশ্য নিরাপত্তার হেফাজতে রাখা। অভিজ্ঞান শকুনতলার মতো স্বামীর লিখিত নির্দেশনার বাইরে তিনি বিপদের ঝুঁকি নেন নি।

ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আবুল হোসেন পারভীনকে তাঁদের বাপের বাড়ি ঘুরিয়ে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু সন্তান-সম্ভবা পারভীন নতুন পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ বোধের অভাবে পুনরায় চলে আসেন বাপের বাড়ি।

বাপের বাড়িতে পারভীনের মরণ দশা। বড় বোন জ্যোৎস্না আরা জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে ভর্তি করান কুমিল্লা সিভিল হাসপাতালে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ তাঁদের কোল আলো করা কন্যা-সন্তান পৃথিবীতে এলো। সংজ্ঞাহীন একলেমশিয়া রোগিনীর সন্তান প্রসব। রোগিনী হাসপাতাল ফ্লোরে। নতুন অতিথি হাসপাতালের টেবিলে পৃথিবীর আলো-বাতাসে কান্না-কাটি করে। অকস্মাৎ যমদূত-প্রায় শেল আঘাত হানে হাসপাতালে। সবকিছুতে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। কে যে কোথায় আশ্রয় নেয়? শেল-ঝড়ের তাণ্ডব যেতেই শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে না। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে, বহু খুঁজে পেতে সন্ধান মিলে চুয়াল্লিশটি ছোট-বড় মাংশের টুকরায় নয়-পাউন্ড ওজনের বাচ্চার। নানু-খালা-মা-ডাক্তার-নার্স-আয়ার উপস্থিতিতে নিয়তির এমন খেলা। কন্যার চিন্তা পরে হবে। ফল গেছে, এখন গাছ নিয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই একজোট ও অনড় ঐক্যের প্রতিজ্ঞা করে–সংজ্ঞা এলে মাকে বলা হবে, মৃতা কন্যা প্রসবের কারণে তাকে মাটি দিয়ে সৎকার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন সে-অন্ধবিশ্বাসে অটুট ছিলেন পারভীন।

যুদ্ধের মাঝেই যোদ্ধা-স্বামীর ব্যাটম্যান ইপিআর সৈনিক আনুমিয়া নিজের খরচে ক্যাপ্টেন পত্নীকে দেখে যান। তাঁর যোদ্ধা-স্বামী বেঁচে আছে, এ খবর দিয়ে যান বেগম সাহেবাকে; যেন বেঁচে থাকার এক ক্ষীণ আশ্বাস, তাঁর বাঁচার প্রেরণা।

যুদ্ধশেষে তিনি স্বামীর ছোটভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলিমউল্যা মিয়ার আশ্রয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা যান। ডিসেম্বর ১৯৭১ গত। ১৯৭২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ এলো। যোদ্ধা স্বামীর কোনোই খোঁজ নেই। অগত্যা স্বামীর উদ্দেশে লিখেন সংক্ষিপ্ত শেষ চিঠি। " প্রিয়তম, বেঁচে থাকলে তোমাকে একবার দু'চোখ ভরে দেখতে চাই। তুমি তোমার মুক্তিপুত্রদের নিয়েই থাকো। তোমার পথে আগের মতো কাঁটা হবো না। একবার, শুধু একবার তোমাকে দেখতে চাই।" কোনো দোরেই স্বামীর বেঁচে থাকার খবর পেলেন না। তাঁর যুদ্ধ-সাথী ক্যাপ্টেন মাহবুব ও তৌফিক-এলাহীর খবরে আস্থা পেলেন না। বেঁচেই যদি থাকবে তবে সবাই ঘরে ফিরলো, সফিক কই?

অগত্যা বীরজায়ার শেষ মিনতি-আনতির পত্র নিয়ে তিনি সেনাপতি ওসমানীর পায়ে গিয়ে পড়েন। ব্যাচেলর সেনাপতিকে পারভীন বললেনঃ আপনি বিধবার বৈধব্যের জ্বালা বুঝবেন না। আমার স্বামী মারা গেলে তাঁর সংবাদ সরাসরি আমাকে দিতে দোষটা কোথায়? যুদ্ধাহত শহিদ স্বামীর কবর জিয়ারতের হকও কি বিধবার নেই? এই কি মুক্তিযুদ্ধের নিয়ম? এই কি স্বাধীনতার নামে জীবন উৎসর্গ করে যোদ্ধা পরিবারের জন্য পুরস্কার? াকেই কি বলে পৃথিবীর যুদ্ধনীতি? আমি স্বামীর কবর দেখতে চাই। কবর খুড়ে তাঁর দেহ রখ করে দেখতে চাই। শেল-গুলির দাগ তাঁর পেছনে লেগেছে, নাকি সামনে? সে কি পুরুষের মতো পালাতে গিয়ে মরেছে, না বীর পুরুষের মতো মরেছে সম্মুখ সমরে, ক্ষত খে সে-সব যাচাই করতে চাই। বৈধব্যে দুঃখ নেই। আমি জানতে চাই আমি কাপুরুষ

না বীরপুরুষের স্ত্রী! আমি তাঁকে চিনি। সে খুবই একরোখা জেদি মানুষ, যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে পারে না। সেনাপতি আপনি নীরব কেন? ত্রিশ লক্ষ শহিদের মাঝে একটা বাড়তি-কমতিতে কি আসে যায়!

রুদ্ধবাক এবং আনন্দাশ্রুতে আবেগাপ্লুত ওসমানী। "মা, আপনি একজনের জ্বালায় জ্বলছেন। ত্রিশ লক্ষ বিদেহী শহিদ আত্মা মা-বোন-পুত্র-স্বামী-স্ত্রী-সৈনিক বেদনায় আমার অন্তর্জ্বালা কাহারে বুঝাই রে!" ওসমানী তাৎক্ষণিক ওয়্যারলেস, টেলিফোনে সর্বদ্বারে ক্যাপ্টেন সফিকের খোঁজ নেন।

যশোর ৫৫ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার লেঃ কর্নেল আবুল মঞ্জুর বীর উত্তম, পিএসসি'র নিকট ক্যাপ্টেন সফিকের সঠিক খবর পেলেন ওসমানী। ক্যাপ্টেন সফিক সাতক্ষীরা, ফুলতলা (খুলনা) ও বাগেরহাটের মিলিশিয়া ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনায় উদয়াস্ত ব্যস্ত। সাতক্ষীরা মিলিশিয়া ক্যাম্পের তিন হাজার বিদ্রোহী মিলিশিয়ার ঘেরাওতে ওসমানীর আদরের ক্যাপ্টেন সফিক অবরুদ্ধ। ১৯৬৮-১৯৬৯-এর এক রোজার রাতে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সফিকের ঘনিষ্টভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিলো। ওসমানী আজ সুদীর্ঘদিন পুরনো ঘটনার নিবিড় স্মৃতিচারণ করেন।

বেনাপোল বর্ডারে কুস্টিয়া-যশোর যুদ্ধ সাফল্যের স্বীকৃতিতে তাকে সরাসরি ক্যাপ্টেন পদবিতে স্বাক্ষরের প্রশংসায় ওসমানী। সফিকের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সাতক্ষীরার মুক্তাঞ্চলে মন্ত্রী পরিষদ ও বিদেশি সাংবাদিকসহ ঘুরে দেখার বিগত স্মৃতিতে বেগম সফিককে আশ্বস্ত করতে চাইলেন ওসমানী। অসাধ্য সাধনের মতো যশোর-মনিরামপুরে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন সফিকের মুক্তাঞ্চল গঠনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সেনাপতি। মনিরামপুর মুক্তাঞ্চল গঠন স্বাধীনতার ডিসেম্বরের পূর্ব-ঘটনায় ক্যাপ্টেন সফিকের মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের মতো প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেনাপতি। তিনি পত্রটি সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুরের মারফত ক্যাপ্টেন সফিকের কাছে পাঠানোর নিশ্চয়তা দেন। সকৃতজ্ঞ ওসমানী ভাঙ্গা আর্মির যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবস্থার সংগঠনে নিয়োজিত যুদ্ধাহত রণক্লান্ত ক্যাপ্টেনকে তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে না-পাঠানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন মিসেস সফিকের নিকট থেকে। এবার সেনাপতির সখেদ দুঃখ, একটি তাপিত প্রাণের জ্বালায় প্রবোধ দেওয়া গেলো। ত্রিশ লক্ষ বিদগ্ধ প্রাণের অনির্বাণ রাবনের চিতাভস্ম যদিও জ্বলছে আমার প্রাণ, সে-দুঃখ কাহারে সুধাইরের হাকাকার কান্নায় লুটিয়ে পড়লেন ওসমানী।

যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার মঞ্জুর সশস্ত্র-বিদ্রোহীদের কবল থেকে ক্যাপ্টেন সফিককে উদ্ধারের উদ্দেশে ছুটে গেলেন সাতক্ষীরার মিলিশিয়া ক্যাম্পে। বিদ্রোহীদের আশ্বস্ত করে তিনি ক্যাপ্টেন সফিককে সরিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে লেখা মুক্তি-পত্নীর পত্র বিদ্রোহীদের পড়তে দেন। সরবে সে-পত্র প্রকাশ্য দরবারে পাঠ করা হলে বিদ্রোহীদের চোখের পানি টলটল পড়ছে জামা-কাপড়ে। সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুর নিজেও আক্ষেপ করেন। যুদ্ধ শেষ। আপনারা সবাই ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছেন। ক্যাপ্টেন সফিক আপনাদের ভালো-মন্দের ব্যবস্থাপনায় পড়ে থাকার এই পুরস্কার আপনারা তাঁকে দিলেন? সুদীর্ঘ যুদ্ধকালে তিনি তো ভুলেও তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর নাম

উচ্চারণ করেন নি। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে তাঁকে আনারও চেষ্টা করেন নি। ইচ্ছে করলে আপনাদের মাধ্যমে তিনি সহজেই তা করাতে পারতেন। সবাইকে ছুটি দিয়ে তাঁর আন্ডার-কমান্ড প্রতিটি মুক্তি-গেরিলা পরিবারের সুখ-দুঃখের নিশ্চিত খবরের পর ছুটি নেওয়ার ধনুর্ভঙ্গ পণ করার এই প্রতিফল পেলেন? তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। তাঁকে আমরা নিষেধ করেছিলাম যে প্রফেসর সাহেব, আপনার মুক্তিপুত্রদের জন্য অতি আদিক্ষেতা বিপদ ডেকে আনবে। যুদ্ধকালে গোঁয়ার্তুমির মতো তিনি কারো কথা শুনলেন না। এবার তিনি যোগ্য পুরস্কার পেলেন! পিনপতন নীরবতায় তিন হাজার লোডেড এমুনিশন, সঙিন উঁচানো রাইফেল ফেলে বিদ্রোহী মিলিশিয়ার সরোদন কান্না। তাঁরা ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

রগচটা ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়ে নেওয়ার সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুর-এর প্রয়াস ভেস্তে গেলো। এবার উল্টো তারা মঞ্জুরের গাড়ি থেকে ক্যাপ্টেনকে ছিনিয়ে নেয়। মূল গোল বেঁধেছিলো মিলিশিয়াদের চাকরি দিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শারীরিক মাপ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন সফিকের স্কুল-মাস্টার সুলভ দাড়ি-কমার সূচিবাই।

সবার আফসোস অদেখা মুক্তি-পত্নীকে নিয়ে। একটি মাত্র চিরকুট মার্কা পত্রে তিন হাজার বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী সশস্ত্র মিলিশিয়ার হার মানা। ধন্য গরবিনী মুক্তি-পত্নী। ধন্য তোমার যোদ্ধা স্বামী-প্রেমের চিরকুট পত্র। পত্রাঘাত অস্ত্রাঘাতের চেয়ে বেশি তেজি।

স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা-পুত্রদের নিয়ে তাঁর বিপাক বাড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে, আরামের খাবার খেয়ে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর টোনাটুনির সংসার। মুক্তিযোদ্ধা পুত্রদের পরিবেশনের পর তাঁর ভাগ্যে কিছুই থাকে না। তিনি সবার অগোচরে আরেক মুক্তিযোদ্ধা বড়বোনের বাড়িতে গিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন।

ঝিনেদার হাটবাকুয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পুত্রের বিএসসি পরীক্ষা ফি নেই। মুক্তিমাতা পারভীন ঈদের বাজারের সমুদয় অর্থ মুক্তিপুত্রের পরীক্ষার ফি যোগাড়ে ব্যয় করেন। এমনি মুক্তিযোদ্ধা সৎকারে তাঁর জীবনের অনেক সুখই অপূর্ণ আছে।

মঙ্গল রানী

কুমিল্লা ব্রিগেড সদরের নাপিত রমনীমোহন শীলের স্ত্রী মঙ্গল রানী। কুমিল্লা ক্যান্টের ধারে কাছে পাওয়া পুরুষ-বাঙাল মাত্রই ফাটকে আটক। ২৫ মার্চ ১৯৭১ কাল রাত থেকেই কুমিল্লা সেনানিবাসে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সূচনা। প্রবল গোলাগুলিতে ধরণী কম্পমান। যেন সাক্ষাৎ কেয়ামত। বন্দি স্বামী রমনী আছে কি নেই সেই দুশ্চিন্তায় মঙ্গল রানী উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মান। ক্যান্টের পাঞ্জাবি মালি সিপাহি হেদায়েত উল্লাহকে বাপ ডেকে স্বামীর খোঁজ আনতে পাঠায়। স্বামীর জন্য খাবার পাঠায় উক্ত সুইপারের মাধ্যমে। এ যে দুঃসাধ্যেরও অসাধ্য কাজ। অক্ষত স্বামীকে ফেরত পেয়ে ঈশ্বরের দরবারে শুভাশীষ জানায় হৃদয় নিংড়িয়ে। এবার রমনী কোয়াটারের আশেপাশে এলান করে দেয় সকল পুরুষ বাইরে ,আসো। পাশের বাড়ির পুরুষ হিন্দু শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাশ সুইপারকে

মঙ্গলরানীর উদ্যোগে রক্ষা করেন। কাঁথা-বালিশ, থালা-ঘটি-বাটি-লাকড়ির আড়ালে ছুপিয়ে পুরুষ সুইপারকে রক্ষা করা হয়।

বাঙালি পুরুষ মাত্রকে ক্রোজ করতে বাঙালি পরিবারের অভয়ারণ্য রমনী কোয়াটারে তাঁদের আশ্রয় হয়। তাঁদের সান্ত্বনা আশ্বাস আশ্রয় ও নিরাপত্তার উদ্যোগ নেন মঙ্গল রানী। কুমিল্লা নরমেধযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী চাক্ষুষ প্রমাণ রমণীকে নিয়ে পাক আর্মি বিপাকে পড়ে। তিনি পাক আর্মির নিরাপত্তা হেজার্ডের দুর্গ্রহ। রমনীকে গরুখোর মুসলমান বানিয়ে স্বস্তি পেতে চায় পাক গোয়েন্দা মেজর সেলিম। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। রমনীকে চাপ দেওয়া হয়, তার স্ত্রী মঙ্গল রানীকেও মুসলমান বানাতে হবে। ধর্মের ভাই মুসলমান ব্রিগেড ক্যান্টিন-কন্ট্রাক্টর হাকিম আলির পায়ে পড়ে মঙ্গল রানী, "ভাই, আমারে বাঁচা"। সপরিবারে ডালেমূলে ধ্বংসের অমঙ্গল শুনতে পায় হাকিম আলি। হিন্দু বোন মঙ্গল রানীকে হাকিমি দাওয়াই দেয়, "প্রাণে বাঁচতে হয় তো মুসলমান হওয়ার অভিনয় করো"। এবার হাকিম আলি তাকে আল্লাহ-রসুল ও কলেমায় তালিম দেন। স্বাধীনতার শেষ লগ্নে স্বামীর সঙ্গে লটবহর নিয়ে গ্রামে পালিয়ে যায় মঙ্গল রানী।

চরম বিপর্যয়ে স্থির প্রজ্ঞার প্রশান্তিতে কি করে সবদিক সামলানোর এমন উপস্থিত উদ্ভাবনী সৃজনী শক্তির পরিচয় দেয় রমনী-স্ত্রী, সত্যি তা অকল্পনীয়। তাঁর অনুরূপ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত থেকে অন্যরা শিক্ষা পাবেন। কুমিল্লা ট্র্যাজিডির জীবন্ত স্বাক্ষী রমনীমোহন শীল-পত্নী মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত প্রতীক। তাঁর কল্যাণ হোক।

বানাশুয়ার সূর্যবানু

১৯৭১-এ ময়নামতি সেনানিবাসের অনেক অকথিত বেদনা-বিধুর অধ্যায় আজ বিস্মৃতির পথে। কুমিল্লা শহরের পাশেই বানাশুয়া গ্রাম। আমার কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র। পাক আর্মি সেখানে আটঘাট বেঁধে মুক্তিধ্বংসে মেতে ওঠে। হিন্দুর গন্ধ পেলে আর রক্ষা নেই। বানাশুয়ার এক হিন্দু ছেলে দেবনাথ। ফুটন্ত তারুণ্যের কিশোর। উর্দু-ইংরেজির বোলচালে তালগোল পাকিয়ে 'রানা' ছদ্মনামে কাজ করে। পাক আর্মিকে বিভ্রান্ত করতে উর্দুতে তার বাঙ্গাল নির্যাতনের প্রতিশোধে শিকার হয় বিহারিরা। পাক আর্মির সঙ্গে থেকে মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দার কাজ করছে সে। ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সঠিক নিশানায় পাক-বাংকারে পড়ে মুক্তি বাহিনীর শেল। পাক আর্মির শৌর্যের গৌরবে ধ্বস নামে। একটার পর একটা অঘটনে তাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একদিন কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডারের গাড়ি যায় সিলেটের পথে, তাদের উদ্দেশ্য মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করা। সে গাড়ির চালক কুমিল্লা শাসনগাছা 'হক মটর্স'-এর মুক্তি-গোয়েন্দা আবদুল হক। যাত্রা পথে কনভয়ের অংশবিশেষ ধ্বংস হয়। অলৌকিকভাবে প্রাণে রক্ষা পান ব্রিগেড কমান্ডার। এবার মুক্তি বাহিনী ছেড়ে পাক গোয়েন্দারা অন্ধের মতো খুঁজতে থাকে মুক্তির গোয়েন্দাদের। পাক আর্মি সঠিক নিশানায় খুঁজে পেতে পাকড়াও করে বানাশুয়া গ্রামের দেবনাথকে।

লিঙ্গ পরীক্ষায় তার হিন্দুত্ব প্রমাণিত হয়। আর যায় কোথায়, নিজের গ্রামেই আজ তার প্রাণ যায়। দেবনাথের পাশের বাড়ির মুসলমান মেয়ে সূর্যবানু। তারা ছিলো ছোট বেলার খেলার সাথী। নামের সাথে চেহারার অপূর্ব মিল সূর্যবানুর। তাকে সচরাচর বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। সূর্যসম তেজের মতোই নজর কাড়া সৌন্দর্য তার। রাতের আঁধারে মুক্তি দূতীর কাজ করতো। মুক্তিদের আশ্রয়-আহার-শুশ্রূষায় গোপনে কাজ করতো সে। অত্যন্ত ধার্মিক মেয়ে, সুরেলা কণ্ঠের কোরান পড়তো বানু। পাঁচ বেলা নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে মুক্তিদের তরক্কির জন্য ফানা চাইতো। স্বাধীনতার জন্য দোয়া করতো সব সময়। রাতের বেলা মুক্তিদের সাথে অস্ত্র খোলা ও জোড়া লাগানোর তালিম নিতো সূর্যবানু। দু'দলের গোলাগুলির মাঝে রাইফেল চালনাও কসরত করতো।

সূর্যবানুদের বাড়ির বাংকারের কাছে ধরা পড়ে দেবনাথ। আজ মুক্তিযোদ্ধা দেবনাথের নিশ্চিত মৃত্যু হবে পাক-ঘাতকের গুলিতে। পাঠান সুবেদারের উদ্যত রাইফেল তখন তাক করা দেবনাথের খুলি উড়াতে। আশপাশের প্রিয়মুখগুলিতে আজ বেদনার ছায়া। মন্দভাগ্য মুক্তির জন্য আজ কেউ কিছুই করতে পারছে না।

রাইফেলের ট্রিগারে হাতের আঙ্গুল পাঠান সুবেদারের। অন্তিম মুহূর্তে ভগবানের নাম স্মরণ করে দেবনাথ। ঘর থেকে এসব দেখছিলো সূর্যবানু। অকস্মাৎ ঘরের দরজা আঁটে সূর্যবানু। বাড়ির সবাই ভাবে, যাক মেয়েটি রক্ষা পাবে। ঝটিতি অপূর্ব সাজে সাজলো সে। সাজ তো নয় যেন বাসর সজ্জাকে লজ্জা দেবার টেক্কা। তার গায়ে মাখা আতরের সৌরভের আভায় চতুর্দিক আমোদিত। বিয়ের শাড়ির মতো ঝলমলে চমকের শাড়ি পরলো বানু। এবার সূর্যরশ্মির তেজের মতো মহাঝড়ের প্রলয় নাচনে উদ্যত পাঠানের রাইফেলের মুখে বুক পেতে দাঁড়ায় সে। মুক্তি হিন্দু ভাইকে বাঁচাতে হবে। এত্না খুব ছুরত বাঙ্গাল লাড়কির রূপের আভায় বিমোহিত পাঠান সুবেদার। বাত্যাহত বেতস লতার মতো লুটিয়ে পড়ে সূর্যবানু পাক সেনার পায়। 'ইয়ে হামারা ভাই হ্যায়। ম্যায় ওনকো মাফি মাংগতা।'

ইজ্জত দিয়ে মুসলমান বোন সূর্যবানু বাঁচায় হিন্দু ভাই দেবনাথের প্রাণ। বাংলার মা-বোনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কাব্য করার দরকার নেই। পাক নমুদের লালসা মিটলো, বাঁচলো মুক্তিসেনা দেবনাথ।

১৯৮৮ সালে কুমিল্লা টিপরা বাজার ময়নামতি স্টুডিতে দেবনাথের সাথে দেখা হয়। আমার সখের তথ্যানুসন্ধানের দিন শেষে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দেবনাথ। স্যার, মনের দু:খ কারে কই। আমাদের আদরের সূর্যবানু আজ বেঁচে নেই।

এদেশের মহাপ্রাণ তরুণদের হৃদয় ঔদার্যের দুয়ারে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্বাধীন দেশে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে তাঁরা সূর্যবানুকে বিয়ে দেন। সূর্যবানুর ইজ্জতের প্রকাশ্য লুট কোনো অজানা অধ্যায় ছিলো না। এতো কিছুর পরও প্রেয়সী বধূর মর্যাদায় তিনি সমাজে স্থান পান। কুমিল্লার বানাওয়ার সাধারণ জনতাকে জাত-পাতের উর্ধ্বে মা সূর্যবানুকে

সম্মান-ইজ্জতের আসন দেওয়ায় দুর্ভাগা দেশের মন্দভাগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার নৈবেদ্য নিবেদন করি।

সূর্যবানু মরেও অমর। দুর্দিনে মা সূর্যবানুরা এদেশের অবলাদের সবলার নিদর্শনের কাজ করবেন। সূর্যসম তেজের আভায় মা সূর্যবানুরা কালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানোর ইতিহাস আলোকিত করুন। গোমতিকূলে প্রতিদিনের প্রভাতী সূর্যেনে আজো সূর্যবানুর রূপের আভা ছড়ায়।

শামসুন্নাহার রাব্বী

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে চরম অরাজকতার মাঝে কুমিল্লার অকথিত-অজানা ট্র্যাজিডি উদ্ধারে উদয়াস্ত পরিশ্রমে লাগলেন শামসুন্নাহার। তিনি তখন তাঁর বয়সের ভারে ন্যুব্জ। প্রাক্তন সেনা অফিসার স্বামী ফজলে রাব্বিকে নিয়ে লক্কর মার্কা জিপে চষে বেড়ান কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায়। অসাধ্য সাধনের মতো তিনি ময়নামতি ক্যান্টের হত্যা-পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী রমনীমোহন শীলকে আবিষ্কার করেন। শামসুন্নাহার ছিলেন কুমিল্লার সাপ্তাহিক 'আমোদ' পত্রিকার সম্পাদিকা। এই 'আমোদ'-এ রমনী-বৃত্তান্ত প্রকাশের পরই চতুর্দিকে আলোড়নের সূচনা ঘটে। পৃথিবীর সকল মিডিয়া ছুটে আসে কুমিল্লায়। রমনীর নির্দেশিত স্থান থেকে অফিসারসহ সাতাশজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। শামসুন্নাহার রাব্বি ও তাঁর সম্পাদিত আমোদ-এর কল্যাণে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেলো কুমিল্লা সেনানিবাসে পাক-নরমেধযজ্ঞের জীবন্ত নিদর্শন। যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে শামসুন্নাহার রাব্বি মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃতিসমূহ সংরক্ষণ করেন, তার জন্যই তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আসনে উপবিষ্ট। কুমিল্লার শহিদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা ও কৃতজ্ঞ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

মহিলাদের পতাকা যুদ্ধ

১৪ আগস্ট ১৯৭১। সে-দিন ঢাকা শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়। এই মহতী কাজে উৎসাহ প্রদানসহ পটভূমিকা ও পরিকল্পনায় ছিলো ২নং সেক্টর। দুঃসাহসী কর্মসূচির সম্মুখসারিতে নেতৃত্বে ছিলেন আসমা, রেশমা ও সায়মা-মহিয়সী এই তিন নারী। এঁরা আপন তিন বোন। তাঁদের সঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিলো; আরো ছিলো স্টেনগান, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ, ইত্যাদি।

প্রথমে তাঁরা ২০০ পাকিস্তানি পতাকা তৈরি করেন। ঢাকার আকাশে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো হয় বেলুনের সাহায্যে। আজিমপুর, তোপখানা রোড, স্টেডিয়ামের মতো জনাকীর্ণ স্থানে বিভিন্ন গাড়িতে পতাকা সেঁটে ও গাড়ির পতাকা রাখার জায়গায় কাগজের পতাকা লাগিয়ে আলগোছে সটকে পড়েন। এতদদৃষ্টে পাকসেনারা ক্রোধে ও রোষে ফেটে পড়ে। হায়! একি কাণ্ড! খোদ ঢাকা শহরে নাজায়েজ জয়বাংলার পতাকা!

প্রসঙ্গক্রমে ২রা জুন ১৯৭১-এ যেতে হয়। ভারতের ২৪ পরগণার খান পরিবারের নিবাস হাকিমপুর গ্রামে। সে-খান পরিবারের মেয়ে তৈরি করেন জয়বাংলার পতাকা। তিনি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় দেশের ভেতরে বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে উড়িয়ে দেন সে-পতাকা। শুধু পতাকা উড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। অলক্ষ্যে অস্ত্র তাক করে প্রতীক্ষা করতে থাকেন কেউ আসে কিনা পতাকা উপড়াতে। রাত না পোহাতেই পাকিস্তানি হায়েনারা এলো পতাকা সরাতে। এই পতাকার কারণে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পাক-বাহিনী ও মুক্তিদের মধ্যে চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে বাংলাদেশের ভেতরে সে পতাকা দেখা যায়। গোলাগুলির প্রচণ্ডতার মধ্যে দিনের আলো, কিংবা রাতের আঁধারেও পাকিরা এই পতাকা নামাতে পারেনি। আমার প্রেরণাদাতা বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রাজ্জাক খান এবং মাওলানা আকরম খাঁর স্মৃতিধন্য খান পরিবারের পতাকা তৈরির শিল্পী-যোদ্ধা স্নেহময়ী কন্যাকে আজ মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ বত্রিশ বছর পরেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

এপ্রিলের শেষ (১৯৭১)। বেনাপোল সীমান্তের কাগজ পুকুরে ৮ নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। ওসমান-পত্নী নাজিয়া গভীর রাতে আর্ন্তজাতিক সীমান্ত রেখার ভেতরে প্রোথিত বাংলাদেশের পতাকা পাহারা দিতে সশস্ত্র গার্ড চেয়ে পাঠান। বিষয়টি বুঝে ওঠার আগে অনেকে মনে করেছিলেন, তিনি নিজের প্রহরার জন্য গার্ড চাচ্ছেন। পরে, বিষয়টি প্রশংশিত হয়েছিলো। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বেনাপোল সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমা রেখায় পোঁতা সে সগৌরব পতাকা শত সাধ্যসাধনায়ও পাক-আর্মি সরাতে পারেনি।

রেফারেন্সঃ মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, সম্পাদনাঃ ফরিদা আখতার।

মহিষাহাটির আমিরুন্নেসা

১৩ এপ্রিল ১৯৭১ যশোর-কালিগঞ্জ-মান্দারতলার যুদ্ধে মুক্তি প্রতিরক্ষার পতন ঘটে। মহিষাহাটির বিচ্ছিন্ন বাংকারে আটকা পড়া দু'জন ইপিআর পোশাকের বেঙ্গল সৈনিককে জীবন্ত কবর দেয় পাক-আর্মি। সবাই পালালেও বৃদ্ধা আমিরুন্নেসা ঘর আগলে ছিলেন। শত্রু চলে গেলে কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে কবরবাসীদের তিনি উদ্ধার করেন। এদের একজন তখনো জীবিত।

মান্দারতলার যুদ্ধ ঃ যশোর-কালিগঞ্জ থানা মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ডতায় উন্মত্ত। বার বাজার পেরিয়ে যশোর মুখে মান্দারতলায় প্রতিরোধব্যূহ রচনা করেছি। সেদিনটি ছিলো ১৩ এপ্রিল। দু'দলে চলছে মরণপণ লড়াই। শত্রুর দূরপাল্লার কামান ও যুগপৎ পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে শেষ পর্যন্ত লড়াই হয় মুখোমুখি ও হাতাহাতি। অবশেষে হার মানে স্বল্পসংখ্যার অপরিণত মুক্তিবাহিনী। যশোর ক্যান্টের ১০ মাইলের ব্যবধানে মান্দারতলা প্রতিরোধ-ব্যূহের পতন ১৩ই এপ্রিল ১৯৭১।

যশোরমুখি পাকা সড়ক রেললাইনের পশ্চিমে সুবিস্তৃত বনবনিয়ার মাঠের কাছে মুরাদগড়ের পাশে মহিষাহাটি। সে-মহিষাহাটির যুদ্ধে বাংলা-মহিমের যুদ্ধের প্রবাদকে হার মানায়। মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা এখানে প্রচুর। পাক-আর্মির ৬ জনের লাশ পড়ে আছে। উত্থান-শক্তি রহিত আহত-ক্লান্ত-শ্রান্ত আট-ন'জন মুক্তিকে পাক-আর্মি পরিবহন জিন্দাবাদ ধ্বনির দীপ্ত-তেজের মহিমায় শেষ করে।

একটি বিচ্ছিন্ন মুক্তি বাংকারে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দু'জন সৈনিক আকস্মিকভাবে আটকা পড়ে। তাদের একজন আহত। অপরজন অনাহত দুর্বল। আহতকে রক্ষার সহমর্মিতায় অনাহতজন রয়ে গেছে। সশস্ত্র পাক-আর্মি তাঁদের ঘিরে ফেলে। সারেন্ডারের হুঁশিয়ারি ভেরেণ্ডাভাজার মতো প্রত্যাখ্যান করে। ৫০ জন শত্রুর ঘেরে তাঁরা তখন মৃত্যুর দুয়ারে। বাংকারের ওপরের এক পাশের আচ্ছাদন সরিয়ে ভিতরে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। এবার দু'জনই ক্ষত-বিক্ষত। বাস্তবে একজনই লড়েছেন ৫০ জনের সঙ্গে। আবার সারেন্ডারের শেষ হুঁশিয়ারি। উত্তরে ফিরে আসে সুতীব্র উপহাসঃ বাংলার বাঘ মারে বা মরে, সারেন্ডার করতে জানে না। দ্বৈরথ সঙিন যুদ্ধে শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করে আহত বাঘ বিদ্রুপের মশকারা পেলো। বয়স-বৃদ্ধ কালো হরিণ চাটে বাঘের গাল। আহত-ক্রুদ্ধ আক্রোশের ফোঁসনি সার। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে আহত শার্দুলের বাংকার থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে ৫০ জনের সম্মিলিত পাক-সেনার শক্তি। মৃতবৎ আহতজন তাঁদের জ্বালাতে বেয়নেটের সঙ্গে, অপরজনের রাইফেল কেড়ে নেয় পাক-আর্মি।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, নিজের রাইফেলের বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হন বেঙ্গল-সৈনিক। প্রচণ্ড হিংস্রতায় ৫০জন শত্রু-সৈন্যের পর্যায়ক্রমিক বেয়নেটের খোঁচায় এবং কাফের-নমরুদের মতো তাদের নির্মম রসিকতায় রক্ত ঝরে এবং জীবন বিলিয়ে দেয় বেঙ্গল সৈনিক। মহাভারতের অভিমন্যু হৃদয়ের তরল শোনিতে সপ্তরথীর হাতে অন্যায় সমরে নিহত হন। বাংলার অভিমন্যু ৫০ জন শত্রু-সৈন্যের সম্মিলিত বেয়নেটের খোঁচায় অন্যায় সমরে বাঙালির তদানীন্তন বিজয়-কেতন 'জয় বাংলা' ও মুসলমানের ঈমানী জোস 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উষ্ণ মাদকতায় নেতিয়ে এলেন বঙ্গ-মাতার গর্বিত সন্তান বেঙ্গল সেপাই। দলীয় নেতা ও কমান্ডার হিসেবে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলাম চরম বিপদে সঙ্গে থাকবো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাংলার অত্যুত্তম সৈনিকদ্বয় তাঁদের ক্যাপ্টেনকে পরিহাস করে অকালে ঝরে গেলেন।

শত চেষ্টা এবং চরম নির্যাতনের পরেও, অন্তিম মুহূর্তেও শত্রু তাঁদের মুখ দিয়ে পাকিস্তান-জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়াতে পারেনি। এ-বিষাদঘন বেদনাদায়ক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমিরুন্নেসা।

হৃদয়-ঔদার্য ঃ দু'পক্ষের হত্যা ও হানাহানির যুদ্ধ আতঙ্কের মধ্যেও অসীম সাহসে এগিয়ে এসে সাহায্য করেন স্থানীয় জনতা। মুক্তি-প্রতিরক্ষার পতনে পাকিস্তান আর্মি হত্যা-ধর্ষণ-জ্বালাও-পোড়াও-মারণ উৎসবের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। প্রাণ ভয়ে সবাই দিকবিদিক পালিয়ে যায়। মহিষাহাটির অসুস্থ বৃদ্ধা আমিরুন্নেসা ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেননি। পৌঁছে

পালানোর সামর্থও তাঁর ছিলো না। নিকট-দূরত্বে বেঙ্গল-সৈনিকদের বিভীষিকাময় আত্মাহুতির জীবন্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। নীরব অশ্রু-বন্যায় সেজদায় লুটিয়ে পড়েন মহান আল্লাহর দরবারে সৈনিকদের মঙ্গল কামনায়।

পাক সেনারা আহতদের জীবন্ত কবর দেন। পাক আর্মি চলে যেতেই উন্মাদিনীর মতন ছুটে চলেন আমিরুন্নেসা। শারীরিক সামর্থ না-থাকা সত্ত্বেও দুর্বল হাতে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ও ক্ষিপ্রতায় কবর থেকে সরাতে থাকে মাটি, কোদালের পর কোদাল। বোবা কান্নার আহাজারিতে কম্পিত হাতে কবর থেকে উঠান সন্তানবৎ সৈনিকদের। বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু-বন্যায় অভিসিক্ত তাঁর কবর-সন্তানেরা। একজনকে পেলেন মৃত। আমিরুন্নেসার আহাজারি দেখে কে! এতো চেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচানো গেলো না। দেশের জন্য জীবন দিয়ে সৈনিকরা দেখিয়ে গেলো এভাবেই স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে হয়। অপরজন তখনো সামান্য নাড়াচাড়া করছেন। দুর্বল দুটি হাত উপরে উঠানোর চেষ্টা। হাতের আঙ্গুল মোনাজাতের মতো করে জুড়ে আসতে চেয়েও সামর্থের অভাবে ওঠে না। কথা জড়িয়ে আসছে। তথাপি যেন বলতে চায় জ...য়....বা...বাংলা। লা...ই...লা...হা...ইল্লাল্লাহ। সব কথাই জড়িয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু-পাণ্ডুর অবস্থাতেও মুখে প্রশান্তির ছায়া। সৈনিকটি কি তা'হলে আমিরুন্নেসাকে কিছু বলতে চায়, দেশবাসীকে জানাতে চায়, জাগ্রত বাঙালিকে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলতে চান, আমাকে বাঁচান–আমি আবার যাবো যুদ্ধে, দেশকে স্বাধীন করতেই হবে। আর যদি মরেই যাই, যদি নিভেই যায় জীবন-প্রদীপ, তবে আপনাদের কাছে শেষ মিনতি, দেশটাকে স্বধীন করবেন। তাড়াবেন হায়েনাদের। বাংলার মাটি হায়েনামুক্ত হোক। অবশেষে ক্লান্তিহরণ মরণশান্তি চির নিদ্রার কোলে হারিয়ে গেলেন আমিরুন্নেসার এই অভিমানী মুক্তিপুত্র।

মহিষা হাটি গ্রামের এই মুক্তি শহিদরা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। স্থানীয় মানুষের ধারণা, তাঁর ইপিআর। পরনে ইপিআর পোশাক। ৩০ মার্চ যশোর সেনানিবাসে পাক-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অলৌকিকভাবে মৃত্যুর বেড়-জাল অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো। বেঁচে যাওয়া ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো অনেককে পেয়েছিলাম নিরাভরণ নগ্ন-প্রায়। বেঁচে যাওয়া অনেককে ইপিআর-এর পোশাকে সজ্জিত করেছিলাম। মূল যুদ্ধেও তাঁদের রেখেছিলাম তিন প্লাটুন সৈন্যের মাঝখানে। বলতে গেলে যুদ্ধের মধ্যমণি হিসেবে। ডানে-বামে ইপিআর। ১৩ এপ্রিলের যুদ্ধেও তাঁরা অক্ষত ছিলেন। মহিষাহাটির যুদ্ধে শহিদ এসব মহাপ্রাণ সৈনিকেরা মূলত ১ ইস্ট বেঙ্গলের দেশপ্রেমিক সৈনিক।

যুদ্ধের তাণ্ডবতায় এলাকার পুরুষেরা যখন ভেগে যাচ্ছিলো, অবলা নারী তখন মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আগলে রেখেছিলেন নিজেদের ঘর-বাড়ি-তৈজসপত্র। জীবন্মৃত মুক্তি-সৈনিককে কবর খুঁড়ে বার করেন মহিষাহাটির তেমনি একজন ক্ষণজন্মা মহিয়সী নারী, আমিরুন্নেসা। তাঁর মতো মমতাময়ী মায়ের হাতের ছোঁয়ার পরশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই মুক্তি-সৈনিক।

অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য মানুষকে মহৎ করে না। দেশ প্রেমের সঙ্গে আর কোনোকিছুরই তুলনা হয় না। গরিব ঘরের নিত্য ভুখা এই নারী সাহস, ত্যাগ ও মহিমার যে নিদর্শন দেখিয়েছেন, অপূর্ব সুরভিতে দীপ্তির যে-আভা ছড়িয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সে-সব অতুলনীয় দীপ্তিময় গৌরব-গাথা রচিত ও গ্রন্থিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য।

বীরের স্মৃতি নাম-চিহ্ন-স্তম্ভহীন কবরে বেদনার অশ্রু নিবেদনের জন্য এবং মমতাময়ী মা আমিরুন্নেসার উদ্দেশে যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে নিবেদন করি হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। জননী আমিরুন্নেসা আজ জান্নাতবাসিনী। এই দুঃখিনী মায়ের রেখে যাওয়া বয়স্ক সন্তানদের সংসার চলে নিতান্তই দুঃখ-কষ্টে। অবর্ণনীয় অবস্থায়। অথচ স্বাধীন দেশে না-খেয়ে থেকেও তাঁদের কষ্ট নেই। সবাই খুশি। কে রাখে হতভাগ্য বঙ্গমাতার এই দুঃখী সন্তানদের খবর? অনাগত ভবিষ্যতের কোনো দুর্দিনে মায়ের মমতার ছোঁয়ার শেষ পরশে বাংলার মাটিতে দেশমাতার মুক্তিকামী সন্তানেরা শেষ শয্যা রচনা করুন। মা, তোমার পাদপদ্মে শতকোটি সালাম। [আমিরুন্নেসা, গ্রাম মহিষাহাটি, বার বাজার, কালিগঞ্জ, ঝিনেদা]।

হরিণাকুন্ডের হারু-চাঁদ

মুক্তিযুদ্ধ সংহত করায় গেরিলা অবদান অনন্য। সদ্য স্বাধীন দেশে প্রশাসন সংহত হবার পূর্বক্ষণে বস্তুত দেশ চালিয়েছেন গেরিলারা। মুক্তি-গেরিলাদের জন্য প্রশাসনিক অঞ্চল ভাগ করা ছিলো। প্রশাসন চালাতে যুব-কিশোর গেরিলাদের যে ভুলভ্রান্তি হয়নি, তা নয়। তবে তাঁদের আত্মত্যাগ, দেশ প্রেমের নিখাদ সোনায় প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

অভিজ্ঞতাবিহীন গেরিলারা যুদ্ধের অবসরে দিনের বেলায় ঘরের দরজা এঁটে, নির্জন বাগানে, পানি শূন্য পুকুর-খালের তলায় কিশোরী মেয়েদের গ্রেনেড, স্টেন, রাইফেল ছোঁড়া, খুলে জোড়া লাগানো এসবের প্রশিক্ষণ দিতো। অতি গোপনীয়তায় দু'চার তরুণী পুরুষের বেশে মুক্তি গেরিলাদের যুদ্ধসাথী হতো। নিকট দূরত্বে গেরিলা অপারেশনের রাজাকার লোকেশন, পাক প্রহরার কালভার্ট-ব্রিজ উড়ানোর মতো অভিযানে তারা অংশ নিতো। এমুনিশনের বোঝা, ফার্স্ট এইড বক্স সামলানো, চা বানানোর কাজে তারা রণাঙ্গনে অভিজ্ঞতার তালিম দিতেন। দু'দলের যুদ্ধের গোলাগুলিতে কেউ ভেগেছে তো মুক্তির খাতা থেকে নাম বাদ। ছেলেরা এসব ক্ষেত্রে রণাঙ্গন ছেড়ে পালালেও মেয়েরা ছিলো অনড়। তারা ঝামেলায় পড়া মাত্র পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়ির অন্দরমহলে সহজ আশ্রয় পেতো। তারা তো স্থানীয় মেয়ে। আশে-পাশে, দূর-নিকটে তাদের খালা-মামি, নানা-দাদা, চাচা-মামাদের মতো আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই। এক বাড়িতে ঢুকলেই হলো। অতিথি আইছে। পুরুষ অতিথির জিজ্ঞাসাবাদ চলে। মহিলা অতিথির সোজা প্রবেশ অন্দরে। সুন্দরী তরুণী মেহমান আইছে রাইতের বেলা, বিপদে তাদের সমাদর করো। মেয়েরাও অল্প সময়ে আসর জমিয়ে আশ্রয়-পরিবারের একজন হয়ে উঠতো।

সঠিক নিশানায় সে-সব বাড়ি ঘেরাও করেও জেনানা মহলের অচেনাদের শনাক্ত করতে পারতো না পাক পক্ষ। সবার ঘরে মেয়ে আছে। কে কারে ধরিয়ে দিয়ে বিচ্ছুদের বংশ উচ্ছেদের কোপানলে পড়বে! এমনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার বহুত তরুণী স্বেচ্ছা-সৈনিক গড়তে পেরেছিলাম। গেরিলারা তরুণীদের চোখে স্বপ্ন দেখা রাজপুতদের সমান। গেরিলারাও বড় বীরপনার বাহাদুরি করতো। কে ক'টা পাক আর্মি মেরেছে এ ধরনের বড়াই বাক বহুল অতিকথন। তবে গেরিলা ছেলে-মেয়েদের প্রেম প্রেম খেলায় বাধ সাধতে ৮সং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর নিষিদ্ধ করেন। তাঁর যুক্তি ছিলো, এতে প্রশাসনে জটিলতা বাড়বে মাত্র, যুদ্ধের যুদ্ধ কিছুই হবে না। সুতরাং আর্মি আর্মিই, এখানে ছেলে খেলার সুযোগ নেই।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে ঝিনেদার এস.ডি.পি.ও. (সাব ডিভিশন পুলিশ অফিসার) ছিলেন মাহবুবউদ্দিন। তাঁরই ছাত্রচ্ছায়ায় আমার যুদ্ধ সূচনা। সদ্য স্বাধীন দেশে প্রশাসনিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে দু'জন পূর্ব ঘোষণার বাইরে ছুটলাম হরিণাকুন্ড থানায়। পথে গেরিলা গ্রুপ আমাদের দেখে সন্ত্রস্ত। ডিউটির নামে ফাঁকি। উল্টা-পাল্টা গেরিলা প্রশাসনের রিপোর্ট ও পুলিশি রিপোর্টে গোলযোগ। অকুস্থলে তদন্তে গেলাম দুই মুক্তি অফিসার। মাহবুব তো ঝিনেদার নন্দিত নায়ক, বীর পুরুষ। ছাত্র-গেরিলা কিলানো-পিটানোর চ্যাম্পিয়ন প্রফেসর/কাপ্তান সফিক হাজিরা খাতা বগলদাবায় নিয়ে হাজির। গেরিলা পুলিশ তটস্থ। অকস্মাৎ এক গেরিলাকে পাকড়ালেন ক্যাপ্টেন সফিক। গেরিলা হুজুরের হাজিরার ডিউটি ঝিনেদা থানায়। আপনি কেমনে হরিণাকুন্ড থানা এলাকায় এলেন? আপনে না আবার গেরিলা থানা লিডার!

নচ্ছার বিচ্ছুর জাত। বহুত ফাঁকির আর কোনটা বাকি? রে রে করে আশপাশের গেরিলারা যেন আকাশ ফুঁড়ে জুটলেন। এক প্রশাসনিক এলাকায় অন্য-এলাকার গেরিলা কেন? সবার আমতা আমতা তোতলামি। গেরিলা তাঁর নিজের বাড়ি এসেছেন। নির্ধারিত ডিউটি এলাকার বাইরে বিনাছুটিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। এবার নকল-ধরা মাস্টারের মতো ছাত্র-গেরিলার প্রতি প্রফেসর কাপ্তান বেজায় নাখোশ।

দু'টি গাড়ি গ্রামের রাস্তায় দেখে দু'চারজন মহিলাও বাড়ি থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছেন। রাস্তার পাশের অধিকাংশ বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করেছে পাক আর্মি সহযোগে রাজাকার। স্বাধীন দেশের কর্ম-উদ্যোগী মানুষ অতিদ্রুত সে-সব পোড়া বাড়ি-ঘর সংস্কার করে সোনার সংসার গড়ছেন। চক্রাকারে দাঁড়ানো গেরিলারা সন্ত্রস্ত। যুদ্ধকালের মতো না প্রফেসর/কাপ্তান গ্রামের জনতার সামনেই চাটনি মার্কা পিটনি লাগায়।

অসময়ে ডিউটির এলাকার বাইরে পাওয়ায় গেরিলাদের মুখে রা নেই। আমার রাগ বাড়ছে। কয়েকজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতময় হাসি বিনিময়ের চোখ টেপাটেপি করছে। আমার গেরিলা নন্দন একদম মাথা নিচু করে নিশ্চুপ। এবার ডিউটি ফাঁকির এক গেরিলাকে গাড়ির পেছনে তুললাম। মাহবুব অধৈর্য। তাঁকে বললাম আপনি যান। আমি ঝামেলা চুকিয়ে আসছি।

প্রফেসর/কাপ্তানের পাগলামি থামাতে ছুটে এলেন ঝিনেদার অমিতভেজ-মুক্তিযোদ্ধা গাড়ির মেকানিক মোশাররফ। গভীর দু:খ-বেদনায় তিনি বলেন, "পাশের বাড়িরই ছেলে আপনার ছাত্র গেরিলা"। আপনার ধারনার সবটাই ঠিক। একদিন দু'পরিবার ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখতেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। আজ তো পোড়া বাড়ির দৈন্য দশায় সবই দেখছেন। একদিন এ পোড়া বাড়ির ধন, ঐশ্বর্য, শান-শওকতের কি না ছিলো? আজ তারা বলতে নিঃস্ব। আপনার কথা আর কি কমু। ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর হলেও ভিতরের খবর আমরা সব জানি। পরিবেশ পাল্টে যাওয়ায় তাকে আর কথা বলতে দেওয়া হলো না। মেয়েটির দিকে ভালো করে চেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। সেমন চোখ, তেমন মুখ। সৌন্দর্যে দেবতা যেন তাঁর কমনীয়তার ভালোটা দিয়ে তাকেও গড়েছেন। চোখের ভ্রূ যেন হরিণের মতো টানা টানা। চাঁদের জ্যোৎস্নায় এমন বিদঘুটে নাম হারু-চাঁদ কেন? কেউ তাকে ডাকেন হরিণী বলে। কেউ ডাকেন চাঁদনি নামে। দু'টার সংক্ষেপের নাম হারু-চাঁদ। তার ডাক নামের আড়ালে আজ আসল নাম ভুলে গেছি।

আমার গেরিলা নন্দন অযোগ্যে প্রেম নিবেদন করেনি। অসাধ্য সাধনের মতো হারু-চাঁদের মুক্তিযুদ্ধের অবদান। গেরিলার হাতে তিনি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রাতের গেরিলা যুদ্ধে তিনি সবার অগোচরে পুরুষের বেশে লড়েছেন। গেরিলা অস্ত্র ভাণ্ডার আগলে ছিলেন। গেরিলা যুদ্ধে এ বাড়ির ছেলে মেয়েদের অবদানের ফলশ্রুতির নিদর্শন পোড়াবাড়ি।

রুদ্ধ অবেগে গেরিলা নেতা মোশাররফ এবার কথা বললেন। স্যার, মেয়েটি আমারও আত্মীয়। আজ আমরা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখিনা। দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি। চখা-চখীর মিলনে অনুমতি দেওয়ার একজনই বেঁচে আছেন। তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। পোড়া ঘরে শুয়ে আছেন। বাকরুদ্ধ অর্ধাঙ্গ অবশ মানুষটির সাথে কথা বলতে গেলে দুঃখ হলো। আজ তাঁর এ হাল করেছে পাক আর্মি। স্বাধীনতার পুরস্কার ধন্য বাংলাদেশ দেখছি। কতো প্লানই তো শহরে বসে করি। কে রাখে নিভৃত পল্লীর দুর্ভাগা মানুষের খবর? বংশের মুরুব্বি শত চেষ্টায়ও কোনো কথাই বলতে পারলেন না। শত চেষ্টায়ও তিনি তর্জনী পর্যন্ত ওঠাতে পারলেন না। তাঁর মুখে মিষ্টি আভার হাসিই যেন বাঁধন জোটনের ইঙ্গিত দিলো।

এবার হুলো আর মেনি দুটোই আমার গাড়িতে। আজই তোদের বিয়ে দেবো। এবার সবাই খুশি। মোশাররফের আবদার, স্যার আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমাদের কয়েক ঘন্টার সময় দিন। সন্ধ্যালগ্নে বর-কনে ঝিনেদা পৌছুবে শুভকাজে। বাস্তবে প্রশাসনিক কাজের ফাঁকে ফালতু কামে অনেক সময় নষ্ট করলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বুকটা খান খান করছে। আমার প্রিয়তমা কি আছে?

দিনটা ২০ ডিসেম্বর কিনা মনে নেই। সন্ধ্যার পরপরই বর-কনে হাজির ক্যাডেট কলেজ নজদিক ঝিনেদা বাইপাস রোডের পাশের একটি সদ্য নির্মিত বাড়িতে। এ বাড়িই ছিলো ১৯৭০ এর নির্বাচনে পিডিবির নির্বাচনি অফিস। সে বাড়ির বিবাহ বাসরে সদলে হাজির হলাম। মাহবুব ও সফিক এসে দেখেন আলাদা ঘরে বরু ও কনে। কেটা গেরিলার পূর্ণ আসর। একমাত্র তরুণী গেরিলা বিয়ের কনে। তেলে-বেগুনে জ্বলে গেরিলাদের চীফ

গোষ্ঠী উদ্ধার করেন প্রফেসর/কাপতান। তোগো বড় ভাই, চাচা-মামার বিয়ে খাসনি। কনের আসরে তার সখীরা কই? কথা শুনেই গেরিলারা ধারে কাছে ছুটলো তাদের কিছু মা-বোন-বান্ধবীদের আনতে। সদ্য স্বাধীন দেশে তখনো আতংক কাটে নেই। সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতর খোশ আলাপ চলছে। ছেলে মেয়েদের হাসির শব্দ আসছে। দরজায় টোকা পড়তেই ভোজবাজির নিস্তব্ধতায় সব নীরব। কোথাও টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। দুধের বাচ্চারা পর্যন্ত অকস্মাৎ নি:সাড় নিশ্চুপ নীরবতায় নিথর হলো কেমনে!

অতি উৎসহী দু'চারজন ঝিনেদা শহরে তাঁদের আত্মীয়দের বাড়ি খুঁজে পেলেন। তাঁরা দেয়াল টপকে বাড়ি ঢুকে পরিচয় দিলেন। বহু-সাধ্য সাধনায় তাদের গেরিলা বিয়ের বিপদ উদ্ধারে সাহায্য চান। মা-চাচি-ফুপুরা বেঁকে বসলেও স্কুল-কলেজে পড়ুয়া তরুণী ছাত্রীদের সাজ সাজ। কয়েকঘন্টার সাধ্য-সাধনায় সখা-সখীর গুঞ্জনে বিয়ে বাড়ি সরগরম।

সব রেডি। এবার বিয়ে পড়ানো হবে। কাজি বা মোল্লা কই? ছেলেরা আমার দিকে চেয়ে, কেন স্যার! ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। স্যার, আপনিই বিয়ে পড়ান। আমার অনাভিলম্বিত দাড়িই তাদের বিপাকে ফেলেছে। এবার তেঁদরদের দিলাম আচ্ছা ধমক। মোল্লা আন। বুঝবা ঠেলা। শুভকাজে বিলম্ব কেন? মোটর সাইকেলে ছুটলো কজন মোল্লাদের খোঁজে।

বহুখুঁজে একজন মোল্লাকে তারা পেলো। তিনি ভয়ে জড়সড়। ভাবলেন তাকে পাক পক্ষের দালাল বলে মেরে ফেলা হবে। জোর করে জীবন্মৃত মোল্লাকে আনা হলো। অভয় দিতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গেরিলাদের বিয়ে পড়ালেন।

মাহবুবের পকেটে হাত দিয়ে পেলাম বত্রিশ টাকা। সদ্য স্বাধীন দেশে তখনো জিনিসপত্র সস্তা। গেরিলারা বাজার থেকে সের দশেক মিষ্টি আনলো। গেরিলারা অনেকে বিছানা এনেছেন সঙ্গে। বিরাট বিয়ে বাড়িতে তারা রাত কাটাতে চাইছে। ছাড়লাম ঠাঠা মার্কা হুংকার। একটি করে মিষ্টি মুখে দাও। বর-বধূ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দূর হও। তাদের বাসর ঘরে আরামে থাকতে দাও।

আমার প্রত্যক্ষ যুদ্ধজীবনের সূচনা ঝিনাদায়। যে অকুতোভয় শৌর্যে কুষ্টিয়া, ঝিনেদা-যশোর-নড়াইল-সাতক্ষীরা-খুলনা-ফরিদপুরের বীর জনতা শূন্য-হাতে আত্মাহুতি পর্বে যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের যেন এক অকথিত অবিশ্বাস্য সুপ্ত বিস্মৃত ইতিহাস। ইতিহাসের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এ-এলাকার মা-বোনেরা। তাঁরা না থাকলে কোথায় দাঁড়াতাম! কে দিতো আশ্রয়-আহার-আশ্বাস-শুশ্রূষা! ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের হাবিলদার হাবিব শত্রু কবলিত ঝিনেদায় ফিরে এলেন স্ত্রীর খোঁজে। ক্যাডেট কলেজের নারী-পুরুষ আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ অধ্যাপকের স্ত্রী নাছিমা আখতার পারভীন তখনো গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ছিন্নমূলের মতো। হাবিব তাঁকে গ্রামে খুঁজে পেলেন। তিনটি বাড়ি থেকে ভিক্ষে করে পারভীন অভুক্ত হাবিলদারের একবেলা আহারের ব্যবস্থা করেন। এমনি ছিলো মুক্তিযুদ্ধের ধনী-নির্ধন নারী-পুরুষের সংগ্রামী চেতনা।

পাগলা কানাই-লালন-মধুকবির দেশ গোলাম মোস্তফা-মুনসি মেহেরউল্লার দেশ যশোর।

প্রতাপাদিত্য ও বাঘাযতিনের বিপ্লবি চেতনার দেশ যশোর। তাঁদের যুগ যুগ সাধনার চেতনার উদ্দীপনার ফসল জাগ্রত জনতার বিচরণ ক্ষেত্র যশোর। কতনা বীর জায়ার জনমে ধন্য এ-পবিত্র ভূমি। শত্রু কবলিত বাংলার হতদরিদ্র নিভৃত কুটিরে মা-বোনের সাশ্রয় যে মা-ভবানীর নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি তার সংখ্যা অগণিত। সংগ্রামী বাংলার যোদ্ধা নারীরা পরিচয় দিতে চান না। তাঁদের না আবার ঘর বাঁধতে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম যে মহিলা সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি ছিলেন এক এডভোকেটের মেয়ে। অভিনয় স্থল লাহোর। বিয়ের ঝামেলা এড়াতে তাঁকে ছদ্মনামে অভিনয় করতে হয়েছে। এই যদি ওপর তলার দশা আজ নিচ তলার অবস্থা অনুমেয়। অনেকের বীরত্ব ধৈর্য-স্থৈর্য-আত্মত্যাগের সগৌরব সম্মান দিতে আমি শংকিত। বাংলার মা-বোনেরা আমাকে ক্ষমা করবেন। আসল-নকলের ফারাক না বুঝে অনেকের কপাল পুড়েছে আমার অবিমৃষ্যকারিতায়। তবুও পরপারে যাবার আগে আমার দু'চার মা-বোনের কালজয়ী যুদ্ধ-চেতনার কথা বলে গেলাম। হরিণাকুণ্ডের বর-বধূকে নিজের পুত্র-কন্যার আদরে গ্রহণ করেছিলাম। অনেকে মুখের ওপর বলেছিলেন স্যার। এ সব কি কথার কথা না মনে থাকবে। দুর্ভাগ্য আমার, তাঁদের পুরাপুরি নাম-ধাম-ঠিকানা টুকে রাখলে, আজ খোঁজ নিতে পারতাম। এদেশের অগণিত গেরিলা তরুণীদের অবদান নীরব সাধনায় সংগ্রহ করতে পারলে একটা অবিস্মরণীয় কাজ হতো।

আইচপাড়ার বীরাঙ্গনা মোসাম্মৎ ছুরমান বিবি

ছুরমান বিবির স্বামী মোহাম্মদ আকবর আলি শত্রুর হাতে নিহত হয়। তাঁর উদ্ধারে আসা মুক্তি-মোজাহেদ অয়েদও প্রাণ দেয়। স্থানীয় কৃষক হামজদ্দিন তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায় এসে জান্নাতবাসী হন। এতদ-দৃষ্টে প্রাণপণে অকূলে দৌড়ুচ্ছেন ছুরমান বিবি। শেষ পর্যন্ত তিনি শত্রু কবলে আটকা পড়েন। আনসার-মুক্তি আবদুল আহাদ এ-নারীকে রক্ষায় এগিয়ে এসে মৃত্যুর মুখে পড়েন। উপস্থিত বুদ্ধি ও বীরত্বে তিনি মুক্তি-ভাই আহাদকে বাঁচাতে সমর্থ হন। কারবালার সখিনার মতো আত্মহত্যায় না গিয়ে শত্রুর পিঠে বেয়নেট বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন ছুরমান। নিজের ইজ্জত, স্বামী ও মুক্তি-হত্যার প্রতিশোধে শত্রু-হত্যার এ-ঘটনাটি আপাতঃ অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই ছিলো সে-দিনের বাস্তবতা।

স্বামী হত্যার প্রতিশোধ ও ইজ্জত বাঁচাতে গ্রাম্য বধূ জুলজ্যান্ত নিয়মিত শত্রুসেনা হত্যা করে হাত রাঙান। কারবালার সখিনার মতো আত্মহত্যায় না গিয়ে হারবালা মাথায় নিয়ে শত্রুহত্যার জয়-দীপ্তিতে রচনা করেন বঙ্গমাতা বাঘা-বাঙালিনীর অক্ষয় কীর্তি। বঙ্গরমণীর বীরত্বের কাহিনী পুরুষ শাসিত সৈনিকদের ভূমিকম্পের আস্ফালনে নিষ্কম্পই বটে। [মোসাম্মৎ ছুরমান বিবি, গ্রামঃ আইচপাড়া, সাতক্ষীরা]।

বিস্তৃত মুক্ত-অঞ্চলে স্থানীয় যোদ্ধা ঃ বেনাপোল থেকে সাতক্ষীরা বিস্তৃত অঞ্চলে একটি মাত্র মুক্তি কোম্পানি। সীমান্তে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সীমান্ত থেকে ঝিকরগাছা-

সাতক্ষীরা পাকা সড়ক পর্যন্ত মুক্ত অঞ্চল এগিয়ে যায়। পাকিস্তানি শত্রুবাহিনী তাদের বাংকারে বন্দি। স্থানীয় আনসার-মুজাহিদ দলে দলে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। আগে থেকেই তাদের ট্রেনিং থাকায় যুদ্ধে লাগাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

প্যারা-মিলিশিয়াদের মধ্যে মুজাহিদরা ছিলো উন্নত। অস্ত্র-চালনা ও সাহসেও তারা অকুতোভয়। ইপিআর-রাও মুজাহিদদের পছন্দ করতো। ইপিআর সংস্পর্শেই এরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় মুজাহিদ-আনসার রেকিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো।

ট্রেইন্ড মুজাহিদ অয়েদ এঁদের একজন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান আর্মির হাতে প্রশিক্ষণ হয় তাঁদের। আজ দেশের টানে, স্বাধীনতার ডাকে ঘর ছেড়ে এসে যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে, হাকিমপুর মুক্তি ক্যাম্পে। এদের কিছুদিন গেলো কাপ্তানের বকাঝকার ভুলত্রুটি ধরাধরির মধ্যে। তবে, কাপ্তানের মুজাহিদ-প্রীতি কিছুটা বেশি।

শত্রুপুরীর আশপাশ রেকি করতে কাপ্তানের তাড়া পড়ে। কারণ কেউ বুঝতে পারে না। বেশি আগ্রহী হয়ে সিনিয়রকে কারণ জিজ্ঞেস করার অপরাধও অনেক বড়। হাবিলদার-মেজর সকালে রেকির নির্দেশ শোনান। যাবে দু'জনঃ অয়েদ ও দেলোয়ার। রেকির স্থান বাঁশদা, আগড়দাড়ি ও আবাদের হাট। সাথে কোনো অস্ত্র বা নিশানা-চিহ্ন কিছুই থাকবে না। অর্ডার শুনেই তাদের কুইক মার্চ। যথাপূর্ব কাপ্তানের ব্রিফিং ছাড়াই তারা রেকিতে যাত্রা করে।

দু'দোস্ত একসঙ্গে যাচ্ছে গল্প করতে করতে। আশপাশে খেয়াল রাখতে হবে সতর্কতার সঙ্গে, সে-সব ভুলে গেছে। দেশটা নিজের। মানুষজন তাদের পক্ষে। স্থানীয় মুক্তি এরা–বেশ গর্বের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন ধারণা যে, আর কে পায় এদের! আগরদাড়ি পার হতেই পড়ে যমদূতের মুখে।

মুক্তিযোদ্ধাদের উৎপাতে এলাকার পাক-বাহিনী অতিষ্ঠ। তারাও রেকি করে মুক্তির খোঁজে। বেখেয়ালের কারণে মুক্তি অয়েদ আজ কয়েদ হয় পাকিদের হাতে। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান নিশ্মশ্রু বাঙালকে দেখে মুক্তি মুক্তিই লাগে। খান সেনা জিজ্ঞেস করে ঃ "তোম কোন হ্যায়, মুক্তি হো।" অয়েদ নিরুত্তর। "এধার কিউ আয়া?" "গরু হারিয়ে খুঁজতে আসা"। এর বেশি বললে বিপদ। উর্দু বুঝলেও মুক্তি সন্দেহে ধরে ফেলবে।

সবাই দাঁড়িয়ে। অয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পেছনে নিকট দূরত্বে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় মুক্তি দেলোয়ার। বিপদের গুরুত্বআঁচ করছে সে। ফাঁকতালে এক বাড়িতে ঢুকে বেঁচে যায়। অয়েদ কি বলতে কি বলবে দিশা পায় না। পাক সেনারা তাকে নিয়ে যায় কলারোয়া ক্যাম্পে।

সেখানে আচ্ছা ধোলাই দেয় অয়েদকে। বিস্তর প্রশ্ন করে তাকে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলে। আসল কথার ধারে কাছেও যায় না খতরনাক মুক্তি। মুক্তিকে ফেসাঁতে না পারলেও আশা ছাড়ে না তারা। নিম্নস্তরের পেষানিতে মুখ খোলে না মুক্তি। ধোলাইয়ের পরেও মুখ না খোলায় তাকে চালান করা হয় সাতক্ষীরায়। সাতক্ষীরার নির্মম অত্যাচারের

পরেও মুখ খোলে না মুক্তি অয়েদ। এবার আচ্ছা করে শিক্ষা দেবার জন্য নিয়ে চলে মূল ঘাঁটিতে, আট মাইল দূরে ভোমরা ঘোজাডাঙা।

দেলোয়ারের পলায়ন ঃ আগরদাড়ি থেকে ভেগে আসা দেলোয়ার পালানোর সঠিক পথ খুঁজে পায় না। সোজা মুক্তি ক্যাম্প হাকিমপুরে গেলে রক্ষা নেই। ক্যাপ্টেন তাকে ছাড়বে না। প্রথম প্রশ্ন হবে "অয়েদ কই?"-এর জবাব নেই তার কাছে। শত্রু ধরে নিয়ে গেছে বললেই কি বাঁচা যাবে! তা'হলে তুমি করছো-টা কি? তাকে ফেলে আসলে কেন? নালায়েক কমজোর। আর যদি ক্যাপ্টেনের মাথায় খুন চাপে তা'হলে তো আর রক্ষাই নেই! দোস্তরে খুঁজে না আনলে জাহান্নামে যাবার ভয়ে দেলোয়ার আর হাকিমপুরে যায় না। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনা করে চলে যায় ঘোজাডাঙা। সেখানেও একটি মুক্তি কোম্পানি ক্যাম্প আছে।

মুক্তির মৃত্যুদণ্ড ঃ ঘোজাডাঙার পাকিস্তানি ঘাঁটিতে দুর্মিশ দিয়েও তাদের খায়েশ ঘুচলো না। এবার তাকে নিয়ে আসে সাতক্ষীরা-ভোমরার মধ্যবর্তী আলিপুর বধ্যভূমিতে। দফায় দফায় মাইর আর মাইর। দেশমাতৃকার নামে ধৈর্যের সঙ্গে মুখ বুঁজে সয়ে নেয় মুক্তি অয়েদ পাকিদের সব অত্যাচার। কোনোকিছুতেই তাঁকে বিচলিত করে না। দেশের তরে জীবন দেবে, তবু নাখান্দা পাকিদের কাছে দেবে না মুক্তিদের কোনো তথ্য। তাঁর একই কথাঃ "আমি মুজাহিদ-মুক্তি চিনি না।"

প্রচণ্ড মাইরেও মুক্তি মুখ খোলে না। অবশেষে অয়েদের মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হলো পাকিদের বিচারে। অয়েদকে মিষ্টি খেতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাপাকদের সৃষ্টিছাড়া সব কাণ্ড তাঁর কাছে খুলে গেলো। এবার ভাবলেন ঃ তাকে বিদায় নিতে হবে।

মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো। প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে তাঁর মওত কার্যকর করা হবে। মুক্তিফৌজে যাবার শেষ পরিণতি দেখানো হবে জনগণকে। এতদুদ্দেশে দু'হাতে পিছমোড়া বাঁধ দিয়ে নিয়ে গেলো পারুলিয়া ব্রিজের ওপর। পরে, ত্রিশ ফুট লম্বা বাঁশের আগায় বেঁধে অয়েদকে ঝুলিয়ে দিলো জোয়ার-ভাটার নদীর খালে। অয়েদকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে গুলি লোড করা হলো রাজাকারের বন্দুকে।

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা রবে?
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।"

অয়েদ করুণাময়ের কাছে শেষ মিনতি জানায়। "হে মহিমাময়, পশুরা আমাকে ছাড়বে না। তুমিই অগতির গতি, আমার শেষ ভরসা। আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দাও হে প্রভু।" শেষ বারের মতো মাতৃভূমিকে দেখে নেয় অয়েদ। এদিকে পাকিদের বিস্ময়ঃ ইয়ে আবি তক রোতে নেহি। বহুত খতরনাক বাঙাল। চেম্বারে গুলি। ঘাতকের হাত ট্রিগারে। পলকের ঝলক বাকি মাত্র....।

অকস্মাৎ একটি গাড়ির শব্দ। আর্মি জিপ আসছে। বড় সাহেবের সামনে শবদি

দেখানোর জন্য অয়েদকে গুলি করতে ঘাতকের সামান্য বিরতি। ব্রিজের ওপর গাড়ি আসতেই মেজর জানতে চাইলোঃ ব্যাপার কি? বাঁশের দণ্ড থেকে দণ্ডিতকে নামানোর নির্দেশ দেওয়া হলো। আশ্চর্য, মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর পরিচিত।

যশোর সেনানিবাস থেকে ভোমরা বর্ডারে যুদ্ধে যাচ্ছেন মেজর। ১৯৬৯ সালে যশোর সেনানিবাসে মুজাহিদ প্রশিক্ষণে মেজর সাহেব তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন। দু'জনেই দু'জনকে চিনলেন। এবার মুজাহিদের কান্নাঃ "স্যার, আমি মুক্তি চিনি না। হাতে অস্ত্র পেলে মুক্তি মেরে প্রমাণ করবো, আমি খাঁটি পাকিস্তানি।" আচ্ছা, শাবাশের বহুত মদদে মেজরের নির্দেশঃ "রাজাকার মে ভর্তি কর লাও"। সে-দিন থেকেই তিনি লয়েল পাকিস্তানি রাজাকার।

মুক্তি মুজাহিদ রাজাকারে ঃ হাতিয়ার হাতে পেলেন মুক্তি মুজাহিদ রাজাকারে এসে। সাফ সাফাই করছেন যত্নসহকারে। প্রাণ ভরে চুমো খান। কবে তার সদ্ব্যবহার হবে। ৭ দিনের পরীক্ষায় টিকলেন। কলারোয়া ইল্লারচর ক্যাম্পে গেলেন ডিউটিতে। ক্যাম্পের কেউই অয়েদকে একা কোথাও বেরুতে দেয় না। বড় অফিসারের পেয়ারের বান্দা, সবাই চোখে চোখে রাখে। কবে পালায় কে জানে! এদিকে অয়েদ সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। অধীর আগ্রহে দিন যায়। কবে আসবে পালানোর সে-সুদিন।

খান সেনারা পেট্রোলে বেরিয়েছে। পাঞ্জাবি সেনা নায়েক কাইউম, বিহারি রাজাকার দীন মোহাম্মদ এবং বাঙালি মুক্তি-মুজাহিদ অয়েদ। পেট্রোল-লিডার নায়েক কাইউমের গোল-গাল পুষ্ট-বলিষ্ঠ দেহ। চমক লাগা সুন্দর চেহারা। ইয়া লম্বা। দেখতে ডর লাগে।

রেকি-টেকি সব ছলছুতো। কার কি লুটা যায়, সে উছিলা খোঁজে। কোথায় আছলি মছলি খাসি-মুরগি মিলেগা তার সব ধান্দা করে। বাঙালি রাজাকার এসবের যোগানদার। মুজাহিদ অয়েদ নীরবে সব সহ্য করে। ৩ জনই সশস্ত্র। কিছুদূর গিয়ে বিহারি দীন মোহাম্মদ আহার সন্ধানের বখরা আদায়ে পাশের গ্রামে তশরিফ নেয়।

পাঞ্জাবি নায়েক কাইউম ও বাঙালি ছদ্মবেশী মুক্তি-মুজাহিদ অয়েদ এগুচ্ছেন "আইচপাড়া" গ্রামের পথে। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের শেষে এক ফাঁকা বাড়ি। আশেপাশে কয়েকটি আখ ও পাটের ক্ষেত। জংলা নিরিবিলি বাড়ি। খানের প্রাণ টানা শুভ দৃষ্টি। মুরগির খোঁজে ভেতরে।

খানের পরান আইচাই করে নারী-গন্ধে ঃ শকুনের কাছে মরা গরুর গন্ধের চাইতেও খানের কাছে বাঙালি-নারীর সুবাস ছিলো আরো তীব্র। কোন ফাঁকে যে বাড়ির সুন্দরী বধূর বাতাস পেলো খান সঙ্গী তা টের পায়নি। বাড়িতে দু'জন মাত্র মহিলা। বুড়ি শাশুড়ি ও তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ। খানের উপস্থিতিতে আনচান করছে সবার পরান। ডরে ভয়ে জড়সড় কাঁপছে থরথর। বুড়ির সঙ্গে সোহাগের বউমা। পিছন থেকে সবই দেখছে মুক্তি-মুজাহিদ।

খানের প্রাণে বেজায় জোশ। বহুত খোশ দিল। এতনা খুবছুরত আওরত। বাঙাল মুলুক-মে আল্লা মিলায়া কেতনা হুরপরী। প্রাণটা জুড়াবে ভালো।

বুড়িকে তাজিমের সঙ্গে বলে পাঞ্জাবি সৈনিক, "থোরাছে পানি পিলাও"। বুড়ি বুঝে না পাঞ্জাবি কথা। এগিয়ে এসে পাশের কলস কাত করে মুখের কাছে এনে দেখায় "পানি পানি"।

বুড়ি এবার বুঝলেন। কাঁপতে কাঁপতে পানি এনে দিলেন। পানির গেলাসের দিকে খানের নজর নেই। তার লোভাতুর দৃষ্টি সরাসরি বউমার দিকে। কামাতুর চাহনি বুড়ি বুঝতে পারলেন। বউকে নিয়ে সোজা ঘরে। পিছন দরজা দিয়ে বৌ পার। 'ঢল ঢল অঙ্গের লাবনী অবনি বহিয়া যায়'। বধূ যে পালায়। খানের বিস্ময়, "আওরত কিধার গিয়া!"। বুড়ি নিথর নিশ্চুপ।

বউয়ের পিছন ধরে খান। কুলবধূ চরম বিপদ বুঝতে পারে। হায়! বাংলার বধূ বুক ভরা মধু, এই তার খেসারত? নারী মাংসে লোলুপ পশ্চিমা পশু হিংস্র দাপটে এগিয়ে আসছে। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি কুলবধূর ওপর! সবই আন্দাজ করতে পারেন এই কুলনারী। নিজের মুক্তি পথ নিজেই খুঁজে নেন।

ঝটিতি পেছনের দরজা দিয়ে বউ দৌড়ে পালাতে থাকে। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে খানসেনাও দৌড় দেয় বউয়ের পেছনে। শাড়ি সামলাতেই বউ প্রাণান্ত। প্রাণের চাইতে বেশি ভয় ইজ্জতের। আখ ক্ষেতের পাশে বরই কাঁটার বেড়া। দৌড়ে চলতে গিয়ে শাড়ির আঁচল অকূলে উড়ে যায়। অন্তর্বাস সামান্য টেডি ছায়া। ব্লাউজ গায়ে ছায়া পরেই দৌড়তে থাকে কুলবধূ। এদিকে মেদিনী কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে যমদূত। এই বুঝি ধরে ফেলে!

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের চেয়েও দুর্দশায় পড়ের গ্রামীণ বধূ। প্রায় বিবস্ত্র তিনি। সাবেগে দৌড়ুচ্ছেন আখের ক্ষেতে। হরিণী যতোই তোর দ্রুত চরণ চকিত চাহনি, কতোক্ষণ ঠেকাবি বাঘের থাবা। খান আরো দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ছায়া ব্লাউজের যুবতী পেয়ে খানের চোখমুখ রক্ত চোষা জানোয়ারের মতো। হাটু কাঁপছে যুবতীর। কাঁপছে শরীর থরথর। ভয়ে আর ছুটতে পারছেন না তিনি। এবার বাঘ শিকার হাতে পেলো। শুরু হয় অবলা-সবলের ধস্তাধস্তি। বাঘের ছোবলে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা ব্লাউজ। পেটিকোট খসে যায় যথাবন্ধন থেকে। খানের রোষ! বাঙালি জেনানা এতনা খতরনাক, পেরেশান কর দিয়া। আভি তক বাগ মে আতা নেহি। বিলকুল বুজ দিল। এধার ওধার গড়ানা। মহারোষে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় আওরতের ওপর। হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি এবং দাঁত নখের ব্যবহার করে সজোরে চিৎকার, "বাঁচাও, বাঁচাও"।

বাঙালি নারীর প্রতি খানের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন জেহাদি মুজাহিদ। অস্ত্র উঁচিয়ে আসেন খানের দিকে তাক করে। কোনো সময় না দিয়ে ধড়াক গুলি ছোঁড়ে বসে বাঙালি মুজাহিদকে নারী লোলুপ খান সেনা। মুজাহিদ রাইফেলসহ লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। বীর মুজাহিদের শেষ আর্তনাদ, "মা, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। আল্লাহ তোমার নেগাবান"। আল্লার নাম জপতে জপতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আইচপাড়া যুদ্ধ ঃ ভাদ্র (সেপ্টেম্বরে) মাসে সাতক্ষীরার বেলেডাঙায় ৮ নম্বর সেক্টরের ই কোম্পানির সঙ্গে পাক আর্মির চার দিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেটি ছিলো মুক্তিবাহিনীর কাট অফ পার্টির সঙ্গে যুদ্ধ। নেতৃত্বে ছিলেনঃ নায়েব সুবেদার ওবায়দুল হক (ইপিআর), মুক্তি-আনসার আবদুল আহাদ (গ্রামঃ বাউকোলা), গেরিলা-মুক্তি গোলাপ, রকিব।

মুক্তিবাহিনীর কাট-অফ পার্টির প্রতি নির্দেশ ছিলো রাতদিন নির্ধারিত এলাকার রেকি/পেট্রোলে থাকা। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা তা করতেন না। দিনে ডিউটিতে থাকতেন এবং রাতে স্থান ত্যাগ করে চলে আসতেন তাঁরা। মুক্তিবাহিনীর এই দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগান পাক-বাহিনী। বেলেডাঙার মূল মুক্তি প্রতিরক্ষা পর্যুদস্ত করতে চার পাশ থেকে পাক আর্মি ধেয়ে আসছে। সাতক্ষীরা থেকে জোয়ার-ভাটার নৌখালি খালে স্পীডবোটে আসে অফিসার। দুই তীর থেকে মার্চ করছে নিয়মিত পাক সেনা। নিকটবর্তী এলাকায় কয়েকটি মুক্তি-গেরিলা ইউনিট এবং কাট-অফ পার্টি কাজ করছে। মুক্তিবাহিনীর অসতর্কতায় অলক্ষ্যে সুসৃংখল নির্বিবাদে মুক্তি-প্রতিরক্ষায় ঢুকে পড়ে পাক-আর্মি।

আইচপাড়া গ্রামকে সবাই ভাবতো মুক্ত এলাকা। তাই এখানে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে কিছু লোকজন ছিলো। তারাই আজ আক্রমণের লক্ষ্য। প্রাণের ভয়ে আজ সবাই পালাচ্ছে।

পাক আক্রমণ শুরু হয় খুব ভোরে। বিচ্ছিন্ন মুক্তি-গ্রুপ পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে শত্রু-প্রতিরোধে লেগে যায়। প্রথমে তারা শত্রুদের হটাতগঞ্জ ও আইচপাড়ার মাঝে বাধা দেয়। গেরিলার চোরা গোপ্তা আক্রমণে বেশকিছু পাক সেনা হতাহত হয়। ফলে প্রতিহিংসার দাবানলে জ্বলে ওঠে শত্রুরা। অন্যান্য দিন ছোটখাট গোলাগুলির পরই শত্রুরা পিছিয়ে যেতো। আজকের অবস্থা ভিন্ন। মরণজয়ী জিঘাংসায় তারা এগুচ্ছে। ১৯ ভাদ্র শুক্রবারের যুদ্ধে তারা এর একটা বিহিত করতে চায়।

জল-স্থল উভয় পথেই শত্রুর অগ্রাভিযান শুরু হয়। স্পীডবোটে পাক মেজর। খালের দু'পাশ দিয়ে কয়েক শ' পাক-সৈন্য গ্রাম বেড়ে মুক্তি ধরার প্ল্যান করেছে। মূল মুক্তি-প্রতিরক্ষা বেলেডাঙাকে চতুর্দিক থেকে পিষে মারার পরিকল্পনা নিয়েছে পাকিরা। হটাতগঞ্জের শত্রু-সৈন্যের সঙ্গে আইচপাড়ার মুক্তিরা সম্মুখ সমরে রত। মুক্তির অলক্ষ্যে পেছন থেকে এতভাঙ্গ করছে পাকিরা। আবাদের হাটখোলা, মামুদপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা থেকে জলেস্থলে শত্রু অগ্রসরমান। মুক্তিরা পেছনে আইচপাড়া চেয়ারম্যান বাড়িতে নীরবে অবস্থান গ্রহণ করে।

পেশায় মুচি এক বাঙালি মৃত্যুকে নিজের হাতে নিয়ে নীরবে এসে পেছনে পাকিদের অবস্থানের খবর মুক্তিবাহিনীকে দিয়ে যায়। পরে এলাহী বক্স মহাজনের উদ্যোগে কয়েকজন পাবলিক পাক ঘেরাওর সংকেত-বার্তা পৌছান মুক্তিদের কানে। এমতাবস্থায় জীবন বাঁচাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে মুক্তি। যে-যেদিকে পারছে, পালাচ্ছে কিংবা আত্মগোপন করছে প্রাণ ভয়ে। আবদুল আহাদ লুকোলেন এক পাটক্ষেতে।

মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলি ঃ আকবর আলির বাড়ি আইচপাড়া। আগে থেকেই আনসার শিক্ষণ ছিলো। সাহস ও কর্ম-দক্ষতায় তিনি মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত। কাজের সুবিধার

জন্য তাঁকে মুক্তি ক্যাম্প থেকে দূরে রাখা হয়। তিনি কাজের লোকের ছদ্মবেশে বাড়িতে থেকেই শত্রুবাহিনীর খবরাখবর রাখতেন। তিনি বেশির ভাগ সময়েই থাকতেন বাড়ি-সন্নিকটের রেউই হাটখোলা ডিফেন্সে। আইচপাড়া পাক আক্রমণে ঘেরাওর মাঝে আকবর আলি বাড়ি থেকে আসছিলেন। স্ত্রী ছুরমান বিবিকে "তোর স্বামী মুক্তিযোদ্ধা" বলে পাকিরা টানাটানি শুরু করে। স্ত্রীকে উদ্ধার করতে আকবর এগিয়ে আসলে পাকিরা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে নৌখালির খালে ফেলে দেয়। বেয়নেটের খোঁচায় প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু স্বীকার করেনি যে তিনি দেন আকবর আলি। একজন মুক্তিযোদ্ধা। সঙ্গী-সাথী কারো পরিচয় দেননি তিনি। দেশের ইজ্জতের নামে আত্মাহুতির ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনমনীয় ইস্পাত-কঠিন নজির স্থাপন করে শাহাদত বরণ করেন ছুরমানের স্বামী আকবর আলি।

বাংলার নারীর ইজ্জত রক্ষায় হামজদ্দিন ঃ যশোরে একধরনের কাঁচা মরিচ বারো মাস হয়। এ-সব মরিচের গোড়া থাকে ওপরের দিকে। তাই এর নাম উর্ধ্ব ঝাল। সে-সব মরিচ, কলা, পেঁপে ও অন্যান্য সবজি ও কাঁচা মাল ভারতে বেছে অনেকে দিন গোজরান করতেন। ভারত থেকে অনেক শরণার্থী এসে নিয়ে যেতো এসব তরিতরকারি ও কাঁচা মাল। মালামাল নেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে থাকতো থালা, ডালা, পোটলা। এমনি এক দলের সঙ্গে তরিতরকারি ও হলুদ তুলছিলেন আইচপাড়ার হামজদ্দিন। ভারত থেকে আসা অনেক এদেশি শরণার্থী এবং বেটা-বেটিও তাঁর সঙ্গে তরিতরকারি পোটলায় ভরছিলেন। সবাই পড়লেন পাক আর্মির ঘেরে। গোলাগুলির মাঝে সবাই প্রাণ ভয়ে ছুটছে এদিক-সেদিক। হামজদ্দিন ছুটলেন বিপন্না নারী ছুরমান বিবির উদ্ধারে। তরকারির ডালা হাতে এক বেটিও ছুটলেন তার সঙ্গে। বিপন্না নারী উদ্ধারে ছুটছেন দুই নিরস্ত্র নরনারী। সশস্ত্র সৈনিকের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নরনারীর যুদ্ধ। শিকার হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে পাক-সৈনিক এগিয়ে আসা নরনারী দুজনকেই হত্যা করে। তরিতরকারির পোটলাসহ এদের লাশ পড়ে রইলো হলুদ ক্ষেতে। লাশের জানাজার লোকও ছিলো না গ্রামে। বাংলার গ্রামের নারীর ইজ্জত রক্ষায় প্রাণ দেওয়া হামজদ্দিনের লাশ এখন হবে শকুন ও শিয়াল-কুকুরের খাবার। কিন্তু কয়েক কুকুর অন্যান্য জংলী পশুকে আসতে দিলো না এসব লাশের সামনে। তারা মানুষের মতো এতো অকৃতজ্ঞ নয়। একান্ত চেনা হামজদ্দিনের লাশের বেইজ্জত হতে দেয়নি স্থানীয় কুকুরেরা।

হামজদ্দিনের বাড়ি আইচপাড়া গ্রামে। মহাপ্রাণ হামজদ্দিনের স্ত্রী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা এখনো সে-গ্রামেই বাস করে। সসন্তান হামজদ্দিন-পত্নীর স্বামী-শোকের দীর্ঘশ্বাসে আজো আইচপাড়ার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। নারীর ইজ্জত রক্ষায় আরেক নারীর প্রাণ দেওয়ার মধ্যেই তাদের গর্ব ও আনন্দ। ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে কে রাখে সে অতুলনীয় মহাপ্রাণ নারীর মহত্বের খবর!

নারীর ইজ্জত রক্ষায় আব্দুল আহাদ ঃ বাউকোলার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আহাদ আগে থেকেই আনসার-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আইচপাড়ার যুদ্ধে তিনি শত্রুর ফাঁদে পড়ে ত্রিশংকু

অবস্থায়। নরপশু পাঞ্জাবি নায়েক কাইউমের হাত থেকে ছুরমান বিবিকে রক্ষায় এসে একে একে প্রাণ দিলেন তাঁর স্বামী আকবর আলি, মুক্তি-মোজাহেদ অয়েদ, মহাপ্রাণ হামজদ্দিন, এবং একজন অজ্ঞাতনামা মহিলা। শিকারি কি আর সহজে শিকার ছাড়ে? পথে পথে বিভিন্ন জনকে হত্যার মাধ্যমে নরপিচাশ কাইউম মধ্যে কতোক্ষণ বিরতি দেয়। যুদ্ধের হানাহানির ডামাডোলে অনেকদূর ছুটে পালানোর সুযোগ পেলেন ছুরমান বিবি। পাঞ্জাবি নরকেশরীর নরপশুর রিরংসার স্থির লক্ষ্য ছুরমান বিবি। সশস্ত্র নায়েক কাইউম নিরস্ত্র বাঙালি বধূ ছুরমান বিবিকে ধরার জন্য ছুটছে। ছুরমান ক্ষেতে ঝাল-তরিতরকারি তোলা ভীত সশস্ত্র জনতার মাঝে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করে বাঁচতে চাইলেন। হরিণের মাংসই হরিণের শত্রু। বাংলার নারীর রূপ যৌবনই আজ তার কাল। ফুটন্ত যৌবনা ছুরমান বিবির খুবছুরতি দুরন্ত বিদেশির চোখে কামাতুর প্রজ্জ্বলন। যাঁদের মাঝে মিশে তিনি সাময়িক গা ঢাকা দিতে চান তারাই একে একে মৃত্যুর পরপারে চলে গেলো। ইজ্জতের মান প্রাণের টানে সীমাহীন মরণ দৌড়ে দৌড়ান ছুরমান। মরণ বেদনা কামাতুর শক্তির প্রচণ্ডতায় শিকারি শিকার ধরে। ধস্তাধস্তি চলছে। সবলের হাত এড়াতে অবলা প্রবল শক্তিতে চেষ্টা করছেন। মানুষরূপী নরপশুর কাছে মা-বোনের ইজ্জতের নামে সকল কাকুতির আকুতি ব্যর্থ। মানব জাতির আদিম আঁধারের খেলার প্রস্তুতি এবার প্রকাশ্য দিবালোকে। জাগতিক সাহায্যের ব্যর্থতায় অগতির গতি সতী নারীর অন্তর ব্যথিত সচিৎকারে বেদনার্থ কান্নার অন্তিম প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে, "একদিন আমি মরবই। তুমি হাজির ও নাজির। আল্লা তুমি কোথায়? আমার ইজ্জত বাঁচাও।"

মানুষের মরা কান্নায় ভুললে, আল্লা ডাকে টললে বাঘের আর নরমাংসের স্বাদ পেতে হবে না। পাঞ্জাবি সৈনিক কাইউমের মনে ধরা সুন্দরী বাঙালিনীর কান্নায় মন ভিজে না। দিল্লাগী পেয়ারীর রূপ সাগরে অবগাহন তাড়ায় অধৈর্য আর্যবীর নামে খ্যাত পাঞ্জাবি। বধূর মধুর রস নিংড়াতে পদতলে চেপে ধরলেন। দুহাতে বুক বেঁধে সুন্দরী বঙ্গ ললনার মেদিনী উদার হৃদয় বিদারী বাঁচাও বাঁচাও আর্ত চিৎকারে খোদার আরশ বুঝি কাঁপে, তবু কাঁপে না নরপশু পাঞ্জাবির হৃদয়।

মুক্তির পৌরুষে ঘা ঃ পাক আর্মির সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ চলছে মুক্তিবাহিনী গেরিলা ইউনিট/কাট অফ পার্টির সদস্যদের। পাক সেনাদের অগ্রাভিযানের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মুক্তিবাহিনী। চারদিকের গোলাগুলির ঘেরে মুক্তিরা অবরুদ্ধ। যে-দু'চার লোক গ্রামে ছিলো তাদের কেউ মারা গেছে, কেউ ধরা পড়েছে পাক আর্মির হাতে। মৃত্যুর করাল গ্রাস চতুর্দিকে। ঘন কচুবনের খানাখন্দকে পাঠকাঠির এক গাদার মধ্যে মুক্তি-আস্তানা। এখানে বসেই সব দেখছে মুক্তিরা আর ভাবছে কি করা যায় এখন!

পাক সেনাদের গোলাগুলির তাণ্ডবে সবাই দিশেহারা। যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। মেয়েরা প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে সবার আগে। এ-সময়টাতে দুই মহিলা ও এক বেটা ছেলে ঝাল তুলছিলো ক্ষেতে। হাতে থালা-ডালা-থলি। খানেদের ভয়ে এখন তারা আশ্রয় খুঁজছে। সবাইকে তাড়াচ্ছে পাক সেনারা। আসল রূপসীকে বাঁচাতে এরই মধ্যে দু'জন

শেষ। নায়েক কাইউম রূপসীকে পাকড়াও করে। পাক হায়েনার শৌর্যের মুখে ছুরমান বিবির মহাক্রন্দন কে শোনে!

সতী নারীর গতি আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ অসহায়ের সহায়। পতিত পাবন অবলার তাকে সবল সাহায্যকারী পাঠালেন। নারীর ইজ্জত রক্ষায় এগিয়ে এলেন টগবগে মুক্তিযোদ্ধা। হিংস্র বাঘ শিকারে ঝাঁপ দিতে কোনোদিকে খেয়াল রাখে না। আবে হায়াত পান করতে গিয়ে খান নিজের হায়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলো। বঙ্গ নারীর ইজ্জত রক্ষায় এগিয়ে আসেন মুক্তি আবদুল আহাদ। আল্লার নাম নিয়ে সামনে এগুচ্ছেন। তিনি ভাবছেন ধর্ষণ-উন্মুখ সৈন্যকে গুলি করলে বিপন্না মহিলাও মারা যাবে। অবশেষে হিতাহিত ভুলে গিয়ে খান সেনাকে জাপটে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পাঞ্জাবি সেনার ক্রোড় থেকে আবদুল আহাদ কৌশলে ছাড়িয়ে নিলেন বাঙালি মহিলাকে। এবার দু'জনে ধস্তাধস্তি, লাথালাথি, হাতাহাতি, কিল-ঘুষি চলছে সমানে। তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বাঘে-বিড়ালে লড়াই।

পাশে জন্মদিনের পোশাক আদম ছুরতে দাঁড়ানো ছুরমান বিবি। পাঞ্জাবি সৈনিক লোডেড রাইফেল তাক করে ট্রিগারে চাপ দিচ্ছে আহাদকে লক্ষ্য করে। ছুরমান দৌড়ে এসে বুদ্ধি করে রাইফেলের পিছনে টান দিয়ে নিশানা ঘুরিয়ে দেয়। বাঙালি নারীর উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে যান আহাদ, দু'রাউন্ড গুলি চলে যায় আকাশের দিকে। সৈনিক আবারো চেষ্টা করছে গুলি করার জন্য, কিন্তু পাঞ্জাবি সৈনিকের রাইফেল থেকে আর গুলি বেরুচ্ছে না। যেন অদৃশ্য ইশারায় রাইফেলের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে গেছে।

শাঁখা পরা বাঙালি বধূর ঘোমটা খোলার বালাই গেছে। মানুষের দেওয়া আভরণ মানুষ ছিঁড়েছে। আল্লাহর দেওয়া নিরাভরণ আভরণে বাঙালি কামিনী কাল-নাগিনীর মহাতেজে ফুঁসে উঠলেন। বিষাক্ত ছোবলে ছোবলে হাত-নখ-দাঁতের আদি-অকৃত্রিম অস্ত্রে শত্রুকে ঘায়েল করছেন। বাঘিনীর থোরা আঘাত রুখতে গলদঘর্ম হায়েনা পাক-সেনা। মান-ইজ্জতের ডর-ভয় আল্লায় নিজেই কেড়ে নিয়েছে। বেঁচে থেকে কী হবে। কী নিয়ে বাঁচবো! যা থাকে কপালে, শত্রুকে মেরেই তবে মরবো। রণরঙ্গিনী মাতঙ্গিনীর উন্মাদনায় প্রতিশোধের ক্রোধে শত্রুর ওপর আপতিত হয়।

বাঙালি নারী-পুরুষের মিলিত যুদ্ধ ঃ একই শত্রুর বিরুদ্ধে লেগেছে নারী-পুরুষ। ভাইবোনের প্রাণপণে রণ পাঞ্জাবি হত্যায়। জীবনের প্রথম দেখা মুক্তি-ভাইয়ের সব ইঙ্গিতই যেন বোন ছুরমান বুঝতে পারেন। দু'জনের ধস্তাধস্তিতে উভয়ের হাতিয়ার খসে গিয়ে ছিটকে দূরে পড়ে। শত্রুর চীনা অস্ত্রের বেয়নেট খুলে দূরে লুটায়।

আর কুলিয়ে উঠতে পারে না আবদুল আহাদ পাঞ্জাবি ঘোড়ার সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আহাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই খানসেনা তাঁকে বুকে চেপে জাপটে ধরে। খসে পড়া বেয়নেটের দিকে হাত বাড়িয়েও নাগাল পায় না। দিব্য দৃষ্টিতে বোন যেন বাঙালি ভাইয়ের ইঙ্গিত ও নিজের করণীয় বুঝতে পারেন। খানের সঙ্গে পাঞ্জায় পারছেন না বাঙালি সেনা।

পাঞ্জাবি সেনা মুক্তির গলায় টিপে ধরে। জিভ বেরিয়ে আসছে মুক্তির। এসব দেখে ঠিক থাকতে পারে না ছুরমান। অচঞ্চল হাতে নিজেই তুলে নেন বেয়নেট। কারবালার সখিনা, রাজপুতানী পদ্মিনীদের ব্যঙ্গ করে বাংলার ইতিহাসের চিরঞ্জীব বীরাঙ্গনা চকচকে বেয়নেট আমূল বিঁধিয়ে দেন খানের পিঠে। মুখে মধু বুকে বিষ, হাতে বেয়নেট জানলে বাংলার কালকুটে ভরা এ কাল ভুজঙ্গে হাত দিতো না পাঞ্জাবি খান। এবার যশোরের উর্ধ্ব ঝালের ঝাঁজ আঁচ করলো পাঞ্জাবি।

এবার মওকা পেয়ে যায় মুক্তি আহাদ। ত্বরিত উপরে ওঠে কাঁক করে খানকে কাত করে পলকের ঝলকে খানের অস্ত্র প্রয়োগ করে খানেরই ওপর। পিঠের বেয়নেট এবার আমূলে গিয়ে বিঁধে পাঁজরে। মহারোষে ফেটে পড়ে খান। আহত জানোয়ারের মতো কাতরাতে থাকে কয়েকবার। তারপর সব শেষ।

নিজের জামা খুলে বোনকে পরতে দেয় বাঙালি মুক্তি-ভাই। চলো বোন একটা আশ্রয়ে যাই।

মহিলার স্বামীর আর আসা হলো না। স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষায় শত্রুর সাথে লড়ে শাহাদতের গৌরবে তিনি ধন্য হলেন। মহিলার শাশুড়ি বুড়ি এলেন। সব দেখলেন। পুত্র হারাবার বেদনার চেয়ে পুত্র বধূর উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসে তিনি বিমুগ্ধ। আখের ক্ষেতে মা এসে দেখেন রক্তে ভেজা পাক-হায়েনা রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধায় বীরাঙ্গনাকে তাঁরা সালাম জানান।

চারপাশে গোলাগুলি খুনাখুনির যুদ্ধ চলছে। আশেপাশে নিকট-দূরত্বে পড়ে আছে নিহতের লাশ। গাছপালা-বাগানের আড়াল বলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। এখানকার নিহত সঙ্গীর খবর পেলে নেমে আসবে চরম পাক প্রতিশোধ। খানের মরণ অন্য খানসেনারা সহজে মানবে না। কাজেই এখান থেকে পালাতে হবেই। এক সঙ্গে পালালে বাঁচবে না কেউ। ধরা পড়লে কারুরই বাঁচা নেই।

মুক্তিসেনা ভাবেন, এদের নিয়ে পালালে রক্ষা নেই। দ্বিতীয়তঃ দুটো রাইফেল নিয়েই পালাতে হবে। এদিকে বুড়ির আকুল কান্না, "এক ছেলে গেছে। বাবা তুমি আমার ছেলে। বউরে বাঁচাইলা ক্যান? আমাদের সঙ্গে নেও।" বউয়ের কান্না, "ভাই, ফেইলা যাবা তয় বাঁচাইলা ক্যান? রাইফেল একটার যাগায় দুইটা পাইছ। আমারে গুলি কইরা মাইরা রাইখা যাও।" অপরদিকে, পদধ্বনি ও গোলাগুলির শব্দে বোঝা গেলো ধেয়ে আসছে শত্রুসেনা। মহিলাদের সবিনয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হলোঃ সবাই মরতে চাও তো একসাথে জটলা করো। আমারে মারতে চাও তো ছাইর না। আমার ভাবনা আল্লায় ভাববেন। মা-বোনেরা জঙ্গলের পথে পালাও। বাঁচলে আবার দেখা হবে।

মুক্তিসেনা ও পাকসেনাদের যুদ্ধ ঃ জংলা গাছপালার আড়ালের কারণে এতোক্ষণ সবাই রক্ষা পেলেন। এবার খানেরা সদম্ভে আসছে। মহিলারা হাওয়া! আহাদ গাছের আড়ে। শত্রু অতি নিকটে। তখনো নিজের রাইফেলে পাঁচ ও শত্রু এস.এম.জি.-তে আট রাউন্ড

গুলি আছে। নিকটবর্তী শত্রু সেনার উপস্থিতি বুঝা যায়। কাউকে দেখা যায় না। তারা ভূমিতে শুয়ে হামগুড়িতে এগিয়ে আসছে। পাক ও মুক্তি কেউ কাউকে দেখছে না, তবে পরস্পর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে। আধা ঘন্টার মতো পাকসেনা-মুক্তির লুকোচুরির যুদ্ধ চলে। দূর থেকে তাদের মেশিনগানের গুলিতে মাঠঘাট গাছপালা ভাজা ভাজা। অল্পাহর মর্জিতে কোনো গুলি মুক্তির গায়ে লাগেনি।

হঠাৎ পদ শব্দে উৎকর্ণ। পিছন ফিরে আহাদ থ। বেশ কিছু শত্রু সেনা ছুটে আসছে। তাদের মাথায় হেলমেট। সামনে মাথা দুলিয়ে ছুটে আসছে তারা খোদ পাক মেজরের নেতৃত্বে। হাতে ব্যাটন নাচিয়ে মেজরের গর্জন "এডভান্স"। মুক্তি ফৌজ ক্যায়সা চিজ হ্যায় হাম দেখে গা। উনকো জিন্দা পাকড়ো।" এবার হাতিয়ার ফেলে মুক্তি দৌড়ে নিজের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করে।

প্রাণ বাচাঁতে মুক্তির দৌড়...দৌড়....দৌড়.....। খোদার অসীম কৃপায় খানা খন্দকের মধ্যে দিয়ে ক্রস-কান্ট্রি দৌড়ে তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে আসতে সক্ষম হন। আইচপাড়া চেয়ারম্যান বাড়ির দিকে যেয়ে তিনি এবার হতভম্ব। এ-যে স্বেচ্ছায় যেচে এসে ফাঁদে ধরা দেওয়া। সামনে মেলা খান সেনা ভূমি-শয্যায় চুপচাপ পজিশন নিয়ে আছে। এক খান সেনার মাথায় পা দিতেই উঠে তার তাড়া। গোলাগুলির মাঝে দক্ষিণ দিক থেকে দৌড়ে আসার ভুলের মাশুল আবার উত্তরে দৌড়ে শোধরাতে চাইলেন তিনি। গ্রামের নিরস্ত্র কাজের ছোকরা ভেবে খানরা প্রথমে উপেক্ষা করছিলো। এ-বাড়ি সে-বাড়ি অলিগলির পথে দৌড়ুতে দেখে তার পেছনে খান সেনাদের তাড়া। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সৈন্যরা অয়েদের পিছু ছুটছে। মুক্তি ভাবে, ধরা না পড়ে গুলিতে মরাই শ্রেয়, অন্ততঃ পাকিদের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। গুলির ভয়ে এক পাকা ঘরে গিয়ে পালায় মুক্তি আয়েদ। মাজায় প্যাচানো চায়নিজ গুলি রাখার কাপড়ের বেল্টুলিয়ার, গেঞ্জি খুলে গামছা গায়ে গ্রাম চাষা সাজে সে। দরজায় দাঁড়াতেই এক খানসেনা বাম হাত চেপে ধরে জেরা করে, "সাচ বাত বাতাও তোমকো মোকাম কেধার?" পাক সেনার চাপে ব্যথায় হাত টনটন করে মুক্তির। এবার বলে, "হা বাতাতেছি হা বাতাতেছি" বলে রোয়াকে এসে লাফ দেয়। টাল সামলাতে খান সটান ভূমিতে। দৌড়ে সিংহ দরজার মুখে এসে দেখে হাতিয়ার হাতে মেলা খান সেনা দাঁড়িয়ে। একজন তাঁকে ধরে ফেলে। ভূ-পতনের খান মুক্তির অধঃপতন কামনায় রাগে গড় গড় করতে করতে মুক্তিকে দিলো ভীষণ মারের আচ্ছা পাক ধোলাই।

মুক্তি আশ্রয়ের পরিণতি ঃ আইচপাড়া ছানাউল্লাহ সরদার-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয় মুক্তি আহাদ। মুক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাড়ির মালিক ছানাউল্লাহ ওরফে সোনাই সরদার ও তাঁর ছেলে আব্দুল মালেক সরদারকে শত্রুরা ধরে ফেলে। শত্রুরা বাপ-বেটাকে দেয় বেদম পিটানি। সোনাই সরদারকে ধরে আহাদের আকুল কান্না। আমাকে আপনার চাকর পরিচয় না দিলে সবার মরণ হবে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মুক্তিফৌজ রক্ষায় সোনাই সরদার মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানান। উর্দু জবানে মুক্তি সন্দেহে ধরা দুই নওজোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ চলেঃ "বাতাও তোমকো মোকাম কেধার? 'বাউকোলা গ্রামে বাড়ি'—এই বাংলা জবাবে তারা নাখোশ।

উর্দুতে বাতচিতের নির্দেশ দেয় খানেরা। উর্দু জানিনা জবানের কারণে রাগে মেজর অগ্নি শর্মা। হাতের ছড়িতে মারলেন সাঁই সাঁই দু'ঘা। হায় সে কি গা জ্বলা মেজরের পিটানি। সঙ্গে সঙ্গে এক কালো দড়িতে হাত বেঁধে চোলাই দিতেই গা অবশ হয়ে যায়। এবার জবান খোলতাই হয়। "হাঁ, থোড়া থোড়া উর্দু বাত জানতে হে"। দরদে বেরাদর মেজর, "হা বাতাইয়ে তোমকো মোকাম কেধার? "কাঁদো কাঁদো ভাঙ্গা গলায় তাজিমের নরম জবান, "বাউখোলা গোরামমে হামার মক্কান। "তাদের সওয়াল, "এধার কিয়া কামছে আয়া? "বিগলিত বিনয়ের জবানে, "এ-ধার সোনাই সরদার কা ঘরমে নওকড়ি করতেহে। তাদের অবিশ্বাস, ঝুট বাত। তোম জমিদার আছে। এবার তারা সরদারের কাছে তাঁর ছেলে মালিক ও আহাদ সম্বন্ধে জানতে চায়। দুটাকেই তাদের কাছে মুক্তি মুক্তি মালুম হয়। "সাচ সাচ বাত বাতাও। তোমাকো ছোড় দেয় গা"। এই খোকা আমার বাড়ির চাকর। আর এই আমার বেটা আছে"। ব্যাপার সুরাহার ব্যর্থতায় মেজর সপ্তমে, নওকর আভি বাতাও তোমারা নাম কিয়া? " আমার নাম আব্দুল আহাদ" শুনে মেজরজি, ইনকো হামি চিনতেছে। দেখেগা কালিগঞ্জমে। ইয়ে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল কা আদমি। "মুক্তি রক্ষায় বাপবেটা সোনাই সরদাররা বন্দি। মুক্তি যুগের সহমর্মিতার এমনি মহত্ব।

অত্যাচারের অগ্নি পরীক্ষায় ঃ তিন বন্দিকে নিয়ে যায় আবাদের হাটখোলা। দুদিন পর তাঁদের সঙ্গে এসে শামিল হন আনসার-মুক্তি বশির আহমদ। তিনি ধরা পড়েন বাঁশদা কাজিপাড়া মুক্তি নারানজোল। মুক্তির তথ্যাদির জন্য তাঁদের ওপর চলে অবিশ্বাস্য নারকীয় অত্যাচার। বশিরের হাত-পা'র রগ কেটে দেয়া হয়। বুটের লাথিতে তাঁর চোয়ালের ভাঙা হাড়ের দাগ নিয়ে তিনি আজো জীবিত। পাকিদের বাঁশ কল অত্যাচারের নিষ্ঠুরতায় তাঁরা সংজ্ঞা হারাতেন। দু'হাত পিছ মোড়া বেঁধে দু'বগলে লম্বা বংশ দণ্ড ঢুকানো হতো। সে বংশ দণ্ডের বর্ধিত অংশ হাটুর নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ফেলে রাখা হতো। নতুন সেন্ট্রি গ্রুপ আসতে যেতে তাঁদের ওপর বুটের কিকের মহড়া চালাতো।

সোনাই সরদার রাইফেলের বাটের গুতায় সংজ্ঞা হারালে সহবন্দি বশিরের শুশ্রূষায় সংজ্ঞা ফিরে পান। সোনাই সরদারের অর্ধেক দাড়ি সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলে ফেলা হয়। পায়ের তলায় গন গন আগুনে গরম করা ইস্ত্রির চাপ দিয়ে তথ্যাদি চাওয়া হতো। বন্দিদের গায়ে পোড়া সিগারেট না নিভা পর্যন্ত ধরে রেখে দোস্ত দোস্ত ক্যায়ছা লাগতা হায় বলে পোড়া মাংসের গন্ধে রসিকতা চলতো পাকিদের। জাতির নামে, সবাই অগ্নি পরীক্ষায় বেঁচে গেলেন। কেউ কারো বিরুদ্ধে বললেন না। গোঁয়ার বঙাল নতি স্বীকার করলেন না। ২৭ দিনের মাথায় সোনাই বাপবেটা মুক্তি পেলেন। এদিকে, সোনাই পত্নী কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ প্রায়। জীবন্মৃত মুক্তিপ্রাপ্ত সোনাই মীর্জাপুর ও ঢাকার চিকিৎসা করেও বাঁচলেন না। বুকে আঘাতজনিত কলজে-ফাটা ক্যান্সারে ২৭ দিনের মাথায় স্ত্রী-সন্তানের চোখের সামনে মুক্তি-আশ্রয়ে সোনাই চলে গেলেন সকল আশ্রয়ের উর্ধ্বে।

অত্যাচারে অজ্ঞান বশির কখন কি বলেন ঠিক নেই। কখন রাজাকারে যাবেন বলেছেন, তিনি নিজেও জানেন না। শত্রুর সাথে খাতির জমিয়ে সাতক্ষীরা ডায়মন্ড হোটেলে যান

বশির। পানি আনতে বেরিয়ে একজন সশস্ত্র শত্রুকে আহত করে তিনি পালিয়ে আসেন। আহাদকেও বাগে আনতে না পেরে মুক্তি দেয় শত্রুরা। গভীর অনুশোচনায় এই তিন মুক্তি [আবদুল আহাদ, বশির, আবদুল মালেক] সোনাই সরদারের কবর জিয়ারত করেন। অত্যাচারের জোয়ারে ভেসে বেঁচে থাকা মানুষগুলি দেশপ্রেমের সহ্য জগতের অনন্যনীয় নিদর্শন। সোনাই সরদার মরেও আজ অমর।

বিচ্ছিন্ন রক্তের ভাইবোন ঃ বিচ্ছিন্ন রক্তের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মোসাম্মৎ ছুরমান বিবি ও আব্দুল আহাদ। ১৯৭১ এর ভয়াল দিনের পর তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। দুজনেই দুজনের কাছে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা-রাজপুত্রের স্মৃতি মাত্র। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাতক্ষীরা মুক্তিযুদ্ধের কিশোর কালকেউটে আব্দুল মোমেন দীর্ঘ দিনের সাধনায় তাঁকে খুজে বের করেন। ইতিহাসের লাজুক মসিলিপ্ত অধ্যায় উন্মোচন করেন তিনি। না বলা গোপন স্পর্শকাতর কথাটি প্রকাশ করেন। মোমেন আজ মংলা পোর্টের ফায়ারম্যান লিডার। দু'বছরের নীরব সাধনায় সাতক্ষীরা কামান নগর হাবিব ফার্নিচারের মালিক মুক্তি গেরিলা আব্দুল লতিফের মাধ্যমে রক্তের চেয়েও আরক্ত সম্পর্কের ভাইবোনের বিষাদ বিদুর অশ্রুবন্যার উচ্ছ্বাসের মধুর মিলন। আহা সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। বিরলধর্মী অনন্য নজিরের মূর্তিমান বিগ্রহ বাংলার এক বীর নারী ও বীর পুরুষের মিলন। দুজনেই দুজনকে চিনে অবাক নির্বাক। রক্তস্নাত মুক্তি যুগের ভাইবোনের সম্পর্ক অক্ষয় হোক।

গরিব ঘরের বিরল ব্যক্তিত্ব ঃ ছেলে বন্দি পাক শিবিরে। মাকে অনেকেই খবর দেন, "খান সেনারা তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে।" পাগলিনী মা পুত্র ভিক্ষায় আল্লার দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। বাবা গোপাল গাইন পুত্র শোকে পাগল প্রায়। পাক জিন্দানখানার মুক্ত বিহংগ মায়ের কোলে ফিরে এলো। যুদ্ধ পাগল ছেলেকে মা ছাড়তে চান না। পরিচিত মুক্তি ক্যাম্প হাকিমপুর গেলে মা গিয়ে হাজির হবেন। হাকিমপুরের পাষাণ প্রাণ ক্যাপ্টেন/প্রফেসর সফিক আর যাই হোক মুক্তিযোদ্ধার মায়ের কাছে দুর্বল। মায়ের অগোচরে বাড়ি ছাড়লেন পুত্র। ৮নং সেক্টর ছেড়ে ৯নং সেক্টর। উঠলেন গিয়ে ভারতের ধলচি ক্যাম্পে। সীমাহীন যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। ফিরলেন স্বাধীন দেশে।

স্বাধীন দেশে যোদ্ধার অসহনীয় জীবন। ৫ বৎসর ঘুরে কাজ পেলেন আনসার ব্যাটালিয়নে। কোথা সে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ জীবন। বাবার তিরস্কার, স্বাধীনতা যোদ্ধার গোলামের নকরি। স্বাধীন পেশা ধর। স্বাধীনতা যোদ্ধার নাম সার্থক কর। দেশ গড়ার নামে কাঠগড়ার মিস্ত্রীর কাজে লাগলেন। স্বাধীন পেশার আনন্দে সুখে যায় দিন। আধা ডজন ছেলে মেয়ের সংসারে আগামী দিনের সুখ স্বপ্ন দেখেন আহাদ। বঙ্গ নারীর ইজ্জত রক্ষায় আত্মাহুতির মরণযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আব্দুল আহাদ। শত অত্যাচারে মচকায় তবু ভাঙ্গে না যে ব্যক্তিত্ব, তারই নাম আহাদ। স্বাধীন দেশে "শব পোড়া মড়াদেহ" মুক্তিদের দেশে গরিব ঘরের ক্ষুদ্র জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বাধীন পেশায় তিনি অন্যদের অনুকরণীয়। এমন মুক্তিযোদ্ধাকে জন্ম দিয়ে এদেশ ধন্য।

ছুরমান বিবির পরিচয় ঃ ছুরমান বিবির স্বামী আকবর আলি ৪০ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন। স্বামীর স্মৃতি হিসেবে আছে এক কন্যা ও দুই পুত্রঃ-

মোসাম্মত মেহেরুন্নেছা, জন্ম ১৯৫৪, বর্তমানে দু'বাচ্চাসহ বিধবা; মোঃ কামালউদ্দিন, জন্ম ১৯৬৭; এবং মোঃ আলালউদ্দিন, জন্ম ১৯৬৯।

কাগুজে বিদ্যা ছুরমান-পরিবারের কারুর নেই। সন্তানেরা সবাই গণ্ড মূর্খ। কবি কংকন চণ্ডি মুকুন্দরাম গানে বলেন ঃ-

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।"

এই মূর্খদের দেশপ্রেমের দীক্ষা দিল কে? দেশের জন্য তারা অকাতরে প্রাণ দেয়। মেহেদি রাঙা হাতে শত্রু হত্যা করে।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, দুর্ভাগ্যের বোঝা তার মুক্তিযোদ্ধা। তাও আবার মূর্খ বীরাঙ্গনা। তবু দুরাশা কেউ যদি তাঁদের তালাশে দেখতে চান ঃ-

মোসাম্মত ছুরমান বিবি, স্বামী ঃ মরহুম মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকবর আলি, গ্রাম ঃ আইচপাড়া, পোঃ কাউনডাঙা, উপজেলা + জেলা ঃ সাতক্ষীরা।

সে ভয়াল দিনের দৃশ্য আজো ছুরমান বিবির চোখে দেদীপ্যমান। জোয়ার ভাটার স্থানীয় নৌখালি খালে ভেসে গেছে প্রিয়তমের লাশ। সেথায় নিয়ত ঝরে তাঁর ব্যথাতুর হৃদয় আর্তির প্রেমের অশ্রু। মনের মন্দিরে অহর্নিশ তারই জ্বালা। আমাকে বাঁচাতেই তো সে প্রাণে মরলো। মুক্তিযোদ্ধার অপরাধই তার কাল হলো। আমার বাঁচার কি ফল? নৌখালি খালে প্রতিদিনের জোয়ারে তারই স্মৃতি নিয়ে আসে। মনের জোয়ারের মুকুরে প্রতিদিন সে ভাসে। খালের জোয়ারে অন্তর-মন-হৃদয় জোয়ারে তারই স্মৃতি । সে তো আর আসে না। দুটি ছেলে ও একজন বিধবা মেয়ের পরিবারের বোঝায় তাঁর আজকের সংসার। আল্লায় আজো স্বামী স্মৃতি নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁকে। আশাহত বিধবা ছুরমান বিবির এতেই সান্ত্বনা। দুঃখে কাটে তাঁর সংসার। স্বাধীন দেশে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে কি আর প্রশাসন চলে! কে রাখে সে হতভাগিনী দুঃখিনী মা ছুরমানের খবর!!

লাখো প্রণতি বীরাঙ্গনা ঃ আইচপাড়ায় শুধু বরফ শীতল শান্ত মধুর নারীর বাস নয়। এখানে কেবল ডুগডুগি বাজাইন্না লাউই হয় না। রসাল পেঁপের সাথে হয় হলুদ আর উর্ধ্ব ঝাল। উর্ধ্ব ঝালের ঝাঁঝের তেজে শত্রু-খুনে বাটা মেহেদি রাঙা হাত রাঙানো বধূ জনমে আইচপাড়া ধন্য। বীর পূজার দেশে নারী পূজায় জীবন সার্থক করি। নারী মুক্তিযোদ্ধা জীবন্ত প্রজ্জ্বলিত শিখা আইচপাড়ার বীরাঙ্গনা ছুরমান। মুক্তিযোদ্ধা ছুরমান, তুমি মুক্তির গর্ব। স্বাধীনতা যুদ্ধের অক্ষয় জোতিষ্ক। চিরঞ্জীব বীরাঙ্গনা, তোমারই পাদপদ্মে লাখো প্রণতি, হাজারো সালাম। গরবিনী বাংলার তুমি নারী গর্ব। তুমি তাঁদের কুল তিলক, অমর প্রদীপ। বিপদে অবলা নারীর তুমি সবলা নিদর্শন। তুমি তাঁদের আলোর বর্তিকা, প্রেরণার উৎস।

মুক্তিযুদ্ধে লাইলি

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগী রণাঙ্গন বার্তা ছুটতো বাতাসের আগে। ছুরমান বিবির উদ্দীপনায় পাশাপাশি আরো দু'জন নারী যোদ্ধার বিবরণ নিম্নরূপঃ

যশোরের কলারোয়া থানার বর্ডার সংলগ্ন গ্রাম কাকডাঙা। সে গ্রামের চুনটি ইমান আলি। চুনটি মানে মাঠের শামুক কুড়িয়ে পুড়িয়ে চুন করে বেচে জীবিকা নির্বাহ করা। চুনটি ইমান আলির মেয়ে লাইলি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। চেয়ারম্যানের ঘোষণায় গ্রামে চলছে নিষ্প্রদীপ মহড়া। ঘরে আলো জ্বালালেও যেন বাইরে না আসে আলোর রেখা, এ মর্মে কঠোর হুশিয়ারি চেয়ারম্যানের। ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর বালিয়াডাঙায় পাক-আর্মির একটি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর তিন কোম্পানির প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেই প্রচুর হতাহত। সমগ্র অঞ্চলে যুদ্ধের বিভীষিকা। স্থানীয় জনতা ও মা-বোন অসীম সাহসে নিহতদের অতি সন্তর্পণে কবর দিচ্ছেন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য পার করে দিচ্ছেন বর্ডার এলাকা।

১৮ সেপ্টেম্বর শত্রুর পাউন্ডার শেলের আঘাতে গেরিলা ক্যাপ্টেন সফিকউল্লাহ মারাত্মকভাবে আহত। শত্রুর গুলিতে সংকটাপন্ন মরণদশায় আহত গেরিলা রতন। সন্ধ্যার আঁধার নামতেই তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটেন পুব থেকে পশ্চিমে বর্ডার সংলগ্ন মুক্তি-ক্যাম্প হাকিমপুরের উদ্দেশে। শেষ শক্তির বিন্যাসে রতন এলেন কাকডাঙার ইমান আলির বাড়ির উঠানে। ইমান আলির মেয়ে লাইলি ঘরে বসে হ্যারিকেনের আলোতে পড়ছিলেন। জানালার ফাঁকে হ্যারিকেনের সামান্য আলো বাইরে আসলে রতন বাঁচার তাগিদে লাইলিদের উঠানে আসেন। মুক্তি-কমান্ডার সফিকউল্লার উদ্যোগে সম্ভ্রম বাঁচাতে স্থানীয় মা-বোনদের যে ক'জনকে অস্ত্র-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাঁদের একজন লাইলি। ইমান আলির আঙ্গিনায় সশস্ত্র আহত মুক্তি রতনের হাহাকারের আর্তি "তোমরা আমাকে বাঁচাও"। লাইলি তখন বারান্দায়, আলো খুব কম, জোর দিয়ে পড়ছিলো। ইমান আলি গরিব, দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে। বেঁচে থাকতে স্থানীয় পিস কমিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশে নিষ্প্রদীপ মহড়ায় অংশ নিতে হয়। মেয়েকে কয়েকদিন বলেছেন, "মা, আলো জ্বালিয়ে রাখিস না। শত্রুরা দেখতে পারলে তোকে রাখবে না। আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যাবে।" কিন্তু মেয়ে শোনে না। এতো আলো জ্বালা নয় বাবা, মুক্তির পক্ষে দূতীর কাজে আলোর সংকেত। সমুদ্রে দিশেহারা জাহাজকে দেওয়া বাতিঘরের সংকেতের মতো বাংলার ঘরে ঘরে আলোর প্রদীপ।

ইমান আলির বাড়িতে রতনের মর্মকাতর কণ্ঠের কাতরানির নিরুরুণ ধ্বনি, "বাড়িতে কি কেউ আছেন ভাই, আমার পায়ে গুলি লেগেছে। আমাকে একটু জায়গা দেন। পাঞ্জাবিরা দেখতে পেলে আর বাঁচতে দেবে না।" মিনতিভরা আহ্বানে লাইলি বাতি হাতে বেরুতে চায়, কিন্তু মায়ের বাধা। লাইলির মার আকুতি, "বাতি বাইরে নিস না। দেখতে পেলে সকালে তোর বাবাকে ওরা ছাড়বে না।" এবার লাইলির আবদার, "মা আমি একবার শুধু দেখে চলে আসবো"।

আলো পড়তেই লাইলি দেখে, আহত মুক্তির সমস্ত শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে। এবার মাকে ডাকে লাইলি, "মা লোকটা বাঁচবে না, তুমি এসে দেখে যাও।" আলো বারান্দায় রেখে মা

ছুটলেন রতনের সেবায়। যুদ্ধাহত রতন তখন সটান ভূমিতে পড়ে আছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি রতন।

আর্তের সেবায় মেয়ের সঙ্গে মা-ও ছুটে এলো। নির্জন বাড়ি। তবু মেয়েকে জোরে কথা বলতে মায়ের বারণ। মা-মেয়ে মিলে মুক্তি উদ্ধারে নিবেদিত তাঁরা। মা ধরেন মাথায়, মেয়ে পায়ে। এভাবে দু'জনে ধরাধরি করে রতনকে ঘরের ভেতরে শত্রু-নজরের আড়ালে নিয়ে আসে। অতি ত্রস্ততায় মা রতনের মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে বলেনঃ "এখন যদি পাঞ্জাবিরা আসে তা'হলে কি হবে?" বাস্তবে মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে পাক আর্মির ক্যাম্প; কাকডাঙা বর্ডার আউটপোস্ট বা বিওপি। মায়ের কথা শুনে বাঘিনীর তেজের ঝাঁঝে লাইলি উত্তর দেয়ঃ "কি আর হবে মা, সবংশে নির্বংশ হবো। আমাদের চোখের সামনে মুক্তিযোদ্ধা ভাই মরছে, আর আমরা কিছুই করতে পারবো না! বলতেও পারবো না!! আসুক শত্রুরা, মুক্তির অস্ত্রেই তাদের রুখবো আমি।" আজ তিন-চারদিন যুদ্ধ চলছে। কতো মুক্তি শহিদ হলো। কতো আহত ল্যাংড়াচ্ছে। ছুরমান বিবির পথ ধরবো। কিন্তু বিনা যুদ্ধে ছাড়বো না পথ।

এমনি নাটকীয় মুহূর্তে ইমান আলি বাড়িতে এলেন। "কি হয়েছে, কার মাথায় পানি ঢালছো মা?" জিজ্ঞেস করেন ইমান আলি। আবেগাপ্লুত লাইলি বলেন ঃ "ইনি মুক্তিবাহিনী। সন্ধ্যার সময় বেলেডাঙার দিকে যুদ্ধ হয়েছে। ইনি ওদিক থেকেই এসেছেন। দেখ দেখ বাবা, পায়ে গুলি লেগেছে, রক্ত বেরুচ্ছে। আমাদের উঠানে এসে এসব কথা বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন।" সব দেখেশুনে বাকরুদ্ধ হয়ে আসে লাইলির বাবা ইমান আলির কণ্ঠ। আফসোস করে ইমান আলি, "কার ছেলে গো আল্লা কে জানে? মা-বাবার কোল খালি করে দেশের জন্য এভাবে জীবন দিচ্ছে পথেঘাটে বিদেশি শত্রুর হাতে। খোদা তুমি এর বিচার করো।"

প্রিয়জনের সান্নিধ্যের মতো আহাজারির মাঝেও মাথায় শীতল পানির প্রাথমিক সেবা ও বাঙালি-মায়ের স্নেহের পরশে আহত রতন ফিরে পেলো জীবন। চোখ খুলে দেখে তার পায়ে গেন্দা ফুলের পাতা দিয়ে নেকড়ার পট্টি বাঁধা। পরম তৃপ্তিতে মুক্তির আর্তি, "হাকিমপুর মুক্তি ক্যাম্প কতোদূর?" ত্রস্তে লাইলির বাবা এসে মুক্তিকে সাবধান করে দেয়, "এমন কথা মুখে এনো না বাবা। চুপ! পাশেই পাঞ্জাবি ক্যাম্প। শুনতে পেলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাদের অত্যাচার করবে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিবে।" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে মুক্তি রতন বলে, "আপনারা আমার জীবন বাঁচাইছেন। আমি ঋণী আপনাদের কাছে। আর বিপদ ডাইকা আনবেন না। এবার শুধু সময় কইরা আমাকে বর্ডারের পথটা দেখাইয়া দেন। আমি চলে যাই।" মুক্তি রতনের কথায় ইমান আলির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পুত্র স্নেহে তিনি নিজেই বলেন,"একটা কিছু মুখে দাও। দাঁড়ানোর শক্তি হলে আমি নিজেই তোমাকে ক্যাম্পে দিয়ে আসবো।"

সারাদিন না খেয়ে যুদ্ধ করেছে রতন। এখন দাঁড়ানোর মতো শক্তি নেই। লাইলির মা জোর করে রতনের মুখে খাবার তুলে দেন। সেবাযত্নে ব্যস্ত লাইলি নিজে। এখন খাবার ও সেবা না পেলে রতনের নিশ্চিত মৃত্যু।

তাড়াঘড়ি খেয়ে নেয় রতন। মনে হচ্ছে আবার যুদ্ধে যেতে পারবে যেন। নিঃশক্তি শরীরেও

চোখে-মুখে তৃপ্তির রেখা। কান্নাভরা কণ্ঠে রতন বলেনঃ "পাঁচমাস পরে মায়ের স্নেহ পেলাম। আপনি আমার জন্মধাত্রী মা না-হলেও বাঙালির অনেক মায়ের একজন। আল্লাহ আপনাদের রহম করুন।" এবার লাইলির মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে রতন। ভ্রাতৃস্নেহে সেবার জন্য লাইলিকেও জানায় পরম কৃতজ্ঞতা। সকলের না-না'র মধ্যেও রতন রওয়ানা দেয় ক্যাম্পের পথে, সঙ্গে অভিভাবক ইমান আলি। তখন রজনীর শেষ যাম। তাঁরা রওয়ানা দেয় মুক্তি ক্যাম্প হাকিমপুরের উদ্দেশে। ইমান আলির কাঁধে হাত রেখে খুঁড়িয়ে-ল্যাংড়িয়ে হাঁটে মুক্তি রতন।

প্রত্যুষের পূর্বেই রতনকে নিয়ে ক্যাম্পে এসে পৌছোয় ইমান আলি। মেজর মঞ্জুর তখন বসা। তাঁর হাতে সঁপে দেয় মুক্তি রতনকে। এভাবে মুক্তি-সেবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় চাষি ইমান আলি।

মুক্তিযোদ্ধা রতন ইমান আলি লাইলি ও লাইলির মায়ের সেবাযত্নের কথা ভুলেনি। যুদ্ধের পরে এসে লাইলিকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। তাঁরা আজ সুখী দম্পতি। [রেফারেন্সঃ মুক্তিযুদ্ধে ন'মাস - গেরিলা আবদুল মোমেন (অপ্রকাশিত)।]

লাউডুবির যোদ্ধা রমণী

ছুরমান বিবির যুদ্ধ চেতনার বীরত্বগাথা পার্শ্ববর্তী এলাকার মহিলাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বালিয়াডাঙা যুদ্ধে প্রচুর হতাহতের মাঝে জয়পরাজয় তখনো অনিশ্চিত। যুদ্ধাহত মুক্তি-ক্যাপ্টেন সফিক শেষ না দেখে রণাঙ্গন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়। বস্তুত, মূল রণাঙ্গনের আশপাশের কাট অফ পার্টির দুর্বলতাই তাঁর পরাজয়ের বিশেষ কারণ বলে তিনি মনে করেন।

প্রবল শেল গোলাগুলির মাঝে যুদ্ধাঞ্চলে পুরুষ বলতে কেউ ঘরে ছিলো না। এ-অঞ্চলটাকে বলা হতো মুক্তাঞ্চল। এখানে পাক আর্মি এসে কখনো তিষ্ঠাতে পারেনি। মুক্তির উৎপাতে তারা কখনো এখানে স্থায়ী আস্তানা পাততে সাহস করেনি। জনতা সে-কারণেই এর নাম দিয়েছে 'মুক্তাঞ্চল'। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষের সকল বাঙালি এখানে এসে ঘরসংসার করতে পারতেন নিরুপদ্রবে। যে-কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের বাঙালি জামাত-লীগার সবাই এখানে এসে থাকতে পারতো। কোনো অসুবিধা ছিলো না। তাই দুর্দিনে ক্যাপ্টেন সফিককে রক্ষায় সকলে এগিয়ে এসেছিলো। মুসলিম লীগার সোলেমান সর্দার ও জামাতের মাহবুব সর্দার অবরুদ্ধ মুক্তিদের আহার যোগান সে-সময়।

যুদ্ধাঞ্চলের নারীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে না-পালানোর অন্য বিশেষ কারণ ছিলো। তাঁদের ওপর ধর্ষণ-বলাৎকার রোধে মুক্তি-ক্যাপ্টেনের অকুস্থলে উপস্থিতি ছিলো বিশেষ বিবেচনায়। এছাড়া, পুরুষ-শূন্য ঘরের অস্থায়ী সম্পদ লুটপাট বন্ধে মুক্তিরা উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশ থেকে ধরে নিয়ে যারা খাসি-বকরি-মুরগি-পাট ও অন্যান্য ফসল ভারতে বিক্রি করতো, মুক্তি ক্যাপ্টেন তাদের ধরে এনে প্রকাশ্যে বেদম পেটাতেন। শুধুমাত্র অনুরূপ কারণে নিজেরই কোম্পানির ইপিআর (পরবর্তী বিডিআর) হাবিলদার রমিজের জন্য পদাবনতি ও পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করেন ক্যাঃ সফিক। কলারোয়া বর্ডার সংলগ্ন সুলতানপুর গ্রাম থেকে লুটে আনা দোনালা বন্দুক, ট্রানজিস্টার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা

করেন তিনি। মহিলাদের ওপর যে-কোনো রকম অত্যাচারে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। রসিকতা করে অনেকে বলতো, ক্যাপ্টেন বেটা সুন্দরী বউয়ের দুঃখে ক্ষেপে আছে।

পাক-আর্মি ও রাজাকার শূন্য মুক্তাঞ্চলে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের খবর একেবারে মিথ্যা ছিলো না। একবার মুক্তি-ক্যাপ্টেন কয়েকজন সহযোগীসহকারে গভীর রাতে ঢুকলেন দেশের অভ্যন্তরে, উঠলেন নির্যাতিত এক লীগারের বাড়িতে। মুসলিম লীগার সশস্ত্র কাপ্তানকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সৌজন্যের চা-নাস্তাও দিলেন। এবার এসে মিনতি করলেন, "আমাকে সবংশে হত্যা করুন। এই নিন আমার লোডেড দোনালা বন্দুক।" হতচকিত কাপ্তান নিজেকে সংযত করে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনলেন। জানলেন। এবং ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে এসবের প্রতিকার করলেন।

বাংলার মুক্তাঞ্চলে দিনের আলো ও রাতের আঁধারে ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা, পর্যুদস্তা মায়েদের পাশে মন্দভাগ্য এই কাপ্তান এসে হাজির হতো। ডেটল, তুলা, ঔষধ, সামান্য খাবার, আর্থিক অনুদান, পরিধেয় ক্ষুদ্র এক-টুকরা কাপড় ও সমবেদনার অশ্রু ছাড়া দেবার কিছুই ছিলো না। তবে চরম বিপর্যয়ের পূর্ব বা পরক্ষণেই তিনি থাকতেন মানুষের পাশে। বিপর্যস্ত মানুষেরা প্রায়শই বলতেন, "বাবা মুক্তি, তোমার এই অস্ত্রটা দিয়ে আমার বুকটা ঝাঁজড়া করে দাও। ইজ্জত না থাকলে অভাগীদের আর রইলোটা কি?

নারী লোভের পিয়াসীদের মুক্তি ক্যাপ্টেন কখনো ছোট শাস্তি দিতেন না। তেমনি দুঃসাহসী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শামসুর আলি মণ্ডল। অনুরূপ অপরাধে শামসুর মণ্ডল পাক আর্মির এক সেকশনকে মরণজয়ী সাহসিকতায় পাঠান জীবনের পরপারে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষকদের শাস্তি দিতে গিয়ে পরিস্থিতির কারণে, কিংবা ক্রস ফায়ারে নির্যাতিতাকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। এমনটি ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিলো না। তবে এটা ঠিক, শুধুমাত্র নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের কারণেই রণাঙ্গনে আহত কাপ্তানকে প্রতিদান দিতে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলার অসংখ্য নারী, যাঁদের প্রতি এই যোদ্ধা-কাপ্তান-লেখক চিরঋণী।

মুক্তি-আশ্রয় বাড়ির অতি আদর-যত্নের ফাঁকে ফাঁকে মহিলারা কৌশলে রাইফেল, স্টেন গানসহ বিভিন্ন অস্ত্রপাতি খোলা, জোড়া লাগানো এবং ব্যবহার শিখে নিতো মুক্তিদের নিকট থেকে। অনেকে শিখে নিতো কোদাল শাবল খুনতি প্রভৃতির সাহায্যে ট্রেঞ্চ খোঁড়া। অল্পবয়সী মেয়েরা এসব বিষয়ে তাড়াতাড়ি বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলাদের দিয়ে শত্রু আস্তানার অবস্থান, গোপন খবর, আরো অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হতো। কোনো কোনো সেক্টরে এ-জন্য মহিলাদের ব্যাটল্ ইনোকুলেশন-এর ব্যবস্থা ছিলো। এভাবেও অনেকে প্রত্যক্ষ যোদ্ধা বনে যায়।

লাউড়ুবি যুদ্ধে মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যান। তারা মুক্তি কাট-অফ পার্টির সঙ্গী। এই কাট-অফ পার্টির সঙ্গী সিলেটের ইপিআর নায়েক সফি। গাট্টা-গোট্টা অবয়বের চেহারা-ছোরতে সফিকে দেখতে মনে হতো রাক্ষসের ভাই খোক্কস। মুক্তিরা পাক আর্মির পলায়নের পথে আটকে দিলে, তাদের কাট অফ পার্টির চোরা গোপ্তা পথে পালাতে ধেয়ে আসছে ৬ পাক সেনা। প্রত্যেকের কাঁধে লোডেড এলএমজি। প্রতিটি এলএমজিতে

অতিরিক্ত ৫টি করে বুলেট ভর্তি ম্যাগজিন। পড়ন্ত বিকেলে ধান-পাট ক্ষেতের মেঠো পথ ডিঙিয়ে ধেয়ে আসছে পাক আর্মি। হতচকিত মুক্তিরা পালানোর চিন্তায় আছে। সাহায্যকারী আশপাশের মহিলা যোদ্ধারা বিক্ষুব্ধ। মুক্তি ভাইরা পালাবে, আর পাক সেনারা এসে আমাদের বেইজ্জত করবে। মহিলা যোদ্ধাদের প্ল্যানর প্ল্যানরে মুক্তিদের চৈতন্য বিদিশা হয়ে গেছে। মহিলারা অতি দ্রুত কোদালে মাটি কেটে মুক্তিদের সামনে প্রতিরক্ষার আড় তৈরি করেন, যেন অনায়াসে মুক্তিরা দেয়ালের আড়ালে জীবন বাঁচিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন। অতি সহজ বুদ্ধিতে তারা বুঝিয়ে দিলেন এরই নাম মুক্তি-মহিলার বুদ্ধি। কিন্তু এতেও মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের ডর কমে না। মহিলা মুক্তিরা এবার ক্ষেপে গিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল শুরু করলে দক্ষ মুক্তিরা অস্ত্র হাতে নেয়। মুক্তি-মহিলারা বলেঃ "আমরা ছুরমানের বোন। রুখবো পাকসেনাকে, যা থাকে কপালে।"

পড়ন্ত বেলায় চাষিরা মাঠের কাজ সেরে গরু-বাছুর নিয়ে ঘরমুখো। প্রকাশ্য মাঠে আওরাত-মরদের পাছরাপাছরি ও অস্ত্র ছিনতাইর জীবন্ত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলো সবাই। ঘরমুখো রাখাল-কামলাদের দু'চারজনও ক্রমশঃ জড় হচ্ছিলো মুক্তিদের কাছাকাছি। অন্যরা দূরে থেকে দেখে হতভম্ব। এমতাবস্থায় মুক্তিরা পালাতে চাইলে মহিলারা মুক্তিদের শাসিয়ে দেয় এই বলে যে, 'আজ পাক-বাহিনী রেখে তোদের জবাই করা হবে।' এবার মুক্তিদের আগে-পিছে শত্রু। মুক্তির নায়েক গড়াগড়ি খেয়ে তাঁর নাক-মুখে-মাথায় সারা শরীরে কাদার ল্যাপ্টা-লেপ্টিতে বিদঘুটে ওরাং-ওটাংএর মতন কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা হয়েছে। যমদূত-প্রায় পাক-আর্মি মুক্তিবাহিনীর ওপর আপতিত প্রায়। কিন্তু শত্রুর ওপর গুলি বর্ষণ ভুলে নিজেরাই তারা ঘর সামলাতে ব্যস্ত।

এমতাবস্থায় অগতির গতি নায়েক শফি আল্লাহর নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক-বাহিনীর ওপর। আশপাশের নারী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ সকলে সম্মিলিতভাবে ধ্বনি তোলে "জয় বাংলা"। গ্রামের কৃষক নিজেদের বুকে যেন প্রাণ ফিরে পায়। তাঁরা সকলে মিলে যার যা ছিলো দা-খুনতা, কাস্তে-কোদাল-শাবল-ফান্না হাতে হাতে আগে বাড়িয়ে যোগান দেয় সবল যুবক-মহিলাদের। মুক্তিরা পিছে, গ্রামের নারী-পুরুষ আগে আগে ছোটে আর্মির মোকাবেলায়। বাংলার মাটিতে এমন সাহসিনী বাঘিনী মা-বোন জন্মাবেন ভাবিনি। বার ভূঁইয়ার প্রতাপাদিত্যের যশোর। দিল্লীশ্বরো-জগদিশ্বরো সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি জানালেন প্রতাপাদিত্য।

"ধু ধু নহবত বাজে যশোর নগর ধাম
প্রতাপাদিত্য নাম ধুম ঘাটে মহাধুমধাম
নাহি মানে পাদশায় কেহ নাহি আঁটে তায়"।

আকবরের সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বশ্যতা স্বীকারের কৌশল বেছে নিলেন। তিনি যুদ্ধ এড়াতে দূত মারফত পাঠালেন একগুচ্ছ দড়ি ও একটি তরবারি। প্রতাপাদিত্য যদি দড়ি গ্রহণ করেন, তাতেই প্রমাণিত হবে যে তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছেন। এতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানো যাবে। আর যদি তিনি তরবারি গ্রহণ করেন তবে যুদ্ধেই ফায়সালা হবে জয়পরাজয়। আদিত্য বা সূর্যসম তেজে যশোরের বীরকেশরী বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের গর্বোদ্যত জবাবঃ

"ওরে বীর কহ গিয়া তোর মনিবেরে
বেড়ি নিয়া দেউক তার মনিবের পায়ে।"

প্রতাপাদিত্যের যশোমহিমা ধন্য যশোরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছি। বাংলার আর এক বীর সন্তান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচানো তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার নারিকেল বাড়িয়া সে রণাঙ্গন থেকে বেশি দূরে নয়। যুদ্ধাহত মুক্তি কাণ্ডানকে সাহস জোগাতে জীবন্ত ইতিহাস যেন প্রেরণা দিচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে। চতুর্দিকে সগর্জন রণহুংকারে পাক-সৈন্য যেন দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চাষির পোশাকে মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলে পাক-সৈন্যদের। একই সঙ্গে নারী যোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় ঘিরে আছে মুক্তি ও পাকবাহিনীকে। নারী-পুরুষের এমনি সম্মিলিত সশস্ত্র আক্রমণ পাক-বাহিনী হয়তো ইহজীবনে আর দেখেনি। আশপাশের সবাইকে মুক্তিবাহিনী ভেবে পাকিরা দিশেহারা। ভয়ে পাংশু-বিবর্ণ পাকবাহিনী ঝরাপাতার মতো হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেয়। খোদবেখোদ সকলে দুই হাত উঁচিয়ে সারেন্ডার করে। বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করা হয়।

মহিলারা ঝটপট ঘোমটা টেনে মুচকি হেসে মুক্তিদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঘরে ফিরে গেলেন।

মধু কবির মহিমা ধন্য যশোর। রাম-রাবণের যুদ্ধে লংকার মহিলাদের সংগঠিত করেছিলেন মেঘনাদ-পত্নী প্রমিলা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৌশলগত রূপকের ছলে রাবণ প্রসঙ্গ এনেছিলেন। স্বদেশ রক্ষায় লড়ছেন রাবণ। সাগর পাড়ি দিয়ে রাম লংকা অবরোধ করেন। যেমন করে সাগর পাড়ি দিয়ে ইংরেজরা এসে দখল করেছিলো এই বাংলা। মাইকেল স্বদেশের বাঙালিদের জাগানোর জন্য যে-কৌশলের উদ্দীপনা করেন গণমানসে, তারই জীবন্ত রূপ পেলাম আজকের এই রণাঙ্গনে। মধু কবির দেশের রমণীরা জিতে রহো।

"রেখো গো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করোনাকো তব মন কোকনদে।"

রণাঙ্গনে মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। বাংলার মাটিতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে এমন বীর্যবতী বিজয়িনী মা-বোনের সহযোগিতায় যুদ্ধাহত হতাশাগ্রস্ত মনেও বেঁচে থাকার যুদ্ধ করার প্রেরণা পেলাম। এমনি বীর মহিলারা বাংলার প্রতি ঘর আলো করে থাকুন। সোনার বাংলা বীর প্রসবিনী হোক। [রেফারেন্স ঃ বালিয়াডাঙার যুদ্ধ, আজকের কাগজ। [তারিখ মনে নেই (১৯৯৭-৯৮)]।

ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম, বীর প্রতীক

এমবিবিএস ডাক্তার সেতারা বেগম স্ব-মহিমায় ধন্য। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে সম্মানিতা। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান সেতারা। তাঁর বড় ভাই মেজর হায়দারকে কলেজ জীবনে ইউওটিসি (ইউনিভার্সিটি অফিসার ট্রেনিং কোর; পরবর্তীতে বিএনসিসি)-তে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আমার সুযোগ হয়েছিলো। ১নং সেক্টরের গেরিলা প্রশিক্ষণ ও গেরিলা যুদ্ধে তাঁর অবদান শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বিস্ময়ে স্মরণ করবে অনাগত কালের বাংলার যুদ্ধ-ইতিহাস। তাঁর প্রশিক্ষণের মানসপুত্রদের অন্যতম জাহানারা ইমামের পুত্র শহিদ গেরিলা যোদ্ধা রুমি। পাক আর্মির দুর্গ ঢাকার গেরিলা অপারেশনে রুমিদের কীর্তি গেরিলা যুদ্ধজগতের দুর্ধর্ষ অধ্যায়গুলির অনুকরণীয়। তাঁর ছোট ভাই এটিএম সাফদার (জিতু) মুক্তিযুদ্ধের গোপন গোয়েন্দা কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। সেতারার স্বামী লেঃ আবদুর রহমানও একজন মুক্তিযোদ্ধা-ডাক্তার। তিনি লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহর তত্ত্বাবধানে ৩নং সেক্টরের (১৯৭১-এর) অধীনে কাজ করেছেন। ১৯৭২ সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সেতারা ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৬১ সালে কিশোরগঞ্জের সবুজবিদ্যা গার্লস হাই স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট ঢাকার হলিক্রস কলেজ এবং এমবিবিএস ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে। ইন্টার্নশীপ শেষ করে জুন/জুলাই (১৯৭০) মাসে যোগ দেন পাকিস্তান আর্মিতে মেডিকেল কোরে। লেঃ হিসেবে পোস্টিং হয় ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে কুমিল্লা সেনানিবাসে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ-পূর্বকালে ছুটিতে গেলে অসহযোগের দিনগুলিতে আর ফিরে আসেননি চাকরিতে। সরাসরি যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে।

স্কুল জীবনে ছিলেন গার্লস গাইডের প্যাট্রল লিডার। ড্রামা-সঙ্গীত-স্পোর্টস ইত্যাদিতে নিয়মিত অংশ নিতেন। মেডিক্যাল কলেজেও প্রচুর খেলাধুলা করেছেন। অসংখ্যবার. ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

১৯৭১-এর প্রথমে তাঁর বড় ভাই কমান্ডো মেজর হায়দারেরও পোস্টিং হয় কুমিল্লা সেনানিবাসের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ৫ ফেব্রুয়ারি দুই ভাই-বোন ছুটিতে যান বাবা-বাড়ি কিশোরগঞ্জে। নিজের ছুটি একমাস, ভাইয়ের ছুটি দুই সপ্তাহ। ইতোমধ্যে দুর্যোগের ঘনঘটা শুরু।

তাঁর ভাই কমান্ডো মেজর হায়দার ও ক্যাপ্টেন নাসের মিলে ময়মনসিংহে দুটি বড় ব্রিজ ওড়াতেই বুকে দুরু দুরু শুরু হয়। ইতোমধ্যে কুমিল্লা সিএমএইচ থেকে পরপর তিনটি জরুরি টেলিগ্রাম আসে "কাজে যোগ দিন"। সেতারার বাবা চাতুর্যের সঙ্গে জবাব দেন "তিনি অসুস্থ - সি ইজ সিক"।

সপ্তাহ খানেক গঞ্জে কাটে। এরই মধ্যে দেশব্যাপী পাক-আর্মির ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া যায়। একদিন কিশোরগঞ্জেও চলে আসে পাক আর্মি। এর দু'দিন পূর্বেই তিনি সটকে পড়েন বার মাইল দূর মামাবাড়ি হোসেনপুর। লোকমুখে কমান্ডো ভাইয়ের কীর্তিগাথার খবর পেতেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়। তাঁর চমকপ্রদ যুদ্ধ সাফল্য অবিশ্বাস্য মনে হতো।

কিশোরগঞ্জে তাঁর বাপ-ভাইকে ধরিয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ-খবরে পরিবার ও কন্যা রক্ষায় তাঁর বাবা প্রায় তিনমাস বন্দুক হাতে করে চলতেন, রাতেও ঘুমাতেন বন্দুক হাতে। এরই মধ্যে কৌশলে পাকিস্তানিরা চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে দেয়, সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈনিক ও অফিসারগণ ধরা পড়ছেন অথবা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। উদ্বিগ্ন হায়দার বোন-মা-বাপকে রক্ষার উদ্যোগ নেন। জুলাইর শেষ সপ্তাহে তাঁদের উদ্ধারে মুক্তিবাহিনীর সেনারা এলো। পরিবারের সদস্যরা বিসমিল্লাহ বলে বেরিয়ে পড়েন অজানার উদ্দেশে। কিশোরগঞ্জের গোজদিয়া ঘাট থেকে রওয়ানা হয়ে দিন দশেকের নৌযাত্রায় গিয়ে পৌছেন ভারতের মেঘালয়। একবার সিলেটের টেকেরহাটে ছিলেন সপ্তাহখানেক।

এ-খবর মেজর হায়দারের কাছে পৌছুতেই তিনি ট্রাকের ব্যবস্থা এবং এ-যানবাহনেই শিলং গমন করেন। অসুস্থ পিতাকে নিয়ে শিলংয়ে কাটে পাঁচ দিন। গৌহাটির পথে আগস্টের প্রথম সপ্তায় পৌছেন বর্ডার সংলগ্ন পার্বত্য ত্রিপুরার মেলাগড়ে। এবার দু'সপ্তাহ বিশ্রামের পর চূড়ান্ত গন্তব্যের প্রস্তুতি।

স্বাধীন বাংলার যোদ্ধা ও শরণার্থীরা প্রকৃতই তখন বিপন্ন। আর্তমানবতা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাকে ভারতের বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা সরব সমর্থনে এগিয়ে আসেন। দিল্লীর প্রতিক্রিয়ার আগেই কলকাতায় মাতম ওঠে, 'বাঙালি বাঁচাও'। বর্ডার সংলগ্ন পশ্চিম বাংলা, পার্বত্য ত্রিপুরা, আসামের কাছাড়-শিলচড়ের প্রায় প্রতিটি মানুষের দুয়ার জয়বাংলার মানুষের জন্য উন্মুক্ত। কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সে-সব অঞ্চলের মুসলমান। তাঁরা পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। বাংলাদেশের শরণার্থীদের ওপর পাক-অত্যাচারকে তাঁরা ভাবতেন চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় বিশেষ প্রপাগান্ডা। বাংলাদেশের আহত-অসুস্থ নরনারী বিশেষ করে যুদ্ধাহত মুক্তিদের জন্য ভারতের প্রতিটি হাসপাতালের চিকিৎসার সুযোগ অবারিত। বেসামরিক হাসপাতালসমূহে তাদের রোগীকে ফ্লোরে নামিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান করে দিতো হাসপাতালের বেডে। এ-ব্যাপারে ভারতের সাধারণ রোগীরা কোনো প্রকার অসুবিধা করতো না। সে এক স্পর্শকাতর মানবীয় অনুভূতির দৃশ্য। জাত-পাত-ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে ভাষার ঐক্য মানুষকে কেমন আবেগপ্রবণ করে তোলে, এ-দৃশ্য না দেখলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবার, এ-দৃশ্যের কথা ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। জনতার ভিড় ঠেলে পশ্চিমবঙ্গের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। জনতার স্লোগান, 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। মাঝে মধ্যে ভাবতাম, হয়তো বাংলাদেশেরই কোনো শহুরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এমনি ছিলো তখন সেখানকার মানুষের মানবীয় অনুভূতি।

বাঙালির সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দিল্লীকে ভাবিয়ে তোলে। দুই বাংলা না আবার এক হয়ে যায়! বাঙালির আন্দোলন এক পর্যায়ে দিল্লীর জন্য ফাঁসকল হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভাবতে দিল্লী সময় ক্ষেপণ করে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ভারতীয় সিদ্ধান্তকারী গোষ্ঠী।

যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিজস্ব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্ডার সংলগ্ন ভারতের মাটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে বাংলাদেশিদের নিজস্ব জনবলে। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, মুক্তির চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিজস্ব ডাক্তারের তখন যথেষ্ট স্বল্পতা ছিলো।

যদিও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ছিলো প্রকৃতই নাম-কা-ওয়াস্তে, তবুও শত্রুর শেলিং রেঞ্জের আওতায় চিকিৎসা-স্থাপনা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ছিলো ভুল। কৌশলগত দূরদৃষ্টির অভাব অনুভূত হয় প্রতিটি হাসপাতাল স্থাপনার স্থানে। বিদেশের মাটিতে জয়বাংলার বিদ্রোহীদের দাবাতে পাকিস্তান আর্মি শেল ফেলবে না, এমন ধারণা পোষণ করাই ছিলো মস্তবড় ভুল। তাই বর্ডারের অতি সংলগ্ন স্থানের হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হয়।

হাসপাতালের ঔষধ-গজ-ব্যান্ডেজের সহজ সংগ্রহ হলেও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেডিক্যাল জনবল বাড়াতে হয়। দেশত্যাগী-শরণার্থী মা-বোনেরা এ-ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২ নম্বর সেক্টর মুক্তি হাসপাতালে সেতারার যোগদান আগস্টের শেষ সপ্তাহে। বর্ডার সংলগ্ন মেলাগড়ের কাছাকাছি বিশ্রামগড়ে বসে মুক্তি হাসপাতাল। বেড সংখ্যা চারশ'। অন্যান্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের মেডিক্যালের শেষ বর্ষের ছাত্র, বিশেষতঃ কিরণ ও মোর্শেদ উদয়াস্ত ডাক্তারের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সিপাই থেকে সুবেদার পর্যায়ের জনতা মুক্তি-মেডিক্যালে স্বেচ্ছায় যোগ দেন। নিয়মিত ডাক্তারদের মধ্যে লন্ডন প্রত্যাগত ডাঃ মোবিন, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাঃ কিরণ সরকার দেবনাথ, ডাঃ ফারুক মাহমুদ, ডাঃ নাজিমুদ্দিন, ডাঃ মুর্শেদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সেবায় নিবেদিতা ছিলেন এমন ক'জনঃ সাঈদা কামাল টুলু, সুলতানা কামাল লুলু (প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামালের কন্যা), পদ্মা, গীতা কর, ইরা, অনিলা, লক্ষ্মী, শোভা, শেফালি, রঞ্জিতা, অঞ্জলি, যুথিকা, আন্না।

মুক্তি হাসপাতাল হলেও এখানে ভারতীয় আর্মির আহতদের চিকিৎসা করা হতো। ভারতীয় চিকিৎসকগণ মুক্তি হাসপাতালে কাজ করলেও নিয়মিত থাকতেন না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচুর সাহায্য আসতো মুক্তি হাসপাতালে। এসবের বাইরে ঔষধ সংগ্রহে যেতে হতো আগরতলা উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে। সেখানকার ডিসি মিঃ ব্যানার্জি, আগরতলা শিক্ষা বোর্ডের পরিচালক ডাঃ চ্যাটার্জি, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ চক্রবর্তীর

মতন ভারতীয় ডাক্তারদের হৃদয়-ঔদার্যের প্রচুর সাহায্যে ধন্য এই মুক্তি হাসপাতাল। ডাঃ সেতারাও মাঝে মাঝে ভারতীয় হাসপাতালে যেতেন। মুক্তি হাসপাতালের নিজস্ব অপারেশন থিয়েটর ছিলো। আসবাবপত্রের মধ্যে ছিলো প্লাস্টিকের মোড়া, এবং এ-জাতীয় তৈজসপত্র।

একবার ভারতীয় সৈন্যভর্তি এক ট্রাক উল্টে পড়ে রাস্তার পার্শ্বে খাদে। মুক্তি অ্যাম্বুলেন্স এদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়। একবার মুক্তি-সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল রবের হেলিকপ্টারে গুলি লাগে। তিনিও এই হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এখানকার রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগ আসতো মেলিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। ডায়রিয়া-ডিসেন্ট্রিতে ডাঃ সেতারার হাসপাতালে ২ জনের মৃত্যু হয়। অসাধ্য সাধনের মতো ছিলো সেতারার কাজ। যতো পর্যুদস্ত বা আহত রোগীই হোন না কেন, ডাঃ সেতারাদের উদয়াস্ত চিকিৎসা ও সেবায় তাঁরা চাঙা হয়ে ওঠতেন। খুব কম যোদ্ধাই মুক্তি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকটা সাধারণ মানের ঘরে। মুলি বাঁশের চাটাই, শনের চালা, এবং কালে ভদ্রে কিছু তাঁবু। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে নিতান্ত মানবিক কারণে আরাম-বিবর্জিত পরিবেশে বাংলার অনেক তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। সামরিক নিয়ম-শৃংখলায় শিফট পদ্ধতিতে চব্বিশ ঘন্টা তাঁরা রোগীর সেবা করতেন। তাঁদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে যুদ্ধাহত মুক্তিদের মনোবল। আলম ও জসিম দুই অকুতোভয় যুদ্ধাহত মুক্তি। ছ'সাতবার গুলিতে আহত হয়েও যুদ্ধ নেশা ছাড়েনি আলম। শত্রুর গুলি আলমের মাথায় লাগে। তবু তাঁর যুদ্ধ-উন্মাদনা কমে না। অনেক ডাক্তার-নার্স নিজেদের রক্তে বাঁচিয়েছেন আহত অনেক যোদ্ধাকে। যুদ্ধাহত মুক্তি সানাউল্লাহর রক্তের স্বল্পতা পূরণ করেন ডাঃ ফারুক নিজের রক্তে।

সেবক-সেবিকার সার্বক্ষণিক আর্ত-মানবতার প্রাণপণ সেবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক গৌরবময় অংশ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের সেবাকার্যক্রম সে-এক ভিন্ন ব্যাপার। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙা রাখতে চিকিৎসা সেবায় যে অবদান রেখেছেন ডাঃ সেতারা, আসমানের ধ্রুবতারার মতোই তাঁর সে-সময়কার সেবায় সুস্থ রোগীরা তাঁকে স্মরণ রাখবেন অনাগত কাল। তাই তো বিজয় লগ্নে মুক্তি ক্যাম্পে পাক-আর্মির ত্রাস গেরিলা যোদ্ধা মেজর হায়দার-এর জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয় "ডাক্তার সেতারা দীর্ঘজীবী হও।" ভারতীয় আর্মির ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এসে খোঁজ নেন, "কোথায় সেই সাহসিনী মহিলা- হোয়ার ইজ দ্যাট ব্রেভ লেডি"। সর্বসমক্ষে বিদেশি ব্রিগেডিয়ারের সবেধন নীলমণি মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র মহিলা ডাক্তারের ভূয়সী প্রশংসা সবাইকে বিমোহিত করে।

সেনাবাহিনীর সকল সৈনিকই প্রত্যক্ষ যোদ্ধা নন। প্রত্যেকেই যুদ্ধের প্রাথমিক ড্রিল, অস্ত্রচালনা ও রণচাতুর্যের দক্ষতার কৌশলের প্রশিক্ষণ নেন। যেমনি নিয়েছেন ডাক্তার সেতারা বেগম। পদাতিক, আর্টিলারি, সাপ্লাই, অর্ডন্যান্স, সিগন্যালস, মেডিক্যাল, নার্স,

ক্লার্ক ধরনের কতো ব্রাঞ্চই না আছে সেনাবাহিনীতে। সবাইকে তো আর সম্মুখ সমরে সচরাচর যেতে হয় না। প্রচলিত যুদ্ধ নিয়মে একজন সম্মুখ সমরের যোদ্ধার পেছনে পাঁচজন থাকেন তাঁর যোগানদার। পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রায় ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিলারি, সিগন্যালস, এয়ার সাপোর্ট থাকে। তাদের খাদ্য-বস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্রান্সপোর্ট, চিকিৎসায় থাকে অন্যান্য বাহিনী। তাই পদাতিক বাহিনীকে বলে 'কুইন অব ব্যাটল'। প্রায় দেশেই সাহসী অফিসার সৈনিকেরই প্রথম চয়েস পদাতিক বাহিনী। তবে তিনি যে-ব্রাঞ্চেরই হোন, যে-কোনো পদে তিনি পদোন্নতি পেতে পারেন। সম্মান-সাহস-গৌরবের শৌর্যে মৃত্যু পরোয়ানার ফ্রন্টলাইন সৈনিকের চয়েস ইনফেন্ট্রি বা পদাতিক বাহিনী।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস কোথায় ছিলো মুক্তিবাহিনীর প্রিয় পরিজন? সে এক অকথিত অধ্যায়। ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর সবাই ছিলেন এক ব্রাঞ্চের–পদাতিক বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক, পরবর্তীকালে তিনি যে-ব্রাঞ্চেরই হোন না কেন, আত্মত্যাগের কারণে তিনি সকলের সম্মানের পাত্র, দেশের সাহসী যোদ্ধা, জাতির গর্ব ও অহংকার। নিজেও একদিন ফ্রন্টলাইনে শত্রুর পাউন্ডার শেলে আহত হয়ে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন ছিলাম। বেঙ্গল, ইপিআর, গেরিলা পদাতিকরা আমাকে মৃত জেনেও আমার লাশের পাশে প্রহরায় ছিলেন। আহত যোদ্ধা-অফিসারটি গ্রাম-বাংলার চাষি মা-বোনদের মৃত্যুপণ দৃঢ়তায় এ-বাড়ি সে-বাড়ি, এ-গ্রাম সে-গ্রাম করে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের বর্ডারে পৌঁছেন চিকিৎসার জন্য। পুরুষ-শূন্য গ্রাম। কে বইবেন জানাজার খাটসম লাশের স্ট্রেচার? যশোর কলারোয়া সীমান্তের হটাগঞ্জ থেকে ভাদিয়ালি বর্ডার পর্যন্ত সে-অসাধ্য কাজটি করেছেন বাংলার মা-বোন। আমি তখন সংজ্ঞাহীন, উত্থান-শক্তি রহিত। এ-সব দু'চারজন মা-বোনের হাহাকারের আর্তি মাত্র। আমার লাশের স্ট্রেচার যে-বাড়িতে গেছে, সেখানেই পড়েছে হাহাকারের ক্রন্দন-রোল। এ-যেন প্রিয়জন হারানোর মাতম। সে-সব নাম না-জানা মা-বোনদের উদ্দেশে নিবেদন করি হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সর্বদেশে সর্বকালে যুদ্ধজয়ের সাফল্যের নিদর্শন বিজিত রাজ্যের মাটিতে বিজয়ী সৈন্যের গর্বভর উল্লসিত পদার্পণ। সে দুরূহ অসাধ্যটি করেন পদাতিক বাহিনী। আকাশ কিংবা সাগর থেকে যতো গোলাই ফেলা হোক, জমিনে পা রাখতে না পারলে বিজয় একটি দুরাশা মাত্র। মুক্তিবাহিনী বলতে আজো মানুষ বোঝেন পদাতিক বাহিনীকে। নৌ-কমাণ্ডো ও বিমানবাহিনী এসেছে পরে। কারো সাফল্যকেই ছোট করার উপায় নেই। তবে প্রাথমিক বিপর্যয় ঠেকাতে, সংহত হতে অসীম আত্মপ্রত্যয়ে লড়েছে পদাতিক বাহিনী। নিজেদের সম্মান অর্জনের গৌরব তাঁরা ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁদের সমর কৌশল ও আত্মাহুতিরূপ যুদ্ধ সাফল্যে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে বলি, তাঁদের সে-সাফল্যে অনেকে বেহুদা স্পর্শকাতর পরশ্রীকাতরতায় ভুগছেন। এ যেন না পারি বলতে, না পারি সইতে।

মুক্তিযুদ্ধে স্বল্পসময়ের অসাধ্যসাধনের "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"-এর মতো অমর অবদান রেখেছে নৌ-কমান্ডো। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য গঠিত নৌ-কমান্ডোতে মহিলা ছিলো না, নৌ-কমান্ডোদের বিপদে-আপদে মহিলাদের অবদান ছিলো উল্লেখ করার মতো। বিমান বাহিনীতেও মহিলা ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাংলার মাটিতে প্রথম বিমান হামলা চালায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের পদাতিক বাহিনীতে মহিলাদের উপস্থিতি একেবারে কম নয়। তাঁরা সংখ্যায় যাই হোন, সম্মুখ সমরে লড়েছেন, শহিদ হয়েছেন। তেমনি এক কালজয়ী শহিদ ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনীর কদবানু বিবি। ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক সত্যকে মানতেই হবে।

আমার আজন্ম লালিত স্বপ্ন দেখে যেতে পারলাম–মহিলা ক্যাডেট কলেজ, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মহিলা অফিসার। অতীতে এদেশের মহিলারা যা পারেননি, বা সুযোগ পাননি, বর্তমানে সে সুযোগ নিন। আশা করা যায়, মহিলারা অতীতের ব্যর্থতা বর্তমানের সাফল্যে পুষিয়ে নেবেন।

দেশ স্বাধীনের পর, মুক্তিযোদ্ধা মহিলাদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ। এমনিভাবে বিক্ষুব্ধ নন পদাতিক বাহিনীর যোদ্ধাগণ। সেনাবাহিনীতে বড়-ছোট র‍্যাংক-স্ট্রাকচার আছে। রাজনীতিতে নেই। সেখানে সবাই বড়, কেউ ছোট নন। তাঁরা মনে করেন, তাঁরাই দেশ জাগিয়েছেন। জনতাকে সংগঠিত করেছেন। যোদ্ধাদের জনশক্তির যোগান দিয়েছেন। তাঁদের কথায় কোনোটাই মিথ্যা নয়। যুদ্ধ ময়দানের নিরাপদ দূরত্বে বসে অনেক কিছুই করা সম্ভব। কিন্তু "মৃত্যুর দুয়ারে পশি অমৃত যদি না পাই খুঁজি"র মতো সৈনিক বেদনার দুঃখ তাঁরা বুঝতে চাননি।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ সিএমএইচ গড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ধন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খ্যাত মেজর খুরশিদ ও ক্যাপ্টেন সেতারাদের বিশেষ অবদান আছে। তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবদানও প্রশংসার সঙ্গে স্মরণীয়। মেলাগড় হাসপাতালের পাশেই ভারতীয় পরিবার থেকে ভাড়া করা এক মাটির ঘরে থাকতেন সেতারার মা-বাবা। স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে তাঁরা প্লাস্টিক বিছিয়ে বাস করতেন। ডিসেম্বরের শেষদিকে সেতারার ট্রান্সফার হয় কলকাতায়। সাধ্যসাধনা করেও তিনি পিতামাতাকে কলকাতা নিতে পারেননি। অন্যান্য শরণার্থীদের মতোই এঁরাও দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেন। একই রণাঙ্গণে পাশাপাশি থেকেও কদাচিত ভাই মেজর হায়দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেতারার। যুদ্ধ-ব্যস্ততায় হায়দার তাঁর বাবা-মার সঙ্গে সাক্ষাতের তেমন সময় পেতেন না। মেজর হায়দার তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রীকে ফেলে যান কুমিল্লা সেনানিবাসে। দুর্ভাগ্য নতুন বউয়ের। তাঁর স্থান হলো কুমিল্লা সেনানিবাসের ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলে।

স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় এলেন সেতারা। উঠলেন ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে, ভাই মেজর হায়দারের অফিসে। দু'তিন দিনের মাথায় ছুটলেন ফেলে আসা বিশ্রামগড় হাসপাতালে। জানুয়ারি ১৯৭২ এর মাঝে হাসপাতাল গুটিয়ে আনেন বাংলাদেশে।

গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল ঃ ধ্বংসের মাঝে নবীন সৃজন তাথৈ তাথৈ নাচে। ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডাঃ মেজর খুরশিদ ও ডাঃ ক্যাপ্টেন সেতারাদের দুর্দিনের বিশেষ অভিজ্ঞতার ফসল সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীদের সাধনার ধন সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল। তাঁদের গণধর্মী সেবা কার্যক্রমে এ-দেশ গর্বিত।

ঢাকা সি এম এইচে সেতারা ঃ স্বাধীন দেশের ঢাকা সিএমএইচে সেতারা বেগমকে দেখেছি ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে। তখন সিএমএইচের পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নে উদয়াস্ত কাজ করছেন যুদ্ধখ্যাত কর্নেল খুরশিদ। খুরশিদ ও সেতারাদের নিয়ে ব্রিটিশ আদলে গড়া বাংলাদেশ আর্মি প্রশাসন বিপাকে পড়ে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়া রোগী খুরশিদ-সেতারাদের দ্বারস্থ হন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সেতারার মুখে কোনোদিন হাসি দেখিনি। পাকিস্তান প্রত্যাগত বাংলাদেশি আর্মি অফিসারগণ সেতারাদের কলকাতাইয়া হাজি বলে উপহাস করতেন। দূরদৃষ্টিতে সম্ভবতঃ তখনই তিনি দেখেছিলেন অশনি সংকেতের ঝলকানি। ষড়যন্ত্রের প্যাঁচকলের কলকাঠির নড়াচড়া বুঝতে পেরেই হয়তো তিনি আর্মি ছেড়েছেন। ইতিহাসের নির্মম সত্য, বিদ্রোহীরা বেঁচে থাকে না। পরবর্তী সিপাই-জনতা-সেনা বিপ্লবের নামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড স্বাধীন দেশের ইতিহাসের এক কলংক-তিলক। যতো বিলম্বেই হোক, ইতিহাস কইবে কথা নীরবে-নিশ্চুপে।

ফ্রন্টলাইনে শত্রুর ধরাছোঁয়ার শেলের পরিসীমায় তিনি যোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল চালিয়েছেন। তাঁর আগমনের পূর্বে হাসপাতালের ছিলো দৈন্যদশা। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে ফিরে আসে হাসপাতালের শৃংখলা। ওসমানীর মতো খুঁতধরা ঝানু সেনানায়কও সেতারার প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। একমাত্র মহিলা, ডাক্তারের উর্ধ্বে ওঠে নিজ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় তিনি বীরত্ব সূচক প্রতীকে ভূষিতা। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর নাগাদ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন।

দুঃখ হয় সেতারার মতো নিবেদিতা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। জীবন বাজি রেখে লড়েছেন দেশের জন্য, উজাড় করে বিলিয়েছেন মানবতার সেবার জন্য, স্বাধীন দেশে শ্রম দিয়েছেন সামরিক হাসপাতালকে পুনর্গঠনের জন্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে তিষ্ঠাতে পারেননি কোন্ অজ্ঞাত কারণে, কেবল জানেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেতারা বেগম, বীর প্রতীক।

রেফারেন্স

১. সাক্ষাৎকার ও সহযোগিতায় ঃ গেরিলা যোদ্ধা মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূইয়া।
২. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা - সম্পাদনাঃ ফরিদা আখতার।

তারামন বিবি, বীরপ্রতীক

আকাশের অগণিত তারার মাঝেও কিছু কিছু স্থির মিটমিটে তারা থাকে, যেগুলো সর্বক্ষণ জ্বলজ্বল করে। তাদেরই একটি ধ্রুব তারা। দুর্দিনে অথৈ সাগরে, মরুভূমিতে, বিজন প্রান্তরে মানুষ এই তারাকে দিগদর্শনের কাজে লাগায়। একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য হাজারো জনযোদ্ধার মাঝে তেমনি জ্বলজ্বলে একটি নাম মোসাম্মৎ তারামন বিবি, বীর প্রতীক। একটি অবিস্মরণীয় নাম তারামন। রাতের আকাশের অগণিত তারাদের মতো মুক্তিযুদ্ধ খ্যাত তারাসম একটি অমর নাম তারাভানু ওরফে তারামন বিবি। ১১ নম্বর সেক্টরের বীর যোদ্ধা কন্যা তারামন। এ-জাতির সৌভাগ্য যে, অবশেষে মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি'র স্বীকৃতি মিলেছে। তিনি এ জাতির গর্ব ও অহংকার। যুদ্ধ-স্বীকৃতির সাফল্যে তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিতা।

তারামনের নিবাস গ্রাম-শংকর মাধবপাশা, ইউনিয়ন-কোদালকাটি, থানা-চৌমারি, জেলা-কুড়িগ্রাম। তাঁর মা কুলসুমবিবি ও বাবার নাম আবদুস সোবহান। মাতাপিতার ৬ পুত্র ও ৬ কন্যার মধ্যে একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা তারামন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শৈশবে তিনি পিতাকে হারান। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য আর্বেশি'র চিরন্তন বাংলার দিনমজুর পরিবারে তাঁর জন্ম। ভিক্ষার অন্নে বেড়ে ওঠে তারা। সামান্যতে বেড়ে ওঠার প্রতিবেশির ক্ষেতে-খামারে, কিংবা বাড়িতে ঝি-কামলার কাজে গতর খাটায়। এভাবেই বাঁচার অবলম্বন বেছে নেয় তারামনদের পরিবার। সম্পত্তিশালী পরিবারের ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে নেয় আলু-ধান-কচুমুখী ধরনের বিভিন্ন খাবার-উপযোগী ফসলাদি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ-চিত্র নতুন কিছু নয়। অনেক হতদরিদ্র-দিনমজুর বিল-ঝিলে কুড়ানো শাপলা-শালুকের ওপরও বেঁচে থাকে।

বাংলার আকাশে যখন দুর্দিনের ঘনঘটা, নিজগ্রাম ছেড়ে তারামনেরা তখন আশ্রয় নেয় পাশের গ্রামের চাচা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আজিজ মাস্টারের বাড়ি। এর পাশেই দশঘেরা গ্রামে ২য় মুক্তিফৌজ (এম.এফ.) কোম্পানি ক্যাম্প। এর চার্জে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার মুহিব।

মুক্তিযুদ্ধে বিদ্রোহ-সূচনার দ্বিতীয় অগ্রসেনানী তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গলের রেজিমেন্টগুলি। সবগুলি রেজিমেন্ট একইসঙ্গে বিদ্রোহে অংশ নিতে পারেনি। সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের সিদ্ধান্তহীনতা ছিলো এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। অফিসারদের এই দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুষিয়ে নেন জেসিও, এনসিও এবং সাধারণ সৈনিকেরা। মুহিব তেমনি একজন এনসিও।

দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে তারামন। দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে পেটের জ্বালা মেটাতে অহর্নিশ ব্যস্ত থাকতে হতো কাজের ধান্ধায়, বিধায় লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখেননি কখনো। প্রকৃতির উদারতার মধ্যে বড় হওয়া চৌদ্দ বছরের সরলা বালিকার বিয়ে হয় কৈশোরের

খেলাঘরে। বর্ষীয়ান স্বামীর নাম মিসির আলি। তিনমাসের মাথায় বিদায় হয়ে যায় স্বামীর সংসার। ভিখারিণীর মেয়ে আবার মায়ের ঘরে।

জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সংসারে ঠেলায় পড়ে দায়ে ঠেকে অনেককিছু শিখেছেন তারামন। যার কিছু নেই, হারাবারও কিছু নেই তার। অগণিত সর্বহারা মুক্তিযোদ্ধার মাঝে এমনি এক নাম বীরকন্যা তারামন। তারামনের চিন্তা করার মাত্র একটি বিষয়ই ছিলো। তিনি মেয়ে মানুষ, ইজ্জতের ভয় নিয়েই তাঁর যতো ভাবনা। সে-ব্যাপারে যতোসব নিরাপত্তা, সবই দিয়েছেলেন ধর্মবাপ হাবিলদার মুহিব—অপর এক বাঙালি বীর মুক্তিযোদ্ধা।

তারামনের ছিলো অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহস। কেউ কিছু বলার আগেই অনুমান করে বলার ঢঙ দেখেই বিষয়টা বুঝে নিতে পারতেন তারামন। মানুষের সুখে-দুঃখে সহযোগিতার হাত বাড়াতেন তারামন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকতার সঙ্গে অবতীর্ণ হতেন আপোসহীন সংগ্রামে। প্রকৃতির হাতে মানুষ হওয়ার কারণে যেমন সাহস ছিলো তাঁর, তেমনি দুরন্তপনা নিয়ে হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তারামনের বাড়ির পাশেই ছিলো রাজিবপুর মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। এখানেই, তাঁর বাপ-ভাই-স্বামীর পরিচিত পরিবেশে তারামনের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ হয়। ২ নম্বর মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানির চার্জে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার মুহিব। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যেতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধারা যেমন ভারতে প্রশিক্ষণ নিতো তেমনি হাজারো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে উঠেছিলো দেশের অভ্যন্তরে। এসব ক্যাম্প থেকে দেশের অভ্যন্তরে জরুরি গেরিলা যোগান দেওয়া হতো। নদীর তীরে উদার হাওয়ায় উন্মুক্ত পরিবেশে প্রশিক্ষণগ্রহণকারিণী তেমনি একজন গেরিলা-মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, বীর প্রতীক।

হাবিলদার মুহিব, ২ নম্বর মুক্তিফৌজ কোম্পানির সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধ করছেন। সঙ্গী যোদ্ধাদের রান্নাবান্নার কাজে সহযোগিতার জন্য যোদ্ধা-মেজাজের একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে খুঁজছিলেন মুহিব। অবশেষে পাওয়া গেলো তারামনকে। কন্যা স্বীকৃতিতে গ্রহণ করতে হলো তাকে। তারামন ঘরের কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধবিদ্যা শিখে নেন ধর্মপিতার নিকট থেকে। মুহিব নিজেও নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন তারামনকে। এভাবেই গড়ে উঠেছেন পরবর্তীকালের বীর মুক্তিযোদ্ধা তারাভানু ওরফে তারামন, বীরপ্রতীক।

তারামনের প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বড়ই অদ্ভুত। তিনদিকে নদীঘেরা মুক্তি ক্যাম্পে গানবোটের সাহায্যে হামলা করেছে পাকবাহিনী। মুক্তিরা যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর কারণে খোঁড়া হয় বাংকার। শত্রু গোলার নিশানা থেকে বেঁচে থাকতে বার বার বদলাতে হয় অবস্থান। আক্রমণের তোড়ে কেয়ামতের মতো অবস্থা যেন। সেদিন প্রাণ যায় যায় অবস্থা তারামনের। তবে মজার ঘটনা ছিলো, খাকি পোশাকের শত্রুকে গুলি ছোঁড়ে লুঙ্গি পরা মুক্তি সেনা। বড়ই চমকপ্রদ ছিলো সে-দৃশ্য। এ-ছাড়া ছিলো বাংকারের ওপর কলাপাতা দিয়ে ছদ্মবেশ দেওয়া, ইত্যাদি। ঐ যুদ্ধে মুক্তি [illegible]

হয়েছে। তারামনও বেঁচে গেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতে অতি ভাগ্যগুণে। পাশের বাংকারে শত্রুগোলা পড়ে। অলৌকিকভাবে রক্ষা পান তারামন।

মুক্তিদের নৌকা ভেবে ভুলে সাধারণ যাত্রীবাহী নৌকায় বোমা ফেলে পাক জঙ্গি বিমান। নৌকাডুবে বেঘোরে প্রাণ দেয় সাধারণ মানুষ। শিশু, মহিলা বৃদ্ধ ও চলাচলে অক্ষম এমন অগণিত জীবনের বিনাশ ঘটে সেদিন। অবশেষে মুক্তিবাহিনীর কৌশল ও শৌর্যের কাছে নতি স্বীকার করে পাকবাহিনী। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে পাকিদের আর দেখা পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধে জয়পরাজয় আছেই। বাইনোকুলার হাতে ক্রলিং করা অবস্থায় কমান্ডার তখন ট্রেঞ্চের বাইরে। চারিদিকে শুনশান নীরবতা। কোনপক্ষের কি চাল বোঝা দায়। দুরবিনে সবই দেখে নিলেন কমান্ডার। লক্ষ্য করলেন পাক গানবোট অচল। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে শত্রুরা। মুক্তিপাগল জনতা ঘেরে পড়ে কে মারা যায়, সম্ভবতঃ তেমন চিন্তায় আহতকেও কাঁধে করে সরিয়ে নিচ্ছে পাকিরা। সেই যুদ্ধদিনটির কথা এখনও মনে জ্বল জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে তারামনের কাছে। রাজিবপুরের এই যুদ্ধদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

তাঁর বহুতর যুদ্ধের অবিস্মরণীয় একটি চরনেওয়াজি যুদ্ধ। একাত্তরের ৭ আগস্ট চরনেওয়াজি হাইস্কুলের সন্নিকটে সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ। সেটি ছিলো পাক-মুক্তি সম্মুখ যুদ্ধ। আগেরদিন বিকাল তিনটা থেকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চলে। পাকবাহিনীর পক্ষে সেদিন রাজাকারও যুদ্ধে অংশ নেয়। তারামন সে-যুদ্ধে শত্রুকে সর্ষে ফুল ও আসমানের তারা দেখানোর মতো করে যুদ্ধের কৌশল দেখায়। শত্রুকে বিভ্রান্ত করে এটা ছিলো তাঁর দৌত্যকার্যের চরম সাফল্য। এই যুদ্ধে পাকপক্ষে নিয়মিত সেনাসহ মোট ১৪জন নিহত হয়। মুকিতরা শহিদ হন ২ জন। অবিস্মরণীয় এই যুদ্ধের পর স্থানীয় জনগণের মনোবলে স্বাধীনতার প্রতি জাগরণ জাগিয়ে তোলে।

এমনি প্রায় ডজনখানিক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন তারামন। সরাসরি যুদ্ধ ছাড়াও তিনি ভিখিরিণীর বেশে শত্রুদের অবস্থান জানার জন্য রেকি করেছেন অসংখ্যবার। তারামনের যুদ্ধসাফল্যে সহযোদ্ধারা বিমোহিত। পালক বাবা গর্বিত। জনগণের সমর্থনপুষ্ট যুদ্ধে তারামনের সাফল্যে জনমনেও বয়ে যায় আনন্দের শিহরণ। এরই নাম মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, বীর প্রতীক।

তারামন গণযুদ্ধের এক আদর্শ যোদ্ধার নাম। যুদ্ধাঞ্চলে, অথবা অন্য যেখানেই যোদ্ধারা থেকেছে, খেয়েছে, রাত্রি যাপন করেছে, একজন মেয়ে যোদ্ধা হিসেবে কোথাও তারামন কোনো ঝামেলার সৃষ্টি করেননি। সর্বত্রই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন এবং নারীঘটিত বিষয়ে থেকেছেন চরম হেফাজতে। ধর্মবাপ মুহিব নিজেও বিষয়টির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।

যুদ্ধ পরবর্তী পারিবারিক জীবনে তারামন ঃ যুদ্ধ শেষে তারামন তাঁর পালক পিতার সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। পরিবারের সবাই ভাবলেন, হয়তো তারামন শহিদ হয়েছেন। ঢাকা থেকে মাকে চিঠি লিখলেন এই যোদ্ধা। মা চিঠি পেয়ে মহাখুশি। তা'হলে তাঁর মেয়ে বেঁচে আছে। এবার অসুস্থ মা তাঁর মেয়েকে দেখতে চাইলেন। পালক পিতা মুহিব মেয়ের পরিধেয় কাপড়চোপর কিনে দিয়ে হাতে তুলে দিলেন নগদ বারোশত টাকা। পাঠালেন মাতৃদর্শনে। তিনি মেয়েকে বলে দিলেন, মাকে দেখেই চলে আসবে। মুহিবের শখ ছিলো তারামনকে পড়ালেখা করানো।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা আর আসতে দিলেন না। সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেন। যোদ্ধা মেয়ের সামাজিক সম্মানের অভাবে দু'বছরের মাথায় ভেঙ্গে যায় দ্বিতীয় বিয়ে। এবার তাঁর তৃতীয় বিয়ে হয় স্থানীয় দিনমজুর-কৃষক আবদুল মজিদের সঙ্গে। তিনি ঘরজামাইর মতো থাকেন স্ত্রীর সংসারে। পরের জমিতে দিনমজুরি করে যা পায় তাতেই কায়ক্লেষে চলে সংসার। এক মেয়ে মাজেদা ও এক ছেলে আবু তাহেরকে নিয়ে হতদরিদ্র তাঁদের সংসার। ১৯৯৫ সাল অবধি, তাঁর পুনঃআবিষ্কৃতির পূর্ব পর্যন্ত, ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থের একটি খড়ের ঘরে বসবাস করেছেন এককালের এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রমণী। নিজের কোনো চাষযোগ্য জমিজিরাত নেই। অর্থাভাবে সন্তানদের পড়াতে পারেননি। যক্ষা রোগে আক্রান্ত তারামন অর্থের কারণে চিকিৎসকের কাছে যাননি। এভাবেই কেটেছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর।

তারামনের আবিষ্কারঃ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের বাংলার সহযোগী অধ্যাপক মিলন কান্তি দে-এঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তারামন বিস্মৃতি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে আলোতে আসেন। এরই সূত্র ধরে বক্সিগঞ্জের এক সাংবাদিক তাঁকে অকুস্থল পর্যবেক্ষণে গিয়ে তারামনের সংবাদ মিডিয়াতে দেন এবং এভাবেই ১৯৯৫ এর স্বাধীনতা দিবস থেকে তারামন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শীর্ষবিন্দুতে আসীন হন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁকে বীর প্রতীকের ভূষণে বরণ করে নেন। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল থেকে তাঁকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও বেগম খালেদা জিয়া নিজে আরো ২৫ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেন। বেগম খালেদা জিয়ার সৌজন্যে তারামন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগপ্রাপ্তা হন। তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অতি সম্প্রতি তারামন বিবির জন্য রাষ্ট্রীয় কল্যাণ তহবিল থেকে তাঁর জন্য 'কল্যাণ ভাতা' মঞ্জুর হয় মাসিক দু'হাজার টাকা। (দৈনিক ভোরের কাগজ, তাং ২৩ জানুয়ারি ২০০৩)। এ-পর্যন্ত পঙ্গু-মুক্তিযোদ্ধা-শহিদ পরিবারই এ-ভাতা পেতেন। মুক্তিযুদ্ধে গণযোদ্ধা তারামনের সাহসী অবদান, সাম্প্রতিক অসুস্থতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের মহতী উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্দীপিত। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-মন্ত্রী রেজওয়ান

আহমদের সৌজন্যে তারামন বিবি এই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ পেলেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো সরকার সর্বজন সমর্থিত একটি কাজের কাজ করলেন।

এদেশের নারী সমাজ, প্রচার মাধ্যম ও বহুতর অন্যান্য সংস্থা বীর প্রতীক তারামনকে সম্মাননা প্রদর্শন করে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। বহু বেসরকারি সংস্থা, সংবাদপত্র, হৃদয়বান ব্যক্তি তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে মুক্তিযোদ্ধা একজন নারীকে গৌরবান্বিত করেছেন।

ব্যক্তি তারামনঃ যোদ্ধা তারামনের চেয়ে ব্যক্তি তারামন অনেক বড়। অর্থ-বিত্তের প্রতি তাঁর মোহ নেই, একজন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পঙ্গু ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অবিরত তাঁর হৃদয় কাঁদে। তিনি চান, দেশের জন্য যাঁরা লড়েছেন, এঁদের অনেকে মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। কিন্তু যাঁরা নিঃসহায় অবস্থায় জীবিত, তাঁদের জন্য জাতির করণীয় অনেক। তারামন এসব মুক্তিদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা কামনা করেন। তারামনের মতো একজন নিরক্ষর মুক্তিযোদ্ধা এমনটি ভাবতে পারেন কেবলমাত্র তাঁর মনের বিশালত্বের কারণে। তারামনকে অনেকে শহরে প্রতিষ্ঠা করে দেবার প্রস্তাব যে রাখেননি, তা নয়। কিন্তু গ্রামীণ জীবনই তাঁর পছন্দ। এটাও তারামনের এক ধরনের স্বাধীন মনের পরিচয়। তারামনের মতো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানিত করতে পেরে জাতি আজ গর্বিত।

বিজয়ের জয়মাল্যঃ বীর পূজার দেশে পূজারিণীর সংখ্যা কম। গেরিলা তারামনের গৌরবের সৌরভে এ-জাতি ধন্য ও বরেণ্য। তোমারি উদ্দেশে জয়গান গাই বীর তারামন। ভবিষ্যতের যোদ্ধা বঙ্গ নারী তাদের পথিকৃতের বীরত্ব-গাথায় গর্বিত হবে। তারাভানুকে মধ্যযুগের সোনাভানের কেচ্ছা-কাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ চমক উপস্থাপন করবেন ভবিষ্যতের চারণ বাউল কবিগণ। তারামনের প্রশিক্ষক হিসেবে গীত হবে তাঁর পালক-পিতা ও গুরু হাবিলদার মুহিবের জয়গান।

মুক্তিযোদ্ধা নারীকে সামনে যে-যতো স্তুতিবাক্যই ছাড়ুন না কেন, আদতে ভয় পান। সে-কারণে তাঁকে ঘরের ঘরণী করতে সবার হৃদকম্প ওঠে। সাহসে বুক বেঁধে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদায় বরণ করে নেন দরিদ্র কৃষক আবদুল মজিদ। তারামন বিবি বাংলার নারীকুলের গৌরব। একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা তারামন আসমানের লক্ষ তারার মতন সকলের নিকট বরিতা হোন, বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে, এটাই হোক সকলের কামনা।

রেফারেন্স :

১. মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী যোদ্ধা/ মেহেরুন্নেসা মেরী
৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে যোদ্ধা নারী / মতিন রায়হান
৪. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৩/১/২০০৩

মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি ওরফে নূরজাহান
(খাসিয়া রমণী)

সমভূমির মানুষের চেয়ে পাহাড়-পর্বত, বন-জংগল, বিল-বাওড়, নদীভাংগা চরাঞ্চলের মানুষ অধিকতর সংগ্রামী, সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পাহাড়ি এলাকার প্রকৃতির সন্তানেরা তুলনামূলকভাবে বেশি সাহসী ও যোদ্ধা জাতি। তাঁরা মোগল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে লড়েছেন। সুদূর অতীত ও নিকট অতীতে এদেশের স্বাধীনতা যোদ্ধারা শহর ও সমতলের সুখের বাস ছেড়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচতে আশ্রয় নিতো পাহাড়-জংগল-বিল বাওড়ের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে আদিবাসী অঞ্চলে। স্বাধীনতা প্রিয় আদিবাসীরা অনায়াসে স্থান দিতো স্বদেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের। নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে তাঁদের রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতো তারা। দুর্যোগ কাটতেই এই ভাগোড়া ভদ্রলোকেরা অবলীলায় ভুলে যেতো তাদের আশ্রয় দাতাদের। এমনি এক টিপরা খাসিয়া মেয়ে কাঁকন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেয়ে প্রেমের টানে পরে হয় বাঙালি বধূ।

ত্রিপুরার পাহাড়-টিলা-জংগল-অরণ্যের প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা কাঁকন, সিলেটের বিল-বাওড়ের মুসলমান যুবক শাহেদ আলীর প্রেমে হাবুডুবু খায়। খাইস্যা খাসালত ছেড়ে প্রেমের টানে তাঁর ইসলাম কবুল করতে হয়। সুমানগঞ্জের সীমান্ত এলাকা বাংলাবাজারের শাহেদ আলীর সাথে ষোড়শী কাঁকনের প্রেম প্রণয়ের মুধরেণ সমাপেত পরিণয়ে। পাহাড়ি অভ্যাস, ইসলাম ও মুসলমানের ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসন, আচার-আচরণ, চাল-চলনে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়ে নেন কাঁকন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সিলেট জেলার লাগালাগি সীমান্ত। ত্রিপুরা ও সিলেটের দুই সীমান্তই পাহাড়-টিলা, বিল-বাওড়ের অরণ্য ঝিলমিলের মায়াময় সবুজ প্রকৃতির দুরন্ত মেয়ে কাঁকন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এলে তাঁর নাম হয় প্রেম সম্রাজ্ঞী 'নূরজাহান'-এর নামে। তাঁর প্রেম, সংগ্রামী যোদ্ধা জীবন স্মরণ করিয়ে দেয় আর এক ঐতিহাসিক নারীকে। যাঁর স্মরণে বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেন :

"বাংলা থেকে তোমায় আমি দেখতে এলাম জগত আলো নূরজাহান
সন্ধ্যা রাতের অন্ধকার আজ জোনাক পোকায় ছন্দমান।
আজ লাহোরের শহরতলির আবডালে আর আগডালে
লুপ্ত তোমার রূপের বহর জংগলে আর ঝঞ্ঝাটে।" (কবরই নূরজাহান)

বহু সাধ্য সাধনায় পাহাড় ছেড়ে সমতলের জীবনে তিনি নিজকে খাপ খাইয়ে নেন। ফেলে আসা বাপের দেশ ত্রিপুরায় তিনি বেড়াতে যেতেন মাঝে মাঝে। তাঁর যাওয়া-আসা, কাজকর্মের বিচরণ ক্ষেত্র বাংলা-ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকা। আশেপাশের বিওপি (বর্ডার আউটপোস্ট) তাঁর নখদর্পণে। আজ তাঁর চলাচলে কর্মঞ্চল জীবনে লাগলো দুর্যোগের ঘনঘটার যুদ্ধ। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ তাঁর অন্তরে যোদ্ধা খাসিয়া জাতির শৌর্য-বীর্যের স্ফুরণ ঘটায়।

যেমনি করে মরুচারী আরব বেদুইন জীবনে ইসলাম এনেছিল ঐশ্বর্যের সওগাত, আজ নও-মুসলিম নূরজাহানের জীবনেও এলো মহাজাগরণ। প্রথাগত বিদ্যা, ধনের বৈভব ও যুদ্ধ প্রশিক্ষণ তাঁর ছিলো না। যেমন ছিলো না মরুচারী আরব বেদুইনের। প্রকৃতির সন্তানের রক্তে যুদ্ধের নেশা, মনে-প্রাণে ইসলামের সংগামী চেতনা-অন্যায়ের কাছে মাথানত করো না।

পাঞ্জাবি ঘোড়া খোরা পানির কাছে আনলেই হলো। আর্য-বীর্যের শৌর্য বাংলার নদী-নালা-বাওড়ের স্রোতস্বিনীর চুবানিতে শেষ। দিল্লীর মসনদ হিল্লে বাংলার বিদ্রোহীরা চিল্লা-পাল্লা লাগাতো। পাঠান-মোগল সংঘাতের সুযোগ নিতো বাংগাল বিদ্রোহীরা। আপ-কান্ট্রির আর্যবীরদের ডাউন কান্ট্রির বিল-বাওড়-নদী-পাহাড়-জংগলের দুর্গম পরিবেশে গেরিলা কায়দায় প্রলুব্ধ করতো খতরনাক বাংগাল। পাঠান-মোগল পরস্পরে পিঠটান দিলে যুদ্ধের সুযোগ নেয় সুবেহ বাংলার বিদ্রোহী বারভূঁইয়ার দল। মোগল সম্রাট ধেয়ে এলেন বাংলায় বিদ্রোহী শের শাহকে দমনে। বাংগাল গেরিলা মাইরে মেঘনার অথৈ জলে ঘোড়া শুদ্ধ হুমায়নের দল চুবানি খায়। বাংগাল ভিসতি ওয়ালাকে বাপ ডেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। হায়রে বাংগাল মাইরে গেরিলা যুদ্ধ। দুর্দান্ত প্রতাপ মোগল সম্রাটকে ঘোল খাওয়ায় বাংলার ঘোলাজলে। বাংগাল বিদ্রোহীরা মোগলদের বিরুদ্ধে লড়তে ভিড়লেন পাঠান দলে। আপ কান্ট্রির হিরোদের গিরো ছুটাতে ডাউন কান্ট্রির নিম্নাঞ্চলে প্রলোভিত করেন গেরিলা কায়দায়। সিলেট-আসামের নদী-নালা-বিল-বাওড়-পাহাড় জংগলের পথে ভাগলো শীতের শুকনা মৌসুমে পাঠান সমর্থনে বিদ্রোহী বাংগাল। বাংলার বর্ষা-বাদলের ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রকৃতি সম্পর্কে উর্বর মস্তিষ্কের উজবকেরা অজ্ঞ। কাদা-ময়লা-নোংরা পানির মশা-মাছির জংগলের বাঘ-ভালুক-বানর-বুনো মহিষ সম্পর্কে তাঁরা বেখবর। শীত-গ্রীষ্ম গেলো, বর্ষা এলো। ভাটি বা নিচু এলাকায় মোগল বাহিনীকে ঘিরে ফেললো বাংগাল বিদ্রোহীরা। গ্রীষ্মের শুকনো জমিতে তাঁদের আরামের সেনা ছাউনি এবার ভাসে জোয়ার ভাটার অথৈ জলে। ঘোড়ার পেট পর্যন্ত পানি। আমাশা, কলেরা, ডায়রিয়া, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিশাল মোগল বাহিনীতে ধ্বংস নামে। বীরবর মীর জুমলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন ঢাকায়। শখের কামান ঢাকায় প্রদর্শনীর জন্য রেখেই তাঁর জান্নাত বাস হয়। বিদ্রোহী বাংগালের আদত খাসলতের রণকৌশল জানলে গোটাকয় স্তাবকের খোশামোদের স্তুতিবাক্যে ভুলে গিয়ে বাংলার বিদ্রোহের অনলের ফাটকে হাত দিতো না পিন্ডি বাহিনী তাদের পিন্ডিদানে। ঐতিহাসিক সূত্রের চিরাচরিত প্রথায় ১৯৭১ এর বাংগাল বিদ্রোহীরা ভাগে। পাকিস্তানের এককালের জানি দুশমন ভারতের সাহায্য নেয়। ইসলামি জজবার মুসলমানিত্বের পিন্ডি কৌশল ফেল মারে বাঙালি মাইরের কাছে।

এবারও ঐতিহাসিক ভুলের রাস্তা ধরে পিন্ডি বাহিনী নালায়েক বিদ্রোহী বাংগাল ধরতে বিল-বাওড়, নদী, পাহাড়-জংগলের সিলেট সীমান্তে পৌছে। এখানেই পাক-প্রতিরোধে অসীম শৌর্যে রুখে দাড়ান কাঁকন। স্বামীকে বাগে এনে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ কাঁকন একাই বেরুলেন সম্মুখ সমরে।

"তোর ডাকে যদি কেউ না আসে তুই একলা চলোরে" অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। তিনি রাজনীতি-অর্থনীতি-দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ, ইসলাম

ও অনৈসলামিক বৈষম্যের পাক-ভারত শত্রুতার মন্ত্রতন্ত্র বুঝেন না। পাক-প্রচারণার ইসলাম বিপন্নের স্লোগানের মুখে তিনি দেখেন পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) মানুষ বিপন্ন। পাক নরপশুদের বর্বর লালশার শিকার বাংলার মানুষ। দুই আর্মি মুক্তিবাহিনী ও পাকআর্মির মধ্যে যুদ্ধ। এতে দোষের কিছু নাই। অতীতেও অনেক দেশে এমন কতো যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু নিরীহ মা-বোনের ইজ্জত লুটার ধর্ষণ, হত্যা, বিকলাংগ করার এমন নারকীয় দৃশ্যের নজির বিরল। তাঁর বিচারের স্থির সিদ্ধান্ত, বাংগালির শত্রু পাকসেনা। তাদের রুখতেই হবে। তাদের দর্প খর্ব করতে সামরিক আধিপত্য ধূলায় মিশাতে না পারলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী....। নূরজাহানের নূরানী চোখ বাংগালি শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, নর-নারীর ওপর অত্যাচার দর্শনে অন্তরে জ্বলে দাউ দাউ জ্বলে প্রতিশোধ স্পৃহা। ভেতো বাঙালি মহিলার শিল-নোড়া-বাটনা বাটার হাত যোদ্ধার হাতে পরিণত হয়। হাত গুটিয়ে বেঘোরে ইজ্জত হারিয়ে মরার চেয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে আত্মাহুতির দীক্ষা মন্ত্রে ফুঁসে উঠেন নূরজাহান। বীর মরে একবার। ভয়ে ভীতা মরে বার বার। তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর সম্মুখ সমরের পথে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরংগের মতো ধাবিত হলেন।

তাঁর অর্ধযুগের সুখের দাম্পত্য জীবনের মনোমালিন্যকে তুচ্ছজ্ঞানে সমরে অমর বাঘিনী সামনে এগুলেন পাক শিকারের সন্ধানে। সংগঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংবাদের বার্তা পৌছে বাঙালির ঘরে ঘরে। সীমান্তের বিওপিগুলিতে এককালে মহাদাম্ভিক অপরাজেয় এমন দাপট দেখাচ্ছিলো। কিন্তু ভয়ে ভীত পাঞ্জাবি দুলদুলের নাকে-মুখে তখন ফেনা বেরুচ্ছে। তরক্কিয়ে পাকিস্তান ছেড়ে তাদের আপনা জান বাঁচানো দশা। পররাজ্য ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণের খায়েস ছেড়ে স্থানীয় মুক্তি ফৌজের (এম এফ) শহিদ কোম্পানিতে যোগ দিলেন নূরজাহান। যোদ্ধা খাসিয়া রক্তের টগবগে জোয়ারে প্রতিশোধের আগুন।

প্রাথমিক ব্যাটেল ইনাকুলেশন (বাস্তব যুদ্ধ প্রস্তুতিতে) সম্মুখ সমরে রত যোদ্ধাদের সমরাস্ত্র যুদ্ধের গোলাবারুদ বয়ে নিতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, ঔষধ, ও পথ্যের যোগান দিতেন। আহতদের সেবায় উদয়াস্ত কাজ করতেন। তাঁর যুদ্ধংদেহী মনোবলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ কমান্ডারগণ। তাঁকে সযত্নে রাইফেল, স্টেন, পিস্তল চালনা, খোলা, জোড়া-ছোঁড়ার, প্রশিক্ষণ দেন। তিনি যুদ্ধ করেন ৫নং সেক্টরে মেজর মীর শওকত আলীর (পরবর্তী লেঃ জেনারেল ও বীর উত্তম) এর অধীনে। তিনি সরাসরি যোগাযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ খানের সাথে। অত্যন্ত স্থির প্রজ্ঞার অকুতোভয় যোদ্ধা হেলাল (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল ও বীরবিক্রম)।

রক্ষণাত্মক ভাঁড়ার ঘর সামলানোর মতো কাজে সময় কাটে নূরজাহানের ১৯৭১-এর আগস্ট পর্যন্ত। দূতীর কাজে খবর সংগ্রহে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ভিখারিনীর বেশে তিনি পাক শিবিরে যেতেন। ঘুরতেন পাক বি.ও.পি বাংকারের আশেপাশে। পায়ে হেঁটে জায়গা মাপতেন। সবকিছু চোখে দেখতেন, কানে শুনতেন। অমাজনীর নিশাচরী প্রেতাত্মার ছায়ার মতো আঁধারে মিলিয়ে যেতেন নিশিথের রানী। শত্রুর গমনাগমন হালচাল গভীর মনোযোগে অধীর প্রতীক্ষায় অনুসরণ করতেন রাতের পেত্নিসম এই মুক্তি রমণী।

ভিক্ষুনীর চক্ষু নিয়ে জনারণ্যে মিশে পাক দোসর পা-চাটা দো-আঁশলা বাঙালি পাক দাসানুদাসদের ধরা ছোঁয়ার দূরত্বে পৌঁছে তথ্য নিষ্ঠ-অতি সাম্প্রতিক সংবাদ মুক্তিদের পৌঁছে দিতেন। তার সংগৃহীত তথ্যাদির খবরাখবরের তাৎক্ষণিক গুরুত্ব তিনি বুঝেন নাই। তিনি দৌত্যকর্মের ফলশ্রুতির অভাবনীয় সাফল্যে মুক্তিরা তাদের বহুতর যুদ্ধ পরিচালনায় বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। তাঁর সাপে নেউলে মুক্তি দূতীর কল্যাণে বিস্তর নিষ্পাপ সাধারণ মানুষ পাক হামলার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। গোপন কথাটি আর গোপন রইল না। বিধি বাম। হঠাৎ তিনি শত্রুর হাতে সন্দেহবশে ধরা পড়লেন। পাক পাঞ্জাবের আর্যবীররা নূরজাহানের ওপর অসুরের তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুর হাতে ধরা পড়লে কেমনতর শাস্তি হয় সে ব্যাপারে ভাসা ভাসা তথ্যের বাইরে তেমন কিছু বলা হয়নি তাকে। তেমনি শত্রুর শেল-মাইন বিস্ফোরক ও রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় হাত-পা উড়ে মাংসের পচন ধরে দশাটা কোন্ পর্যায়ে যায় তার ব্যাপারে নিতান্ত কমই বলা হয়। আগাম বাস্তবতা-জ্ঞানে সৈনিক মনোবলে ধ্বস নামে। নিজে রণাংগনে শত্রুর পাউন্ডার শেলে আহত না হলে, মরণ জ্বালার তীব্রতা রক্ত মাংসে উপলব্ধি না করলে এ অবান্তর প্রসংগ টানতাম না। বাঙালি মুক্তির দেশ উদ্ধার একমাত্র শপথ আমৃত্যু লড়ে শত্রু খতমের মাতমে দেশ উদ্ধার। জীবন-মৃত্যুর অতশত ভাবলে মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ চলতোনা।

পাকসেনারা বাঙালি আওরতের রস নিংড়ে মেরে ফেললে বড়ই উপকার হতো। বিকলাংগ ঝুটা উচ্ছিষ্টদের বাঁচিয়ে রেখে বিপদ বাড়িয়েছে। অত্যাচারের স্টিম রোলারে তাদের নিখাদ সোনায় পরিণত করেছে। বেটাদের ওপর রাইফেল বাটের চোটপাটের ঠাঁটফাটে তারা অভ্যস্ত। এবার বাঙালি জেনানার ওপর চলে তাদের বেনজির অত্যাচার। তাঁর মুখ থেকে কথা আদায়ের সম্ভাব্য জানা সকল কৌশলের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের পাক চালের "সকলই গরল ভেল"। কাংগালিনী বাঙালিনী মা নূরজাহানের ধৈর্যসহ্যের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে যায়। সকল শারীরিক নির্যাতনেও মুখ খুলে না বাঙাল লেড়কি। এ যে কাট ফাটা রোদে শুকানো কাঠের গুঁড়ি ফাড়তে একদফা কুড়াল চালানো সার। মুখে কুলুপ এঁটেছেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীরা কাফেরজাদি বাঙালি আওরত। পাক-পাঞ্জাবিরা এক তরফা মাইরে ক্লান্ত। ক্রুদ্ধ আক্রোশের মহাতেজে জ্বলে ওঠে পাক কমান্ডার। হারামজাদি কা শরম উতার। দেখে গা ও কেতনা লেচকি ভেচকির বুজুরকি জানতো হো। বুত পুরশতির জাদু টোনার দেশে হাওয়ায় মিলাতাহে মুক্তি। ইয়ে আজব গজবের মুক্তি ব্যাটা হো তো আছলি বাত। লেকিন (কিন্তু) ইয়ে জেনানা। ওনকো জবান জরুর খোলে গা। আছলি দাওয়াই লাগাও।

শৈশবের ছোট গল্প মনে পড়ে। বিরাট বপুর-কুকুর বাঘা দৌড়ায় পুছকে খরগোশের শিকার ধরতে। আজবে শিশুর অবাক হাসি। বড় ছোটর দৌড়ে ছোট্ট খরগোশ পালিয়ে বাঁচে, বিরাট বপুর বাঘা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে হাঁফ ছাড়ে। ছোটমনির অট্টহাসিতে চাচাকে জিগায় হাচা কথা কও দিখি এমনটা কেমনে হয়? চাচা কন ছোট্ট খোকা তুই বড্ডই বোকা। ছোট্ট ব্যাপারটা বুঝসনা। ছোট্টটার মরণ দৌড় প্রাণে বাঁচতে। বড়টার দৌড় শখের শিকার ধরতে। এখানেও একই ছোট বড়র মরণ খেলা। পাকিস্তানিদের ইসলাম

রক্ষার ফাঁকতালে কাফের বধ, কুফরিস্তান বাঙাল মুল্লুকের প্রতিটি কাফেরজাদির গর্ভে লড়াকু আচ্ছা পাকিস্তানি পয়দার জোশ। বাঙালির প্রাণে বাঁচার স্বাধীনতার লড়াই। বিরাট আর্যসেনার সামনে খাটা নাটা লুংগি গামছার বেতরিক্ষ ছন্নতের বাঙালি মুক্তিসেনাদের যেন সিংহের থাবার প্যাঁচে নেংটি ইঁদুর। কথামালার গল্পের মতো মহাশক্তিশালী পাকসেনা বনাম বাঙালি নরনারীর সম্মিলিত গণযুদ্ধ। স্বাধীনতার নামে ইচ্ছা মৃত্যুর খাতায় স্বেচ্ছায় নাম লেখানো মুক্তিনারীর স্বাধীনতা প্রীতির গভীরতা বেতন ভুক পাক সেনার জানা নাই। অদৃষ্টের হাতে আত্মা স্মরণে জয়বাংলার উন্মাদনায় স্বাধীনতার সহমরণ যাত্রী নূরজাহান। বংগভূমে অনেক নারী স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ জজ-পুলিশের সামনে জ্বলন্ত প্রদীপে হাতের আংগুল পুড়িয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর স্বামীর চিতায় উঠতেন হাজারো জনতার জয়ধ্বনির মহাশোরগোলে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে, নারী-স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশের আইন ফেল মেরেছে। জাতপাত ধর্মের বিচার থাক। আজ বাংলার নারী স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতার প্রেমে আত্মাহুতির অগ্নি পরীক্ষায়। জগত আলো নূরজাহানের মতোই বাংলার মুক্তি নারী কাঁকন বিবি ওরফে নূর জাহানের স্বাধীনতা প্রেমের মুক্তি বাহিনী রক্ষার অগ্নিপরীক্ষা।

তোদের বাঁধন যতো শক্ত হবে, আমার শিকল ছেঁড়ার ধকল ততো বাড়বে। পাঞ্জাবির অত্যাচারের সকল গ্যাঞ্জাম ফেল। পাঞ্জাবি দুলাভাইর পণ বাঙালি শালীর ধনুর্ভংগ পণের নাপাক মুখ খোলাবোই। প্রজ্বলিত আগুনের সেঁকে লোহার শিক পুড়িয়ে গনগনে লাল হলে শরীরে সেঁকা দেওয়া। তাঁর শরীরে এমন কোন প্রকাশ্য ও গোপন অংগ নাই যেখানে পাক আর্মিদের হাতের লোহার সেকা পড়ে নাই। তাঁর অত্যাচারের সাথে জানা নিকট অতীতের নিলাচলের তেভাগা চাষি বিদ্রোহের নেত্রী লীলা মিত্রের ওপর পাক পুলিশের অত্যাচারের সাথেই তুলনা চলে।

খোদার কসমে তাঁর খসম (স্বামী) ও মুক্তিবাহিনীর খবর জানতে চেয়ে পাক সাঙ্ঘাতরা তাঁর ওপর অত্যাচারে অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিলেন। 'একা রামে রক্ষা নাই, তাহে সুগ্রীব দোসর' আল শামস বাহিনীর সদস্যরা। হুঁশ-বেহুশে তন্দ্রায়, মা-বাপের নাম ভুলানো যন্ত্রণার মাইরে কখন কি বলেন না বলেন তার ঠিক-ঠিকানা নাই। অনেকে জীবনমৃতটাকে বগলদাবা করে আদর-সোহাগের প্রেমের অভিনয় আসলি মুক্তি পয়গাম পেতে চাইতেন। বোগলা পাক-বিওপির পাঞ্জাবি সীমান্ত রক্ষী (ইপিআর) আব্দুল মজিদ খান অত্যন্ত তাজিমের আজব ভালোবাসার অভিনয়ে তাঁকে বগলদাবা করে তাঁর খসমের খবর নিতে চান। খোদার কসমে তাঁর খসম প্রীতির সন্ধান। পাক ওয়াতনমের (জন্মভূমি) খতম (ধ্বংস) বাঁচাতে তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হয়। এই সেই সিলেট যা এককালে ছিলো ভারতভূমি আসামের অংশ। পাকিস্তানের উষা লগ্নের সিলেট রেফারেন্ডামে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবক মুসলিমলীগের পতাকাতলে লড়ে বিজয়ী হয়। রেফারেন্ডামে জিতে সিলেট হয় পূর্বপাকিস্তানের অংশ। সংগত কারণেই সিলেটিদের পাকিস্তান প্রীতির আদিখ্যেতা বেশি। মুক্তিযুদ্ধে সেনানায়ক আব্দুর রব ও ওসমানীর বাড়িও সিলেট। নগণ্য

সংখ্যার সিলেটিদের পাক প্রীতির প্রচ্ছন্ন প্রদর্শনীতে বিক্ষুব্ধ রব ও ওসমানী। বিক্ষুব্ধ ওসমানীর মুখ ফসকে রণাংগনে বেরিয়ে আসে তিক্ততা। "আমি সিলেটের মানুষ চাইনা, জমি চাই"। মুক্তিযোদ্ধাবাহী নৌকায় সিলেটি মাঝিরা পর্যন্ত নিশ্চুপ নীরবতার নৈশ অভিযানে শব্দ করে, নিজের রানে-গর্দানে মশা মারার নামে সজোরে সশব্দে থাপরা মেরে, কেশে, বৈঠার শব্দ করে আলো জ্বালিয়ে যেন পাক পক্ষকে সতর্কতার সংকেত দিতো। বাওড়ের অথৈ জলাভূমিতে অত্যন্ত গোপনীয়তার কয়েকটি মুক্তি অভিযানের ব্যর্থতায় এসব অনুমান নির্ভর তথ্য বেরিয়ে আসে। বাস্তব সত্যের নিরীক্ষে বলতে হয়, পাকিদের সিলেট প্রীতির নির্ভরতা আংশিক হলেও সত্যে। তাই সিলেটি বাঙালি রমণীকে পাক প্রেমের ফাঁদে ফেলে মুক্তির খবর সংগ্রহের চেষ্টা চালায়।

ভারত পথিক পার্সি কাফেলার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে নূরজাহান যদি প্রেমের ফাঁদে মোগল রাজকুমারকে কুপোকাত করতে পারেন, তাঁর অভিনয় বিনয়ে দোষ কোথায়? পাক পেয়ারের হু হাঁয় গরম শিক-কাবাবের পোড়া গন্ধ কমে। বাতাও তোমহারা খসম পাকিস্তানি হ্যায়! তোম সাচ্চা পাকিস্তানি হো!! আরে আব্দুল মজিদ খান, তুম ওনকো পেয়ারে বিবিকা তরক এতনা পেয়ার করতা হুঁ!!! কারবার দেখে তাজ্জব পাক কমান্ডোরা। শুনিয়ে বাঙালি জেনানা, সাচ বাত বাতাও তোমকো ছোঁড় দেগা। কসম খোদার তোম জানতে পাকিস্তানি হো কি নেই। ইয়ে তোমারা খসম?

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানত স্বামীর নাম নাহি লয় নারী।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হত-চৈতন্য, চিতায় জ্বলা পোড় খাওয়া শিক কাবাবের নূরজাহানের চেহারায় লজ্জা শরমের আবীর খেলে খসমের কসমে। সাতটি দিবা রজনী চলে তাঁর ওপর রিরংসার জিঘাংসার মর্মান্তিক খেলা। হাচা মিছা যাই হোক। চেহারায়ও কিছু হায়া থাকে! মড়া-পোড়ার প্রেম তাঁর ভালো লাগলো না। তিনি ছুটলেন পবিত্র পাক ভূমির রক্ষায়।

মোগল-পাঠান আমলে উজবেকিস্তানের সাহসী শক্তিমান মোটা তাজা যোদ্ধারা দিল্লীর সালতানাতের অধীনে কাজ পেতেন। তাঁদের মাথাটা মোটা, চিকন বুদ্ধিটা ভোতা। তাই বাংলার প্রবাদ 'উজবুক' অর্থে বোকার হদ্দ। পাঞ্জাবি দুলাভাই 'উজবুকের উল্টা বুঝিলি রাম। তারা যেন আবদুল মজিদ খানকে নূরজাহানের পেয়ারে বিবির সম্মান দিলেন। জীবন্মৃত নূরজাহান কখন কি বলেছেন আল্লা মালুম। পুলিশি গুঁতায় অসম্ভব সম্ভব হয়ে *বেরোয় আসামির মুখ থেকে। পরে হাকিমের এজলাশে হয় গোমর ফাঁক। এহ বাহ্য* ভবিষ্যৎ। রাম-রাবনের লংকাকাণ্ডের যুদ্ধে বিভীষণের চক্রান্তে অন্যায় সমরে নিহত হন লংকার সেনাপতি মেঘনাদ। শোকার্ত লংকাবাসীর হুলোধ্বনির শোক বিহ্বলতর স্বামী মেঘানদের সহমরণ চিতায় প্রবেশ করলেন প্রমিলা। সপ্ত দিবা-নিশি লংকাবাসী মেঘনাদ প্রমিলা শোকে কেঁদেছে। বাংলার প্রমিলা নূরজাহানের ওপর সপ্ত দিবানিশি নারকীয় অত্যাচার চলে। তাঁর চামড়ার পোড়া গন্ধে দৌড়ে আসতো রাস্তার কুকুর। বাংলার কুকুরের মুক্তিযোদ্ধা প্রেমের তুলনা মেলেনা। জিহ্বা মেলে প্রিয়জনের ব্যথা কাতর

গোংগানির বোবা কান্নায় পালাতো কুকুরেরা। বাংগালি নারীর ওপর অত্যাচারে পাকর চোখে পানি এলেও হৃদয় গলেনি নরপশু পাক সেনা ও তাদের সো-আঁশলা দোসর দাসানুদাস রাজাকার বাঙালের।

সাত দিন-সাত রাতের অসহনীয় অত্যাচারের দরজা অসীম ধৈর্যের অনমনীয় মনোবলের দৃঢ়তায় পেরোলেন মুক্তি স্থৈর্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি নূরজাহান। সকল পাক জিঘাংসার আড়ালে তাঁর ভাবনা ছিলো মুক্তিফৌজের নিরাপত্তা। তাঁর সামান্য ভুলে না মুক্তিফৌজের ওপর নেমে আসে অত্যাচার। নাজিল হয় কেয়ামতের গজব। জয়বাংলার মাদকতায় সকল অত্যচার তুচ্ছজ্ঞানে হেলায় সয়ে গেলেন মুক্তিমাতা নূরজাহান। বাঙালি নামের কলংক রাজাকার-আলবদর, আল-শামস, পিস কমিটির সদস্যদের বাঙালি নারী ধরে এনে পাক সেনাদের ভেট দেওয়া দেখে তাঁর মনে বাড়ে প্রতিশোধ স্পৃহা। পাকসেনাদের বাঙালি নারীর রস নিংড়ানোর পর মহানন্দে উচ্ছিষ্ট উপভোগ করতো চাটুক বাংগালি পাক দোসর রাজাকার। বাঙালির হাতের প্রাথমিক ঝুটা টুটা মালে খুশি হতো না আর্মি। তারা চাকলাদার বাংগালের চালাকি ধরতে পারলে পা-চাটাদের প্রকাশ্যে রাইফেল বাটের সাথে সবুট লাথি মারতো। যেমন কুকুর তেমন মুগুরের পাক ভক্তির চিরাচরিত উপহার বিরস মুখের সরস হাসিতে নিতো পাক-বাঙাল সাংঘাত। শত অত্যাচারের মাঝে কানটি খোলা রাখতেন মুক্তিদূতী। অচৈতন্য নিথর বাঙালিনীর শোনার মাঝে অনেক গোপন তথ্য বেফাঁস বেরিয়ে আসতো। মুক্তি-নারী সেসব পাক গোপন তথ্য গেঁথে নিতেন মনের মণি কোঠায় মুক্তি যুদ্ধের প্রয়োজনে।

'উজবুক' পাকিরা তাদের না পাক চাল চালালেন পাক খসমের আওরতের ওপর। সিলেটের পাক প্রীতিকে মূলধন করে 'হার কারাবালা কা বাদ ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়' স্লোগানে নূরজাহানকে উদ্দীপিত করতে চাইলো। ফালতু ভুল বুঝাবুঝির জন্য তাঁর ওপর অত্যাচারে লোক দেখানো কুম্ভিরাশ্রুতে মাফি মাংগে পাক আর্মি। বিনয়ের কৃষ্ণ অবতারিণী রাধিকা পাক দুর্বলতার মোক্ষম সুযোগটি কাজে লাগান। মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরির প্রস্তাবটি তিনি লুফে নেন।

পাকিরা তাঁকে পাক আনুগত্যে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর খবর সংগ্রহের কাজে লাগায়। মুক্তির পেয়ার পেতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। কাঁকনের সর্বাংগে তো জীবন্ত আঁকনের পাক অত্যাচারের জীবন্ত দৃশ্য তো আছেই। স্বাধীনতার নামে উৎসর্গীকৃত মুক্তি নারীর কাছে স্বামী প্রেমের খোঁজ ও দেশ প্রেমের নির্যাতনের পাল্লায় স্বদেশের স্বাধীনতা প্রীতির জয়বাংলা প্রেম বিজয়ী হলো। বেঘোর অত্যচারে পাক মুখে উচ্চারিত আব্দুল মজিদ খান *নামটি তিনি বার বার ইনিয়ে বিনিয়ে স্মরণ করেন।* পাক অত্যাচারের মুখে বাঁচার অস্ত্র হিসেবে সাময়িকভাবে খসম হিসেবে মেনে নেন আবদুল মজিদকে। হাত করে নিশপিশ মাঝে রেখে পোস্টাপিসের দু'পাতা চিঠির অভিনয়ের খসম হাতযশের সুখ মিটিয়ে কোথায় গেছে কে জানে? মুক্তি সাহায্যের প্রয়োজনীয় সীমান্তের আখালিয়া ক্যাম্পে খসমের সন্ধানের কসমে পাক খুশি আর ধরে না। পাঞ্জাবি পত্নীর মতো মহা রতনটি পাক বন্ধুরা আব্ধা গোয়েন্দার কাজে লাগায়। বার বার মাথায় আদরের চুল আচড়ানোর কাঁকইর

(চিরুনি) মতো পাক দরবারে কাঁকন বিবির কদর। কাঁকনির কুটচাল মুক্তিবিরোধী গোয়েন্দার কাজে লাগায় মহানন্দে পাক উজবুক। তাদের ধারনা, এ বাঙালিনী কাঙালিনী পাক কর্তাভেজা খসম পূজার কসমে সব করবেন। আহ কি সুন্দর পাক গোয়েন্দার আন্ধা পরিকল্পনা। রক্তে মাংসের মানব মানবীর পাতানো প্রেমের সাথে তারা স্বদেশের স্বাধীনতা প্রেমকে গুলিয়ে গভীরতা বিদেশি ভাড়াটে সৈন্যের মতো তারা আঁচ করতে পারলো না। খাসিয়া মেয়ে কাঁকনের চিকন বুদ্ধির দু'ধার তলোয়ারের গোয়েন্দার কাজ।

এমনি দুটি ঘটনার সাথে সাতক্ষীরা সীমান্তে আমার পরিচয় ঘটে। কাকডাঙা সীমান্ত ঘাঁটির নজদিক মুক্তি বাংকারের কাছে এক অপূর্ব সুন্দরী বোরকা পরা মহিলা এলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি পাক অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় সাশ্রয়ের নিরাপত্তা চান। মুক্তিদের কথা, আমরা আপনাকে বোনের আদরে, মায়ের সম্মানে রাখবো। তবে আপনাকে আমরা তল্লাশি করবো। মহিলার কথা পাক অত্যাচার থেকে বাঁচতে আপনাদের কাছে এলাম। আপনারা দেখছি পাক আর্মির চেয়েও খারাপ। মুক্তি গেরিলা কমান্ডোরা কন, বোন ইহাই আমাদের মুক্তির নিয়ম, যুদ্ধের নিয়ম, কমান্ডোর ক্যাপ্টেনের নির্দেশ। মহিলা দেহ তল্লাশিতে রাজি না হওয়ায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহ তল্লাশি করতে চাইলে পাক আর্মি অবস্থানের দিকে মারেন দৌড়। মুক্তি শমসুর আলী মণ্ডল এই মহিলার দিকে বেলচা ছুঁড়ে মারেন। বেলচার আঘাতে গোয়েন্দা এই রমণী আহত হয়। এমতাবস্থায় তার হাতে রাখা ঘড়ির আকারের ওয়ারলেস থেকে মেয়েটি খবর পাঠাতে শুরু করে। "শেষ রক্ষা হলো না, ধরা পড়েছি।" এবার মুক্তির পিটনিতে তার জীবন-আয়ু শেষ। কিন্তু ইতোমধ্যেই শুরু হলো ক্যাম্পের ওপর পাক আক্রমণের শেল নিক্ষেপণ। ক্যাম্পের মুক্তিরাও জরুরিভাবে পজিশন বদল করে শত্রু-আক্রমণ মোকাবেলায় নেমে পড়ে। গর্ত খুঁড়ে পজিশন বদল করায় পুরো মুক্তি কোম্পানি বেঁচে যায়।

মুক্তিরা অনঢ় ঐক্যে নারী হত্যার এই ঘটনাটি আমার কাছে চেপে যান। কিন্তু পজিশন বদলের কারণ জানতে গিয়ে জেরা শুরু হলে আসল কথা বেরিয়ে আসে। ইতোমধ্যে মুক্তি-অবস্থান বদল করে নতুন পজিশনে যাওয়ার সাতান্ন মিনিটের সময় পরিত্যক্ত মুক্তি-অবস্থানে পাক-আর্টিলারি শেল আক্রমণ শুরু হয়।

সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার অভ্যন্তরে গেরিলা ক্যাম্পে তখন আমি উপস্থিত। তালার তরুণ এমপি এবং লেঃ আলাউদ্দিন তখন আমার সঙ্গী। সে-সময়টা ছিলো আমাদের জন্য সঙ্গিন অবস্থা। একে একে খুন হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি-আশ্রয়দাতারা। গভীর পর্যবেক্ষণে বোঝা গেলো এসব নকশালদের কাজ। এদের নেতৃত্বে আছে তরুণ নকশাল নেতা কামেল বখত। নকশালি দর্প খর্ব করতে না পারলে মুক্তিরা তিষ্ঠাতে পারছে না। বস্তুত, বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তি মেরে অস্ত্র হাতিয়ে নেওয়াই নকশালিদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কোনোটাতেই তাদের আস্থা নেই। তাদের ধারণা, আওয়ামী নেতৃত্বে স্বাধীনতা আসলে দেশে শান্তি আসবে না। তাই শ্রেণীশত্রু খতমের এটাই মোক্ষম সময়। ঠিক সেই সময়টাতেই দুষ্টগ্রহ একাধিক নায়িকার দেখা পেয়েছিলাম।

কামেল বখতের নায়িকার কাছে এক মুক্তি প্রেম নিবেদন করে। "আপনি কি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, নাকি শ্রেণীশত্রু খতমের নামে মুক্তি হত্যাই আপনার উদ্দেশ্য?"

এমন প্রশ্নের উত্তরে বহুতর মানঅভিমান ও সংশয়-বিঘটনের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আসল সত্য– "মানবপ্রেম নয়, সবার ওপরে স্বাধীনতা"। এবার এই নায়িকা কামেল বখতের বাড়ির সঠিক অবস্থান জানিয়ে দিলেন মুক্তিদের কাছে। অতর্কিত মুক্তি-আক্রমণে কামেল বখত শেষ। তাঁর ভাই দিদার বখত মহিলার পোশাকে মাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পাটকেলঘাটার পথে পালিয়ে যান। এই দিদার বখতই পরবর্তীকালে মন্ত্রীপদ অলংকৃত করেন। দুর্দিনে ১৯৭১ এর পথেই তিনি তাঁর প্রভুকে ত্যাগ করেন স্বাধীন বাংলায়। বাঙালি নারীর প্রেম স্বদেশ প্রেমের নিরিখে কেমন নিখাদ সোনা, তারই দুটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো। দুঃখিনী কাঙালিনী কাঁকনবিবির স্বামী পাক-সেনা হলেও, তিনি বাঙালি। কাঁকন বিবির কাছে পাকিস্তান প্রেম ও স্বামী প্রেমের উর্ধ্বে স্থান পেলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রেম।

যতো যতনেই হোক, নূরজাহান পাক জিন্দানখানায় নজরবন্দি। কোথাও যেতে হলে তাকে পাক-বিশ্বাসী সঙ্গী নিয়ে যেতে হয়। সবই বোঝেন তিনি। শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন। একদিন পাকসেনাদের অধিকাংশ গেছেন মুক্তি ধরতে। পেছনে রেখে যাওয়া সৈন্যদের নারীবুদ্ধিতে কুপোকাত করে তিনি পালিয়ে এলেন। এবার ফুঁসে উঠলেন পাকিস্তানিদের দ্বারা পোড়খাওয়া-সেঁকাখাওয়া মুক্তিযোদ্ধা কাঁকনবিবি। এতোদিন দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন, এবার ফলপ্রকাশের অপেক্ষা। একান্ত আস্থার মুক্তি নেতা মুক্তিযোদ্ধা হেলাল মোর্শেদের দরবারে উপস্থিত হলেন কাঁকন। তখন আগস্ট মাস যায় যায়। এবার আলোকিত শৌর্যের পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা নারী একটার পর একটা সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফকিন্নীর বেশে তিনি রেকি করেন সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের জডিয়া বাজার। পাশের 'বড়কাপন' নাম স্থানে মুক্তির এসেম্বলি এলাকা। একাধিক ক্যাম্পের ছড়িয়ে থাকা মুক্তিদের সংহত করার নেতৃত্বে তিনি এখানে জড়ো করেন। আক্রমণের নির্ধারিত রাতের তিনটা নাগাদ ভেলায় করে অস্ত্র-বিস্ফোরক বয়ে তিনি অকুস্থলে পৌছেন। মুক্তিরা তাঁর সংকেতের অপেক্ষায় ছিলো। দু'দলে বিভক্ত মুক্তিরা মাইন-বিস্ফোরকে ব্রিজ উড়িয়ে জডিয়া বা জডিয়ারা ব্রিজ জয়ের সূচনা করেন। আকস্মিকভাবে পাকপ্রতিরক্ষা সেতুপ্রহরার আর্মি ও দু'দলে বিভক্ত মুক্তিবাহিনীতে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। নিশাচরী মুক্তি-নেত্রীর অতর্কিত আক্রমণে পাক পক্ষ আঁধার রাতের গোলক ধাঁধায় সর্ষেফুলের বিভ্রান্তিতে দিশেহারা। আক্রমণের তোড়ে উলকির মতো পালায় পাকসেনা। খাটানাটা মুক্তির কাছে ধরা পড়ে আর্যবীর পাকিদের কয়েকজন। বহুত শরম কি বাত। এদেরকে নিরস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হয় ফকিন্নী কাঁকনবিবির কাছে। এমন শৌর্যের বিজয়ের যশোগাথায় নন্দিত নায়িকার বীরত্বগাথা পূজোয় নূরজাহানের নাম ভেসে বেড়ায় মানুষের মুখে মুখে।

ছোট-বড় বিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এই খাসিয়া রমণী। এসব যুদ্ধের পনেরটিতে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন এবং অসীম সাহসে লড়ে শৌর্যের পরিচয় দেন শত্রুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে এই যোদ্ধা নারী। মহব্বতপুর যুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ, অকুতোভয় ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াইয়ের অবদানের কথা এখনো জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে আছে।

সেদিনের যুদ্ধে তাঁর শৌর্যের পরাকাষ্ঠায় শত্রুপক্ষের তিনজন নিহত এবং বারজন আহত ও বন্দি হয়।

কান্দিরগাঁও যুদ্ধে তিনি শত্রুকে কান্দিয়ে ছাড়েন। এখানে সম্মুখ সমরে আহত ও বন্দি পাকসেনা মা মা বলে কেঁদে পায়ে জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে। বীর হৃদয়ের ঔদার্যে শত্রুকে তিনি প্রাণ ভিক্ষা দেন।

বসরাই টেংরাটিলার যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্ব বসরার গোলাপের মতোই আভা ছড়ায়। কাঁকনবিবির রণচাতুর্যে এখানে ছয়জন পাকসেনা আহত ও ধৃত হয়।

বেটিগাঁও-নূরপুরে তাঁর সম্মুখ সমরের নেতৃত্বে যেন "শুকনো পাতার নুপুর পায়ে কাঁপিছে ঝঞ্ঝা বায়"। তাঁর শৌর্যের জীবন্ত স্বাক্ষর এখানে বিপক্ষের নিহত পাঁচ এবং আহত তিন।

দোয়ারাবাজার যুদ্ধে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এখানে মুক্তিবাহিনীর বহুত পুরুষ কমান্ডার পাক প্রতিআক্রমণের রাধাচক্করে ঘোল খেয়েছেন। কিন্তু বাঘিনীর হাতে সম্মুখযুদ্ধে পাক-পক্ষে নিহত পাঁচ এবং আহত দশজন। টেবলাই যুদ্ধে তিনি পাক রনচাতুর্যকে ধূলিসাৎ করে দেন। তাঁর আক্রমণ-চাতুর্যে পাকবাহিনী বাংকার ছেড়ে কোনো রকমে জীবন নিয়ে পালায় মাত্র। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নিট মুনাফা পাকসেনাদের দশটি লাশ। পূর্ববাজারের যুদ্ধে কাঁকনবিবির চাতুর্যের কাছে এগারোজন পাকসেনা ইহলীলা সংবরণ করে।

সুনামগঞ্জের যুদ্ধে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন কাঁকনবিবি নাম্নী এই নূরজাহান। সুনামগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর করতলগত হয় ৬ ডিসেম্বর। পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে যুদ্ধ চলে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেসব যুদ্ধে এই নারী পুরুষের বেশে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিনারীদের পুনর্বাসনের পালা। কিন্তু কাঁকনের হাতে ওঠে ভিক্ষার ঝুলি। মুক্তিযুদ্ধে যে-হাতে শোভা পেতো রাইফেল, গ্রেনেড বা অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র, দেশ স্বাধীনের পর সেখানে তাঁর হাতের বেমানান দৃশ্য বড়ই করুণ। তাঁর স্বামী শাহেদ নিরুদ্দেশ। যুদ্ধশেষে তিনি বাড়ি ফিরলেন। গ্রাম- জিড়ার, ইউনিয়ন- লক্ষ্মীপুর, থানা-দোয়ারাবাজার, জেলা সুনামগঞ্জ। দুর্ভাগ্য এদেশ ও জাতির। আইনের শাসন ও সামাজিক অনুশাসন দুটো ভিন্ন। আইনের সরকার কিছুই দেয়নি তাঁকে। সমাজও দরাজদিলে গ্রহণ করেনি তাঁকে। পাকবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতাকে গ্রহণ করেনি সমাজ। যোদ্ধা নারীকে পুনর্বাসিত করতে সমাজেরও সংশয়। এরই নাম বিধিলিপি!

১৯৭৯ সালে তিনি ঘর বাঁধেন লক্ষ্মীপুর নিবাসী জহুর আলীর সঙ্গে। দু'জনের শুকনো মাছের ব্যবসা ভালোই চলছিলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সমাজের গঞ্জনার মুখে আট বছরের মাথায় ভাঙ্গে সেই সংসার। আবার দুঃখ-দৈন্য নেমে আসে বীরযোদ্ধা নারী কাঁকনের জীবনে। তবে আশার আলো, এলাকার মুক্তিরা তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে পুনর্বাসিত করে। মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে বড় বোনের আদরে ঘরে তুলে নেন মুক্তিযোদ্ধা-দিনমজুর আবদুল করিম।

"এলাকায় তাঁর পরিচিতি খাসিয়া মুক্তি বেটি।" একটি মাত্র মেয়ে ও মেয়ে জামাই নিয়ে তাঁর সংসার। বড় ভাই তাঁকে ঘরে স্থান দিয়ে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেন। দুর্ভাগ্য মুক্তিযোদ্ধা খাসিয়া রমণীর। বার্ধক্যে আজ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে। সারাদিন ভিক্ষা করে যা খুদ-কুঁড়া পান, কোনোরকমে যাপন করেন মানবেতর জীবন। দৈনিক মুক্তকণ্ঠের সুবাদে আলোতে আসেন কাঁকন। সংগ্রামী নারীদের নিয়ে কাজ করা নারী প্রগতি সংঘ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করে। এক বাঙালি অন্ধ কবি আক্ষেপে লেখেনঃ "ও ভাই আমি মরলে আমার চিতায় দিও মঠ"। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযোদ্ধার বিদায়ী সংবর্ধনা। রাজসিক গার্ড অব অনার দেওয়া হয় মারা গেলে অথবা মুক্তিযোদ্ধার কবরে। তাও যদি রেজিস্টার্ড মুক্তিযোদ্ধা হয়। আয়ুষ্কালে ভিক্ষা, মরলে গার্ড অব অনার! ভিক্ষুনী নূরজাহান তারই জীবন্ত স্বাক্ষী। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী, কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, অথবা সমাজসেবী সংস্থার এদিকে দৃষ্টি পড়লে শেষ জীবনে ক্ষণিকের জন্য শান্তি পেতেন মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন ওরফে নূরজাহান।

জনক রাজা সীতাকে পেয়েছিলেন জমি চাষ করতে গিয়ে লাঙ্গলের ফলায়। রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে মাথায় স্থান দিয়ে এদেশের মানুষ এখনো সিঁথি কাটে সীতার স্মরণে। কাল না হোক, কালে হাচন রাজার দেশের এই বীর মহিলাকে কাঁকন-জ্ঞানে মহাস্মরণে হৃদয়ে স্থান দেবেন। হয়তো একদিন একাত্তরের এই বীর নারীর কবর অনেকে জিয়ারত করবেন। জীবিতকালেও মুক্তিযোদ্ধাদের কদরের প্রয়োজন আছে, শুধু মরণের পরে নয়, একথা জাতি স্মরণে রাখলে অনেকেরই হতে পারতো পরম সুখের মরণ।

বীর যোদ্ধা কাঁকনের মতো অসংখ্য নারী রণাঙ্গনে লড়েছেন। স্বাধীন দেশে আজ তাঁরা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছেন বিস্মৃতির অতলে। নাই বা তাঁরা স্থান পেলেন মিডিয়া বা পত্রিকার শিরোনামে, মানুষের মনে স্থান পেলেই তাঁরা বেঁচে যান। আগের কালে এসব ছিলো না, তাই বলে কি সেকালের বীরেরা স্বীকৃতি পায়নি? মহাভারত, ওডিসি, উইমেন অব ট্রয় এখনো পঠিত। কবে পঠিত হবে এদেশের কাঁকনেরা, এ জাতি জানে না। তাড়াতাড়ি জানাই মঙ্গল।

তবে একটি সত্য কথা এখানে উল্লিখিত হতে পারে। আগামী দিনের গেরিলা যুদ্ধে পঠিত হবে কাঁকনের দেশের ইতিহাস। শক্তিমানের বিরুদ্ধে লড়তে দুর্বলকে অনুপ্রেরণা যোগাবে বাঙালির ইতিহাস। কেচ্ছা-কাহিনীতে জীবন্ত দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে এদেশের যোদ্ধাদের গল্প। সেদিন স্বীকৃতি পাবেন এদেশের সকল যোদ্ধা। এটাই যা সান্ত্বনা।

রেফারেন্সঃ

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে যোদ্ধা নারী - মতিন রায়হান।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা (১ম খণ্ড) - মেহেরুন্নেসা মেরী।

রওশন আরা বেগম

যুগে যুগে মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে নারী। মাতা-ভগ্নী-ভার্যা-প্রেয়সীর প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকায় তারা পুরুষকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাঁদের বন্দনা গেয়েছেন। ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অগণিত প্রেরণাময়ী বঙ্গ-নারীর আশীর্বাদে অভিশিক্ত। বাংলার নারী শিক্ষায় কালজয়ী ভূমিকা রেখেছেন টাঙ্গাইলের রণদাপ্রসাদ সাহা। নারী শিক্ষার প্রতীক 'ভারতেশ্বরী হোমস' তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। সে ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষয়িত্রী রওশন আরা বেগম, বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবিনগর। গ্রাম ও পোস্ট অফিস বরাইল। বাস্তব জীবনে পাকিস্তানি আর্মির সশস্ত্র গার্ডের প্রহরা উত্রে পালিয়ে যেতে স্বামীকে সাহায্য করেন। স্ব-গৃহে স্বামী-সন্তান-আত্মীয় পরিবৃত বন্দি পাকিস্তানি-সিগন্যাল অফিসার মেজর বাহার। কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে ২৫ মার্চের দুর্যোগময় দিনের তাঁরা বন্দি। নারী চাতুরির মুখে সাঁড়াশির অক্টোপাশের হাতুড়ি ফেল। সেনানিবাসের ভিতরে পাকা রাস্তার লাগোয়া বাড়ির ওপরে-সামনে-চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরার মাঝে বন্দি বাহার হাওয়া। পাকিস্তানি-আর্মির শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কিভাবে বাহারকে পালাতে সাহায্য করেন, তারই রূপকারিণী-শিল্পী রওশন আরাকে নিয়ে চলতি প্রসঙ্গ।

পাকিস্তানি রোষাণলে বাহার ঃ বাঙালি সিগন্যাল অফিসার মেজর মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ বাহার। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তাঁর পোস্টিং হয় ঢাকা থেকে কুমিল্লা। ঢাকার ১৯ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ান ছেড়ে আসেন কুমিল্লার ৫৩ ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানিতে। তার যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন খুবই নাজুক। একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা টিএন্ডটি'র মাধ্যমে। কুমিল্লার 'টিএন্ডটি' একচেঞ্জের সুপারভাইজার শুকুর সাহেব মারফত তখন খবরাখবর পাচার করা হয়।

২৪ মার্চ বিকাল ৪টা। ঢাকা থেকে কুমিল্লা ব্রিগেড সদরে আসেন কোয়াটার মাস্টার জেনারেল-(কিউ.এম.জি) মিটঠা খান। বাহার-এর সাথে তিনি কোলাকুলি করেন। ক্যান্টনমেন্টের লাগ নির্মাণ সম্পন্ন-প্রায় বাড়ির জন্য অসন্তোষ। বাঙাল বাহারকে মোটা বলে খোঁটা দেন জেনারেল মিটঠা। বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীল নকশার হস্তান্তর চলছে। ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করেছে। অস্ত্র-বস্ত্র-রেশনের সব কিছু গাড়িতে উঠিয়ে ব্যাটালিয়ান যাত্রা করে। তাদের সমর্থনে আর্টিলারি-ট্যাংক-মর্টারের সবই যাচ্ছে। পুরা ৫৩ পদাতিক ব্রিগেড মুভ করছে। ব্রিগেড এডভান্স গার্ড ২৪ এফ এফ রেজিমেন্ট। সে রেজিমেন্টের পাঠান সিও লেঃ কর্নেল শাহপুর বখতিয়ার। তার সেকেন্ড ইন কমান্ড বাঙালি মেজর আমজাদ ওরফে আসাদুজ্জামান। তার এডজুটেন্ট বাঙালি ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।

ইতোমধ্যে মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে দেশের সর্বত্র সুসংগঠিত হয়েছে সংগ্রাম পরিষদ। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম পাকা সড়কের দু'পাশে এমনি সংগ্রাম পরিষদগুলির মাধ্যমে দ্রুত সংবাদের আদান-প্রদান চলছে। মেজর বাহার কুমিল্লা সিভিল একচেঞ্জের জনাব শুকুরকে কুমিল্লা সেনানিবাসের পাকিস্তানি পরিকল্পনার গোপন সংবাদ জানিয়ে দেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহ দমনের অগ্রগামী রেজিমেন্টের পুরা বৃত্তান্তের নাড়ি-নক্ষত্র জ্ঞাত করেন। জনাব শুকুর-এর মাধ্যমে ইপিআর ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম এর একটি বার্তা পান বাহার। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ক্যাপ্টেন রফিকের কালজয়ী অবদানের আগাম সংকেতের দূতের কাজ করেন বাহার।

চট্টগ্রাম দখলে বীরদর্পে এগিয়ে আসছে কুমিল্লা ব্রিগেড। ফেনীর পূর্বে এসে তাদের দর্প খর্ব হয়। কাঠের ব্রিজ পুড়িয়ে দিয়ে জনতা পাকিস্তানি আর্মির গতি রোধ করে। বাহারের আগাম বার্তার সতর্কতায় ব্রিজ উড়িয়ে দেয় স্থানীয় জনতা। এতো সংগোপন-সতর্কতার আর্মি কার্যক্রমের সংবাদ বিদ্রোহী-জনতা পেলো কি করে? এবার এ-খবর প্রচারের জন্য মেজর বাহার পাকিস্তানি রোষাণলে পড়েন।

কুমিল্লা সেনানিবাসের মাঝামাঝি পশ্চিম থেকে পুবে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম পাকা সড়ক। সে সড়ক ধরে পূর্ব থেকে সেনানিবাসে প্রবেশের মুখে মিলিটারি পুলিশ-(এমপি) চেক পোস্ট। এম পি পোস্ট পেরিয়ে সেনানিবাসের সর্ব পূর্ব সীমানায় উত্তর-দক্ষিণে কোট বাড়ি পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা। সে পাকা রাস্তা ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে এগুলে হাতের ডানে প্রথম থেকে পর পর ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল, সেনানিবাস পোস্ট অফিস, ছোট পুকুর, হানিমুনে লজ কোয়াটার। হাতের বামে-সেনানিবাস শহিদ মিউজিয়াম, শহিদ কবরস্থান, নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। হানিমুন লজের পূর্বে নিশ্চিন্তপুর গ্রামের লাগ পশ্চিমে রাস্তার লাগালাগি মেজর বাহারের একতলা বাড়ি।

১৯৭১ সালে সে দিকে সিভিল এলাকায় চোখে লাগার মতো তেমন কোনো পাকিস্তানি বাড়ি ছিলোনা। বাঙালের সে বাড়ি পাকিস্তানি চক্ষুশুলের অন্যতম কারণ। বাড়ি নির্মাণে পাকিস্তানিদের আপত্তি ছিলো। সেনানিবাস বহির্ভূত এলাকায় তাঁদের আপত্তি টিকেনি। এ জন্য খোদ কিউ.এম.জি. মিটঠা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ। নির্মাণাধীন বাড়ি সম্পূর্ণ হবার পথে। পোস্টিং এসে সপরিবারে বাহার উঠলেন নিজ বাড়িতে। পাকিস্তানি আর্মি বাহারের বাহারি বাড়ি ধ্বংসে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকলো।

ইতোমধ্যে ঘনিয়ে আসে ২৫ মার্চ ১৯৭১। বাঙালির ইতিহাসের দুর্যোগঘন কাল রাত। ফেনীর পূর্বে চট্টগ্রাম অভিযানে পাকিস্তানি আর্মির যাত্রা রুদ্ধ। সংবাদ পৌছলো কুমিল্লা ক্যান্টে। দুষ্কর্মের হোতা বাহারকে স্তব্ধ করতে চাইলো পাকিস্তানি আর্মি। রাতে অকস্মাৎ ক্যান্টে নিষ্প্রদীপ মহড়া। বিদ্যুতের আলো বন্ধ।

সিগন্যাল সেন্টারের পাঞ্জাবি জেসিও বাহারকে টেলিফোন করেন। বাহার ফোন ধরেই পেলেন ব্রিগেড মেজর সুলতান আহমদ-এর ইত্তেলা। তাড়াতাড়ি অফিসে আসুন।

ওয়্যারলেস কাজ করছে না। তিনি উদ্বেগের কারণ জানলেন সুলতানের নিকট থেকে। ফেনিতে ইন্ডিয়ান কাফের এদেশের গুটিকয় গাদ্দার বেইমান বাঙাল জনতা দিয়ে ব্রিজ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর্মি ব্যাটালিয়ানের চট্টগ্রাম যাত্রা অবরুদ্ধ। জলদি আইয়ে। গাড়ি পাঠাচ্ছি। পাকিস্তানি পক্ষকে ধন্যবাদ। তারা নিজেদের বিপর্যয় নিজেরাই জানালেন। ১৯৬৫'র পাকিস্তানি-ভারত লড়াইতে সিতারা-ই-জুরত (এস.জে.) খেতাবে ভূষিত সুলতানের ডাকে ত্বরিত প্রস্তুতি নিয়ে বাহার চলে আসেন অফিসে। বাহার পত্নী রওশন আরা বেগম উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি ভালো না। পাকিস্তানি আর্মি বাঙালি মারার প্ল্যান আঁটছে। বাহারের কথা, আমি ট্রেইণ্ড কমান্ডো। বিপদে পড়ে মরবো বলে কি ঘরে বসে থাকবো?। আমি বাঙালি অফিসার-সৈনিক। ভেতো বাঙালির ভীরুতা ও কাপুরুষতার অপবাদে মরতে দিও না। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ংকরী।

বাহারের স্ত্রী রওশন আরা বলেনঃ তোমার পথের বাধা হবো না; যেতে বাধাও দিবো না। তবে বলবো, খালি হাতে বাহাদুরির বীরপনায় যাওয়া ঠিক নয়। বেগার লড়াই হেন্ডস্ আপ হবা-না। পাকিস্তানি আর্মি তোমাকে নিয়ে মেরে ফেলবে। মেয়েদের নিয়ে আমি বিধবা হবো। আমার ওপর সীমাহীন নির্যাতন করবে তারা। বাড়ি ধ্বংস করবে। সবাইকে মেরেও ফেলতে পারে। দীর্ঘশ্বাসে বলেনঃ সব সইতে পারি। কাপুরুষের পত্নী পরিচয়ে পোড়ামুখী বাঁচতে চাই না। এতোদিনের চেনা বীর জায়াকে নতুন করে দেখেন বাহার। যাবে তো যাও পয়েন্ট টু ফাইভ (.২৫) বোরের ব্যক্তিগত পিস্তল সাথে নাও।

ব্রিগেড মেজর সুলতানের পাঠানো গাড়ি এলো মেজর বাহারের বাসায়। তিনি গাড়িতে করে গেলেন ব্রিগেড মেজরের অফিসে। মেজর সুলতান তাঁর পিস্তল তাক করলেন বাহারের প্রতি। অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বাহারকে নিরস্ত্র করলেন। অবাক বিস্ময়ে বাহার ব্যাপার জানতে চান। পাকিস্তানি সালতানাতের বিশ্বস্ত খাদেম ৫৩ পদাতিক ব্রিগেড মেজর সুলতানের বয়ান- "কানট্রি হেজ রিভোলটেড। ইউ আর এ সিকিউরিটি হেজার্ড। উই শেল মেইনটেইন ইউনিট বাই ফোর্স–দেশ বিদ্রোহ করেছে। আপনি নিরাপত্তার এক বড় ধরনের ঝুঁকি। আমরা শক্তি বলে ঐক্য বজায় রাখবো।"

বি.এম. সুলতানের নির্দেশে বাহার বন্দি। কঠোর নিরাপত্তার প্রহরায় রাত কাটে ব্রিগেড সদরে। উদ্বিগ্ন বেগম বাহার টেলিফোন করেন বি.এম. সুলতানকে। সত্য লুকাতে ধানাই পানাই করেন মেজর সুলতান। বেগম বাহার ধমকে বলেন, সকল বাঙালিরে ব্যাপার জানামু। তখন বুঝবা ঠেলা।

স্বামী উদ্ধারে বেগম বাহারের প্রচেষ্টা ঃ উদ্বেগাকুল রওশন আরা বার বার ব্রিগেড মেজর সুলতানকে টেলিফোন করতে থাকেন। আমার স্বামী বাহার কোথায়? আপনিই-তো গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে নিলেন। তাঁর আসতে এতো দেরি কেন? তাঁর সাথে আমাকে কথা বলতে দিন।

মেজর সুলতান পাশ কাটিয়ে ব্যাপার এড়াতে চান। বাহারকে বাইরে পাঠানো হয়েছে

ফেনিতে। ওয়্যারলেস কাজ করছে না। আপনার কোনো কথা থাকলে আমাকে বলুন। বেগম বাহার জানতে চান, কোন পথে তিনি গেছেন। যাবার রাস্তাতো আমার ঘরের সামনে দিয়ে। আমি নিজেই তো পথে দাঁড়িয়ে আছি। এ পথে গাড়ি গেলে আমি দেখতাম। দেখো আমার স্বামীকে হয় আটকিয়ে রেখেছো, নয় মেরে ফেলেছো। আমাকে মিথ্যা কথা বলছো। সত্য কথা না বললে তোমাকে ছাড়বো না। আমি ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে তোমার ট্রিকস জানাবো। সকল বাঙালি অফিসার/জওয়ানের কাছে তোমার কুকীর্তি ফাঁস করে দেবো। বাঙালি অফিসার হত্যা/গুমের খবর যুদ্ধংদেহী অসহযোগী বাঙালি জনতাকে জানাবো। আমি নিরক্ষর নই। লেখা পড়া ভালো জানি। মাই বাপকা বেটী হো। বাঙালি আওরত কা কিম্মত তোম আভি তক দেখা নেহি। শোন পাঞ্জাবি-কা বাচ্চা। ইয়াদ করো নাম তেরা বাপকা।

ব্যাপার গুরুচরণ বুঝে সুলতানের সুবচনঃ বাঙালি বহিন তোমার বাচ্চার নামে কসম খাও। এসব কাউকে বলবে না। আশা করি আপনি আপনার ওয়াদা রাখবেন। তবেই আমি আপনার স্বামীকে ছেড়ে দেবো। কোনো যুক্তিই রওশন মানতে চান না। অগত্যা ত্যক্ত-বিরক্ত উত্যক্ত মেজর সুলতান মেজর বাহারের বাসার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। রাগে ফুঁসে কালনাগিনী।

বি এম-এর সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বেই বেগম বাহার একাধিক বাঙালি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অফিসার ইনচার্জ ফিল্ড ইনটেলিজেনস ইউনিট (এফ.আই.ইউ.) মেজর মহিবুজ্জামানকে ফোন করেন। বাহারকে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর ভরসা ইয়াহ ইয়াকেই এরেস্ট করে নিয়ে গেছে পাকিস্তান। কাউকে আর এরেস্ট করবে না। বাহারকে খবরটা দিবেন। কুমিল্লা ক্যান্টের বাঙালি সিনিয়ার গোয়েন্দা অফিসার সাপ্লাই কোরের লেঃ কর্নেল আনোয়ার। তাঁর ফুল কর্নেল পদোন্নতির অর্ডার বেরিয়েছে। তিনি র‍্যাংক পরার অপেক্ষায়। লেঃ কর্নেল আনোয়ার এর সঙ্গে রওশন আরা টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। তিনিও অভয় বাণীর সান্ত্বনা দেন।

টেলিফোন বিচ্ছিন্ন হতেই রওশন ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। হেঁটে মহিবুজজামানের বাসায় যান। ঊষা লগ্নে বাঙালি সৈনিক ব্যাটম্যান ফরিদপুরের আনোয়ার সুখবর নিয়ে দৌড়ে আসেন। দুই মেশিনগান সজ্জিত গাড়িতে সাহেবকে বাসায় এনেছে। রওশন ছুটলেন নিজের বাসায়। শত্রু সেনারা বেগমকে জাসুস বা চর ভেবে সন্দেহ করে। নিজের বাসায় তাঁর ঢোকা বারণ। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতি ধমকের চমক। ব্যাটম্যান ও বাহারের হস্তক্ষেপে তাঁর স্বগৃহে প্রবেশ।

শেষ পর্যন্ত রওশন আরার দৃঢ়তার কাছে পাকিস্তানি শক্তি নতি স্বীকার করে। রাত অবসানে বাহার বি এম অফিসে। সুলতানের কঠোর হুঁশিয়ারি। নিজ বাড়িতে থাকবেন। বাইরে কোথাও বেরুবেন না। চার সশস্ত্র গার্ডের প্রহরায় ২৬ মার্চ সকালে বাহার এলেন নিজ বাসায়। বাড়ির ছাদে আর্মড সেন্ট্রি। চতুর্দিকে গার্ডের কড়া প্রহরা।

বাহার স্বগৃহে বন্দি ঃ ব্রহ্মাণ্ড কাঁপানো কমান্ডোর মুখ বেজায় কালো। পিঞ্জিরাবদ্ধ বাঘ স্বগৃহে অন্তরীণ। তিনি পাকিস্তানি জিঘাংসার নগ্ন চিত্র ইতোমধ্যে স্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। বাঙালি অফিসার/জওয়ান মাত্রকেই মেরে ফেলার সংবাদ দেন। পরিস্থিতি আঁচ করে সবদিক সামলানোর অনিশ্চিত মৃত্যুভয়াল পথে স্বামীকে পালানোর উৎসাহ যোগান রওশন। "বাহার, যে-ভাবে পারো তুমি পালিয়ে যাও, বাঙালির স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দাও।" কমান্ডো বাহারের স্ত্রী-কন্যার জন্য ভাবনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোমনা-তেমনা। এবার রওশন আরো আগ্রাসী হয়ে ওঠেনঃ "তোমার গায়ে মাথা কুটে মরি, যেভাবে পারো সটকে পড়। পালানোর পথে, যুদ্ধে তুমি মরলেও আমার সুখ। প্রাণ ভরে তুমি বাবার সেবা করেছো। তোমার বাবার কবর এখানে। স্বর্গীয় বাবার দোয়ার বর্ম তোমাকে রক্ষা করবে। পাকিস্তানি নমুদের ব্যস্ত রাখার ভার আমার। সুরা ইয়াসিন পড়া পানি পান করিয়ে তোমাকে বিদায় করবো। সারা বাংলাদেশ আজ বিদ্রোহী। তাদের সাথে মিশে তুমি যুদ্ধ করো। বাংলার মাটিতে তিষ্ঠাতে না পারলে বিদেশে গিয়ে যুদ্ধের প্রচারণা চালাও, স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করো। ভারতের আগরতলা, আসাম, কলকাতা যাও। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের শত্রু দেশে না যেতে চাও না যাও। সিংগাপুর বা অন্য কোথাও গিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাও। তুমি না বাঁচলে, স্বাধীনতা না আসলে, কি হবে আমার এসব বাড়ি-ঘরের দালানে! বাড়ির প্লাস্টিক পেইন্টের প্রয়োজন নেই। তার খরচের দুই হাজার টাকা দিচ্ছি। যুদ্ধের নামে, আল্লাহর রাহে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি।"

বাইরের খবরের সন্ধান নেন রওশন। পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে মিনিকে পানির বালতি হাতে দিয়ে তিনি এফ আই ইউ (ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) অফিসে যান। পানি নেই বাহানায় মেয়েকে এফ আই ইউ অফিসের ভিতরের নলকা থেকে পানি আনার নির্দেশ দেন। মেয়েকে এক বাঙালি সিপাইর সতর্ক সংকেতঃ মা তোমাদের বাড়ি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে ধ্বংস করবে। তোমাদের মেরে ফেলবে। মেয়ের মুখে খবর শুনে বাহারের পালানোর তাড়ায় সাড়া পড়ে। প্রলংকরী স্ত্রী-বুদ্ধির যাদুর মধুতে মত্ত পাকিস্তানি-আর্মি। ছলনাময়ী নারী বুদ্ধির তুড়িতে পাকিস্তানি চাল কুপোকাত। সশস্ত্র আর্মি গার্ডের গর্মি ছুটিয়ে হাওয়া হয়ে যায় বাহার চিড়িয়া।

২৬ মার্চ সারা দিন সারা রাত আর্মড গার্ডের প্রহরায় স্বগৃহে বন্দি বাহার। বাইরের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। ঘরের রেডিওতে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা (ভো ও আ) শুনে অবস্থার মূল্যায়ন করে স্থির সিদ্ধান্ত হয়, ২৭ মার্চ দিনে পালাতে হবে। স্ত্রী তো এমন সিদ্ধান্তেরই অপেক্ষায় ছিলেন। এবার হর পার্বতীর পারস্পরিক সহযোগিতায় পলায়ন পথ নিষ্কণ্টক।

বাইরের খবরাখবর ঃ রওশন আবার রোশনাই বায়না। আমি ব্রিগেড কমাণ্ডার ইকবাল শফির বাসা ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজ যাবো। জিপ আসে। স্যানট্রির সাথে তিনি পৌঁছেন ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস। ব্রিগেডিয়ার বাসায় নেই। বাসার স্যানট্রি জিনিসপত্র

গুছাচ্ছেন। বাসার গার্ড সিপাইর সাথে কথা বলে বাসায় ফেরত আসেন রওশন। বাসার সামনে আসতেই ট্রুপসকে বলেন, বাচ্চার দুধ লাগবে। দুধ আনতে ব্রিগেড সদর হাকিম আলির ক্যান্টিন চলো। দুধ উছিলা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য বাইরের জগতের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করা।

জিপে ক্যান্টিনের দিকে যাচ্ছেন। পথে এফ আই ইউ অফিসের সামনে জিপ এলো। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন, জিয়াদা পিয়াসের তিয়াস পানি আন। ড্রাইভারকে ভাগিয়ে এফ আই ইউ অফিসে ঢুকেন। অফিসার খালেক ও মহিবুজ্জামানকে ডেকে আনেন।

বাহার-এর এরেস্টের কথা জানিয়ে সাহায্য চান। অসহায় অবস্থায় সাহায্যে তাঁদের অসমর্থতা প্রকাশ করেন। তাঁরাও বাস্তবে এরেস্ট। ইস্টার্ন বাউন্ডারি রোডের বাইরে না যাবার সতর্কতা রয়েছে তাদের জন্য। তাঁরা লোক পাঠিয়েও কোনো সাহায্য করতে অপারগ। এ-সব শুনে রওশন আরা বেগমের অঝোর কান্না। তাঁকে কান্না নিবারণে সান্ত্বনা দেন সকলে। ভাবালুতার সেন্টিমেন্টের দাম নেই।

তাঁদের আশ্বাস, বাহারকে হয় পাকিস্তান পাঠাবে অথবা অফিসার মেসে স্থানান্তর করবে। তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন চারেক সময় লাগবে। সব বাঙালি হত্যার বার্তা বাহারই হয়তো বাইরে পৌঁছে দেন। তাঁদের পালানোর জন্যও বাহার উপদেশ প্রদান করেন।

বাঙালি গোয়েন্দা অফিসারের আন্দা অনুমান নির্ভর তথ্যে বাহারের বিশ্বাস হয়নি। পাকিস্তানি সিদ্ধান্ত গ্রহণে চার দিনের গূঢ় রহস্যের দুর্ভেদ্য জাল ছিঁড়ে সময়ের সদ্ব্যবহারে পালানোর স্থির সিদ্ধান্ত নেন বাহার।

আমার মেয়েরে বাঁচাও ঃ রওশন আরার বাচ্চার ডায়রিয়া। বেদনার্ত কান্নায় বাচ্চা কাঁদে। বাচ্চাকে কাঁধে শুইয়ে মা ঘরের সামনে। সাহেব তো ঘরে আটক। আমি সিএমএইচ যাবো। মেয়ের চিকিৎসা লাগবে। মেয়ে মারা যায় কেমনে ঘরে থাকি। পাহারাদার সৈনিকরা প্রচার করছেঃ সাহেবকে ইন্ডিয়ানরা মেরে ফেলবে বলেই গার্ড দেওয়া হচ্ছে। বেসুরো কান্নায় রওশন। হায় আল্লাহ, আমার মেয়ে মরেরে। এম্বুলেন্স ডাকরে। বেগমকে ঘরের ভিতর নেওয়ার প্রচেষ্টা চালায় ডিউটিরত সৈনিকটি। আপ ঘর যাইয়ে। আন্দর ঢুকিয়ে। বাচ্চার বিমারে দাওয়াই মিলবে। এম্বুলেন্স আসবে। চিকিৎসা হবে। আল্লাহ সব মুশকিল আসান করবে। আপ মেহেরবানি করকে ভিতর যাইয়ে।

অসুখে বেদম ফুঁফিয়ে কাঁদে মেয়ে। অসুস্থ মুমূর্ষু রোগিনী মেয়ের ভাবনায় মা পাগলিনী। ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ছাদের উপরের সশস্ত্র সতর্ক প্রহরার গার্ড নিচে নেমে আসে। চার দিকের গার্ডরা জড়ো হয়। চার দিকের গার্ডরা শোকাতুর মাকে ঘিরে ফেলে। মেয়ের প্রাণ যায় ভাবনায় মা পাগলিনী। তাঁর উল্টা-পাল্টা বেসুরো কথা। ট্রুপসের সাথে ভাব জমানোর কৌশল। আপকা মোকাম কাঁহা? শিয়ালকোট বাড়ি শুনে খুশির আমেজ।

সেখানে আমরা অনেক দিন ছিলাম। ও বহুত খুবসুরত জায়গা। ওধার বহুত আচ্ছা খেইল কা সামান মিলতা। পঁয়ষট্টি মে শিয়ালকোট জিয়াদা লড়াই হুয়া। কাফের ইন্ডিয়া বহুত মার খাকে বিলকুল হারকে শিয়ালকা মাফিক শিয়ালকোট ছোড়কে ভাগ গিয়া। হায় আমার বাচ্চারে। এই বুঝি মরল রে..।। এম্বুলেন্স কাঁহারে!!! এমনিতর বাহানায় প্রায় আধা ঘন্টা। হঠাৎ ঘরের ভিতর অর্ডারলি চিৎকার ওমারে.....সাহেব ডাকছে ঘরের ভিতর যাই বলে দ্রুত তাঁর ভিতরে প্রস্থান। ট্রপস সান্ত্বনা দেয়, এম্বুলেন্স এলেই বাচ্চাকে উঠানো হবে।

ঘরে ঢুকতেই ব্যাটম্যানের বুক ফাটা কান্না। স্যার চলে যাবার দুঃখে ব্যাটম্যানের ফ্লোরে গড়িয়ে কান্না। কত্রী-সুরের নেতৃত্বে অর্ডারলিকে বেগম অর্ডার দেন, "উঠে দাঁড়াও, কাজ কর।"

মেজর বাহারের পলায়ন ঃ ২৭ মার্চ দিবাগত সন্ধ্যায় গ্রিল-শূন্য পাকা ঘরের জানালার পথে পাকিস্তানি সিগন্যাল মেজর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার পলায়ন করেন। বাড়ির পাকা ঘরের জানালায় তখনো গ্রিল লাগানো হয় নেই। সন্ধ্যার পর পরই জানালা টপকে নিচে পড়েন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবেই গিয়ে ঠোকেন পাক-ঘরের লাগ পুবের ধান ক্ষেতে। ক্রলিং করে একশ গজ যেতেই আঁধার নামে। অন্ধকারে পাকিস্তানি দৃষ্টির বাইরে বিচরণের স্বাধীনতা পান বাহার। এবার পূর্বদিকে কুমিল্লা শহরের দিকে এগুলেন। সাবধানে ডিঙিয়ে যান আলেখার চর গ্রামের পথে পাকা রাস্তা। উত্তরে গেলে গোমতি নদীর পাড়। দ্রুত নদী অতিক্রম করে মেজর বাহার অপর তীরে গিয়ে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বস নেন। এবার ধীরে-সুস্থে শহরের জনতার মেলায় মিশে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা।

বাহার গেলো। এবার শুরু হলো বাহারি খেইল। ঘরে লণ্ড ভণ্ড প্রচণ্ড দশা। কেউ যেন ভিতরে এসে বসতে না পারে। বাইরে থেকে যেন ঘরের ভিতরে কিছু দেখা না যায়। ট্রপসরা বাইরে থেকে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখে। আর্মির খাটিয়া উল্টিয়ে জানালা পর্যন্ত খাড়া করে বাইরের কারো দেখার কাজে বিঘ্নতার সৃষ্টি করে। ২৭ মার্চ দিবাগত রাতের পুরো কাম উল্টা-পাল্টা। জানালার চুনকাম পর্যন্ত চেয়ার উলটিয়ে রুমে কারো বসতে না-পারার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। বাইরে থেকে কেউ যেন বাহারকে দেখতে না পারে। কেউ যেন তার সাথে কথা বলতে না পারে। সে যেন কার সাথে কথা না বলে। স্বগত উক্তিতে বাহারের সাথে কথা। সে যেন ভিতরে আছে। স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমানের স্বাভাবিক কথা-বার্তা চলছে। গলার স্বর বাঁকিয়ে বিকৃত করে বাহারের স্বরের অনুকরণে দ্বৈত অভিনয়। মেয়েদের পটিয়ে পটিয়ে মায়ের শিক্ষা। বাইরের কেউ ঘরে ঢুকলে প্রাণ ফাটা চিৎকারের কান্না জুড়বি। দৈয়ের পাতিল, দুধের বোতল উল্টে ফেলে কাঁদবি। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রাখবি। খুলবি না। মা বাইরের বারান্দায় আছে। তোমাদের ভয় নেই।

বাথ রুমের দরজায় বাহারের স্যাণ্ডেল। তিনি যেন ভিতরে আছেন। দরজা ভিতর থেকে আটকানো। ভিতরে টুকটাক শব্দ। পানি পড়া, গলা খাঁকানি শব্দ, ফ্লাশ টানার আওয়াজ ধরনের বাস্তবধর্মী স্বাভাবিক কাজকর্মের নারী-অভিনয়ের খেলা। বেড রুমের দরজা আটকানো। ঘরের বাইরে মেয়ের খেলা। স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমান সাব। ঘুম ভাঙানো বারণ। লোকজন আসে যায়। ভেলকি খেইলের উলকি চমকে যায় সময়। শত্রু নিশ্চিন্ত। শিকার খাঁচায় আবদ্ধ। বাড়ির পাহারার আমর্ড গার্ড ভাবনা মুক্ত। শিকার তো পিঞ্জরে। ভাবনা কি?

২৮ মার্চের খেলা ঃ পর দিন ২৮ মার্চ। অফিসের নায়েব সুবেদার ক্রিপ্টো চাবি নিতে আসেন। তাঁর প্রথম কথা সাহাব কা সাথ মিলবো। রওশন নির্দেশ দেন, দাঁড়ান দেখি সাহেব কাঁহা। বাথ রুমের দরজায় থাক্কা। বেরোও অফিসের লোক দেখা করতে চান। ভিতরের কথা পেটে অসুখ। বেরুতে দেরি হবে। কিসের জন্য এসেছেন? আমাকে বলতে পারেন। সাহেব সেভ করছেন। অফিস লোকের চাবি চাই। দরজা ধাক্কিয়ে কথা, "বাহার চাবি দাও।" বিছানার নিচে চাবি আছে। অফিসের লোককে দেখিয়ে বিছানার চাদর উল্টিয়ে বালিশের নিচ থেকে চাবি বের করেন। এবার বাথ রুমের দরজায় গিয়ে প্রশ্ন, "অফিসের লোককে কি বলব? এই চাবি আপনাকে দিতে বলেছেন। আপনার নাম বলেন। ডকুমেন্ট হারালে দায়ী হবেন। চাবি নিয়ে অফিসের লোকের যাবার সময় কথা, "ফিকির না করে। ফের আয়গা।" ক্রিপ্টোর চাবি নিতে অফিসের লোককে আসতে হবেই। ব্যাপার সামলানোর দায়িত্ব স্ত্রী বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেন বাহার। মহিলা অভিনয়ের ছলা কলায় অফিস লোকের ভাবনা বাহার বাথ রুমেই আছেন।

২৮-২৯ মার্চ লোকজন বাহার-এর বাসায় আসেন-যান। কালনাগিনীর মরণ খেলায় শত্রুকে ব্যস্ত রাখের রওশন। ২৯ মার্চ বাঙালি-পাঞ্জাবি দু'দফা যুদ্ধ হয়। ৩০ মার্চ বিকালে বি এম সুলতান বাহারকে দেখতে আসেন। রওশন সংবাদ দেন, সাহেব স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমাচ্ছেন। সকাল থেকে তাঁর মাথা ব্যথা। আফসোসের কথা ঘরে দুধ নেই, চিনিও নেই যে মেহমানকে চা দিব। আবার বাহার দর্শনে আসার আশ্বাসে সুলতান বিদায় নেন। দুধ-চিনি পাঠানোর কথা দেন। বিকালের মধ্যেই তাৎক্ষণিক চা-চিনি ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেয়ে যান বেগম বাহার। এমত পরিস্থিতিতে চিন্তিত থাকেন বেগম বাহার, কি জানি কি হয়! ২৭ মার্চের দিবাগত রাত পার হয়। ২৮-২৯ মার্চের দিন রাত পার হলো। ৩০ মার্চের দিন শেষ, রাত যায় যায়। প্রতিটি দিন রাত্রি যেন মরণ বরণ পণ চরম খেলা। এই বুঝি সত্য ফাঁস হয়। সবার প্রাণ সংশয়।।

৩০ মার্চ দিবাগত রাত ফজরে বারান্দায় সদর্প বুটের আওয়াজ। বাহার সাব বাহার আও। বাহার সাব জলদি বাহার নিকাল আইয়ে। কথা শুনে রওশন আরা লাফিয়ে আসার মতন দ্রুত বারান্দায় আসেন। পাড়া তোলপাড়ে চিৎকার শুরু করেন তিনি। রাত মে লে গিয়া। আভি বাহার কাঁহাছে আয়গা / মেয়েদের সরোদন বাবা, বাবা, 'হায় বাবার করুণ চিৎকার' চলছে। ট্রপস প্রশ্ন করে, কোন লে গিয়া? আনধিয়ারামে ঠাণ্ডা

নেই নায়েব সুবেদার দীন মুহম্মদ মাফিক কোই আকে লে গিয়া। টেলিফোন/ওয়্যারলেস ঠিক করাতে নিয়ে গেছে। ঘর দুয়ার তন্ন তন্ন করে খোঁজার দুঃসাহসে তাঁরা পেলেন না। পুরা টাইম চার দিকে আর্মড গার্ড! চিড়িয়া হাওয়া!! জয় বিজয়িনী নারী বুদ্ধির জয়!!!

বাহারের সন্ধানে ডি কিউ বোখারি ঃ সকাল ৮টা নাগাদ ব্রিগেড ডি কিউ বয়স্ক উচ্চ পাঠান মেজর বোখারি আসেন। আলু থালু বেশে কান্নারত বেগম বাহারকে দেখে তাঁর দুঃখ হয়। বাহার হামারা দোস্ত থা। ও আভি কাঁহা হ্যায়? ফেনিয়ে ফুঁপিয়ে সকরুণ রোদনে রত রওশন। রাত মে ব্রেক আউট থা। যে বাহারকে নিছে তার চেহারা দেখিনি। আন্দাজে মালুম সে ইউনিটের দীন মুহম্মদ। বোখারি এবার উপর-নিচ সেন্ট্রি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের সবার কথা, "বাহার সাব কো আনধিয়ারামে কোই নিহি লে গিয়া।" বেগম সাহাব ঝুট বলা।

সন্দেহের নিরসনে বোখারির ঘর সার্চ। বেয়নেট উঁচিয়ে সবাই ঘরে ঢুকতে মেয়েদের চিৎকার। তন্ন তন্ন করে সব অনুসন্ধান চালানো হয়। বক্স, খাট, স্টোর, ফ্রিজ, টেলিভিশন, স্যাণ্ডেল, দৈয়র পাতিল, বাচ্চাদের খেলা গাড়ি, ইউনিফরম সব খুঁজে খুঁজে ঘেঁটে দেখেন। তাঁদের ধারণা ছিলো বাহার ইউনিফরমে পালিছে। কিন্তু ইউনিফরম পড়ে থাকতে দেখে তারা আশ্বস্ত হয়। চিড়িয়া গায়েব তো কার জন্য গার্ড। রওশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রেডি হউন, কোনো গার্ড থাকবে না। বাহারকে খুঁজতে তাদের বিদায়। দুতিন দিন আর তাদের দেখা নেই। বেবাককে অবাক করে দিয়ে রওশন আরা বেগম পাকিস্তানি আর্মিকে দেখালেন রোশনাইর ভেলকি খেইল।

ধ্বংসের তাণ্ডবে পাকিস্তানি আর্মি ঃ ঘরের সামনে জিপে বাঙালি অফিসার যেতে দেখলে রওশন উঠতে চাইতেন। তাঁরা নিতেন না। বাঙালি মাত্র একত্রে থাকতে চাইতেন। বাহার-এর বাড়ির লাগ পিছনে পুবের গ্রাম নিশ্চিন্তপুর। তার লাগ দক্ষিণের গ্রাম সাহেব নগর। পূর্ব-উত্তরের গ্রাম আলেখার চর দেখা যায়। সেনানিবাস সংলগ্ন গ্রাম জ্বালায় পাকিস্তানি আর্মি। বাড়ি-ঘরে তৈল জাতীয় দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন দেয়। মানুষ বেরুনো মাত্র গুলি করে। এমনি একাধিক হতভাগ্য বাঙালির মৃত্যু দেখলেন রওশন আরা বেগম। নিজ বাড়িতে দাঁড়িয়ে পার্শ্ববর্তী ও দৃশ্যমান এলাকার মানুষের মর্মান্তিক জ্বালাও-পোড়াওর হত্যা দেখলেন রওশন। বুঝলেন নিজের দিন ঘনিয়ে আসছে।

বাহারের বাড়ি ধ্বংস ঃ প্রথম হত্যা ধ্বংসে লাগেন কমান্ডো। তাদের গ্রামের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ হত্যা করে। তারা বাহার বেগমের ঘরের সামনে দিয়ে আসে ও যায়। কমাণ্ডোরাই বাহারের বাড়ি অনুসন্ধান করে। অনেক খোঁজাখুঁজিতেও তারা বাহারকে খুঁজে বের করতে পারেনি। চরম বিপদে নামাজে দাঁড়িয়ে বেগম বাহার আল্লাহকে ডাকেন। খাটের নিচে হাতের কাছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে রেখে

নামাজে দাঁড়াতেন। তাঁর রুমালে, শাড়ির আঁচলে, ব্লাউজে সেলানো থাকতো টাকা-পয়সা। গলার গয়না গলায় রাখতেন। বিপদের শেষ সম্বল হাত ছাড়া করতেন না বেগম বাহার।

অমিত তেজা ধ্বংসের প্রতীক কমান্ডোরা বাহারের বাড়ি ধ্বংসে উঠেপড়ে লেগে গেলো। একজনের চিৎকার জান বাঁচাও তো নিকাল আও। ১০ গ্রাম লাগা দিয়া আভি বন যায়গা। শুক্রবার জুমার পর পরই তারা বাড়িতে একসাপ্লোসিত লাগায়। উপায়ান্তর না দেখে ঘর ছেড়ে পশ্চিমের লনে বেরুলেন রওশন আরা। তাঁর নিজের মেয়েদের সাথে আছেন তিন দিনের বাচ্চা কোলে ছোট বোন। বোন জামাই সিএন্ডবি সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শাহাবুদ্দিন বাচ্চা দেখতে গিয়ে ফাটকে। ২৯ মার্চ পালিয়ে তিনি রক্ষা পান। নিজের সাজানো সংসারের ধ্বংস দেখতে নিজেরও বোনের সংসারসহ পাকা রাস্তা পেরিয়ে পশ্চিমের হানিমুন লজ পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। পাহাড়ের ঢালে সার্ভেন্ট কোয়াটার। এর নিচে কাঁঠাল গাছের তলে দাঁড়াতেই পুরা বাড়িটা অকস্মাৎ ধ্বসে পড়ে।

ঝাড়ুদার সিপাই সৌজন্য ঃ এক ঝাড়ুদার সিপাই শেষ মুহূর্তে ঘর থেকে কিছু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস উদ্ধার করেন। বাচ্চার দুধের বোতল, ছোট সুটকেস, টিভি জাতীয় দ্রব্যাদি। বিস্ফোরক লাগানো গ্রুপ লাথি মেরে এসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। তারপরও ঝাড়ুদার সে-সব জড়ো করে। সে দুধের বোতল কাজে লেগেছে। টিভি পৌঁছে যায় ইন্ডিয়া বাহারের কাছে। নিজেদের সম্পূর্ণ-প্রায় বাড়ির পাকিস্তানি ধ্বংস কয়েক গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে বোবা বিস্ময়ে দেখেন বেগম বাহার।

বাঘিনী ক্ষোভ ঃ মরা সন্তান ফেলে পশু পাখিও যেতে চায়না। ধ্বংসের লেলিহান শিখার সামনে অনড় রওশন আরা। রাস্তার ওপর দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মহিলাদের দাঁড়িয়ে থাকা বেমানান। বাড়ি ধ্বংস গ্রুপের একজনের নির্দেশ সার্ভেন্ট কোয়াটার যাও। ফুঁসে উঠলেন বাঘিনী। অফিসার পরিবার কেন সার্ভেন্ট কোয়াটার যাবে? হিম্মত হ্যায় তো গুলি কর। সার্ভেন্ট কোয়াটার নিহি যায়গা। তোমাদের কথা মানিনা। কার হুকুমে বাড়ি ধ্বংস করেছো। মানুষের বাড়ি জ্বালাও। গুলি করে মানুষ মার! ব্রিগেডিয়ারের নাম নিতে তাঁর তপ্ত কটাহে ঘৃতাহুতির মতো। বিগ্রেডিয়ারের আণ্ডারে কাজ করি না। ব্রিগেডিয়ারকে বলো গাড়ি দিতে শহরে যাবো। নতুবা এক গুলিতে কাম সার। তাদের কথা শহরে কোথায় যাবেন? রওশন বলেন, যেখানে খুশি সেখানে যাবো তাতে তোমাদের কি? আমার টিভি লাথি মেরে ফেলার ধৃষ্টতা দেখাও।

কুম্ভিরাশ্রু ঃ জিপ আসলো। বোনের পরিবারসহ নিজের মেয়েদের নিয়ে গেলেন অফিসার ফ্ল্যাট বাওয়ানি কোয়াটার। উঠলেন কুমিল্লার তৈয়ব আলি সাহেবের ছেলে মেজর শামসুজ্জামানের বাসায়। সেখানে পান ইন্টেলিজেন্সের মহিবুজ্জামানের স্ত্রীকে। রাত কাটে সেখানেই। মেজর শামসুজ্জামান এর বাসায় অনেক পাকিস্তানি অফিসার বেগম-এর আগমন। দৈন্যদশার বেগম বাহারের হাত-পা খালি দেখে তাঁদের বিস্ময়।

বেগম শামসুজ্জামান ব্যাখ্যা করেন, ইন্ডিয়ানরা তাঁর বাড়ি ঘর উড়িয়ে তাঁকে নিঃস্ব করেছে। তাই তাঁর মন খারাপ।

মেজর শামসুজ্জামান ট্রাকে যাবেন কুমিল্লা। বেগম বাহার তাঁর সাথে যেতে চেয়ে ব্যর্থ হন। কারণ পাকিস্তানি আর্মি হাওয়াই চিড়িয়া বাহার-এর খোঁজে আছে, তাই ম্যাডামকে তারা ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত শামসুজ্জামানও যেতে পারলেন না।

পরদিন সকালে এলেন ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি। বেগম বাহারকে তাঁর প্রশ্ন, বাহার কোথায়? পাল্টা ব্রিগেড কমাণ্ডারকে তাঁর স্বামী বাহার সম্পর্কে একই প্রশ্ন করেন বেগম বাহার? বাড়ি ঘর ভাঙ্গায় তাঁর কুমভিরাশ্রুর অনুশোচনা।" আমি থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটতো না। তোমার জিনিস-পত্র সবই পাবে। আগে বাহারের সন্ধান দাও।"

বন্দি নিবাস ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ঃ মেজর শামসুজ্জামানের মতো পাকিস্তানি পেয়ারের অফিসারগণ তাঁদের কোয়াটারে বহাল রইলেন। বিশ্বাসঘাতক বাহার পরিবারের মতো বাঙাল পরিবারগুলো বন্দি হলো। সবাইকে ট্রাকে উঠিয়ে নেওয়া হলো ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলে। পশ্চিম গাঁ নওয়াব পরিবারের সন্তান স্কিন স্পেশালিস্ট ডাক্তার মেজর কাজি সাইফুদ্দিন মানিককে দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বন্দি শিবিরে যেতে রাজি করানো হলো। তাঁর উপর ভার ছিলো সবাইকে নিয়ে বন্দি শিবিরে জড়ো করার। কুমিল্লা সেনানিবাসের সকল বাঙালি পরিবার এখন বন্দি। স্কুল-বন্দি শিবিরই তাঁদের আপাতঃ ঠিকানা। অনেক পরিবার হাঁড়ি পাতিল মালামালসহ আসেন। অনেকে আসেন হৃতসর্বস্ব এক বস্ত্রের খালি হাতে। অনেক মহিলার পেটে বাচ্চা। দুগ্ধপোষ্য কোলের বাচ্চাদের নিয়ে অনেকে বিপাকে। অনেকের শরীর ক্ষতবিক্ষত রক্ত-রঞ্জিত। চোখের সামনে স্বামীকে গুলিতে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী। স্বামী ও বয়স্ক সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে মহিলাদের অনেকে আহত। সে এক হৃদয়বিদারক মর্মন্তুদ স্পর্শকাতর হাহাকার দৃশ্যের বন্দিরা জড়ো হয়েছে ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলে।

কটি বাঙালি অফিসার পরিবার ঃ

ক। রওশন আরা বেগম, সিগন্যালের মেজর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার-এর পত্নী। সদ্যপ্রসূত-বোন মনোয়ারা নিজ মেয়ে নিয়ে ৯ মাস বন্দি। তাঁর নিজের তিন মেয়ে ও ৬ মাসের ছেলে আহসান ইবনে হাবিবসহ বন্দি শিবিরে।

খ। হাসনা গফফার (হাসু), মেজর গফফার পত্নী। সদ্য বিবাহিত বৌকে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার ডিসি'র গাড়িতে সেনানিবাসে আনেন গফফার। কয়েক দিনের মধ্যে মুজাহিদ প্রশিক্ষণে যান সিলেটের জাফলং। নতুন বৌকে সঙ্গে করে নেন জাফলং। সবার চোখে সুন্দরী বউয়ের ডাক নাম নতুন বৌ। সুন্দরী বৌকে সবাই দরজা বন্ধ করে রাখতে বলতেন। ইস্পাহানি স্কুল লাইব্রেরি থেকে জর্জ বার্নাড শ'র বই এনে পড়ে সময় কাটাতেন। মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা প্রশিক্ষণে গফফার অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলারাই

অবরুদ্ধ ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মির নাভিশ্বাস করে ছাড়ে। গফফার গেরিলাদের মাধ্যমে পত্নীর সাথে যোগাযোগ করেন। আরে বৌ এতো সাজিসনা। শত্রু সেনার লোতাতুর চোখ দেখে বুঝিসনা। গফফার এর শ্বশুর খুলনা থেকে মেয়ে-জামাইর খোঁজে পৌছেন আগরতলা। শ্বশুরকে ফ্রন্ট লাইনে নিয়ে যুদ্ধ দেখান বাহার।

গ। বেগম আনোয়ার, লেঃ কর্নেল আনোয়ার-এর পত্নী। কন্যা রুদাবা আনোয়ার ও দুগ্ধপোষ্য পুত্র মেহরাব আনোয়ারসহ বন্দি। তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলার সংবাদ পাকিস্তানি আর্মি স্বীকার করতো না। স্বামীর ব্যাপারে জানতে চাইলে তাঁকে বলা হতো। "পারহেপস হি হেজ গন সামহোয়ার এলস। নো বডি কুড ট্রেস হিম আউট-সম্ভবত তিনি কোথাও গেছেন। কেউ তাঁর সন্ধান পাননি।" বেগম বাহার যুক্তি দিতেন, নিশ্চয়ই তাঁকে মেরে ফেলে এখন ধানাই পানাই করছে পাকিস্তানি আর্মি। কুমিল্লা ব্রিগেড সদর বারবার শ্রী রমনী মোহন শীল আনোয়ার হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর নির্দেশিত বধ্যভূমির কবরস্থান থেকে র‍্যাংক ইউনিফরমসহ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ১৯৭২ সালে। বেগম আনোয়ার স্বাধীন দেশে সন্তানদের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি। মেহরাব বিএমএ থেকে কমিশন পান। বিবাহিত রুদাবা স্বামী সংসারে গর্বিত।

ঘ। বেগম মহিবুজ্জামান–যাদের স্বামীকে মেরে ফেলেছে তাঁদের তালিকা দেখতে দেওয়া হতো। সেখানে তাঁর স্বামীর নাম না দেখে আশ্বস্ত ছিলেন যে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর হত্যা দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী শ্রী রমনী মোহন শীল।

ঙ। বেগম জাহাঙ্গীর, ৪০ ফিল্ড এম্বুলেন্সের সিও লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরকে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ব্রিগেডিয়ার শফির নির্দেশে হত্যা পর্ব শুরু। নিজের ও সন্তানের চিন্তায় বেগম জাহাঙ্গীর বন্দি নিবাস ত্যাগ করতে চাননি। নিহতদের তালিকায় স্বামীর নাম দেখে আশা ভঙ্গ হন বেগম জাহাঙ্গীর।

চ। বেগম আইনুদ্দিন, মাশাআল্লাহ করার মতো বাঙালি মেয়ে। বাঙালি কেন অবাঙালিদের মাঝেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সাক্ষাত মহিষ মর্দিনী উমা। সুস্বাস্থ্যের জন্য সবার আদরের নাম আলুর গুদাম। তাঁর সুপরিচিত সুবিপুল বপুর সামনে শক্তিধর পাঞ্জাবি অফিসাররা পর্যন্ত কাঁচু মাচু থাকতো। ব্রিগেডিয়াররা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলতেন। যে-কোনো একটারে এক আছাড়ে ছাতু করার জন্য তিনি একাই একশ। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আতিককে পর্যন্ত তিনি ধমকাতেন, "আমাকে ছাড়বি কিনা ক?"

মোটাসোটা মোলায়েম শরীরের মিলি ওরফে বেগম আইনউদ্দিন সেজে গুজে থাকতেন। পাকিস্তানি পক্ষের সাথে ভাব জমিয়ে কার্য উদ্ধার করতেন। রেডিও চালাতে তাদের থেকে ড্রাইসেল ব্যাটারি নিতেন। নিজের ও বোনের জন্য

পাকিস্তানিদের থেকে সাজগোছের উপাদান আদায় করতেন। তাঁর বোন মুনিরা বেশ চটপটে মেয়ে। প্যান্ট শার্ট পরে ক্যান্টে যেতেন। এমপি'রা চেক পোস্টে আটকালে ত্বরিত জবাব দিতেন ফুটবলার ব্রিগেডিয়ার আতিক সাহাব কা পাছ পৌছা দো। তিনি ভাল উর্দু জানেন। ফলে পশ্চিমাদের সাথে জমিয়ে আলাপ করতেন। রক্ষণশীল মুসলমান পরিবার মিলি আইনুদ্দিন ও তাঁর বোন মুনিরার প্রাগ্রসর চৌকশ চালচলন পছন্দ করতো না। বন্দি জীবনের নির্জীব অবস্থায় প্রাণ চাঞ্চল্যের সজীবতায় ভুলে থাকতে চাইতেন আইনউদ্দিন পরিবার।

বেগম বাহারের বাড়ির দালান ধ্বংস হয়েছে। জায়গা তো আছে। সে বাড়ির নারিকেল গাছে ডাব বেড়েছে। গাছের ডাব আনিয়ে বেগম আইন সবাইকে বিতরণ করতেন। আল্লাহর দেওয়া শরীরটা রাখতে তাঁর বেশ খাবার লাগতো। দুতিন সের রসগোল্লা তিনি টুক করে সাবাড় করতেন।

বন্দি জীবনের স্নায়ুবিক বৈকল্যে অনেক বাঙালি পরিবারে নানা সংকট দেখা দেয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্টের সে-সব মানবিক ও মানসিক যাতনার উপশম সুদীর্ঘ কালেও হয়নি। আর হবে বলেও মনে হয় না। কারণ স্বাধীন আর পরাধীন ঝগড়াটে বাঙালের ঝগড়া যাবে কই? মিলি তাঁর খোলামেলা আচরণে অনেকের সমালোচনার পাত্রী হন। বাঙালি মাত্রই বীরযোদ্ধা আইনউদ্দিন-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের দুঃখ, ভালো মানুষ আইনুদ্দিনের এমন বাঘা বৌ। শান্ত স্বভাবের আইন তো মেপে মেপে কথা কয়।

প্রথমে বন্দিদের সাথে বাইরের পরিদর্শক ও আত্মীয়দের সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ ছিলো। জুলাই মাসের দিকে মার্শাল ল' কোর্টের নির্দেশে অনেক অফিসার পরিবার দেশের বাড়ি ও পাকিস্তান চলে যান। সেপ্টেম্বর থেকে বন্দি পরিবার বাইরের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারতেন। সে-সময় বাহার-গফফার-আইনুদ্দিন পরিবার বাইরে কথা বলার সুযোগ পান। কড়াকড়ি হ্রাস হলে বন্দিদের মা-বাপ-ভাই-ধরনের মেহমান বন্দি শিবিরে আসতে পারতেন। তাঁরা সেখানে কয়েকদিন থাকা খাওয়ার সুবিধা পেতেন। সুযোগের সদ্ব্যবহারে আইনুদ্দিন শ্বাশুড়ি মেয়ের খোঁজে বন্দি শিবির আসেন। প্রিয়জন দর্শনে সবার আনন্দ।

শহিদ পরিবারগুলি ছেড়ে দেন পাকিস্তানি পক্ষ। যোদ্ধা পরিবারগুলি কড়াকড়িভাবে তাঁরা আটকান। সাধারণ সৈনিক পরিবার নিজেরা পাকাতেন। তাঁরা অফিসার পরিবারের রান্নাবান্নায় সাহায্য করতেন। ইস্পাহানির দারোয়ান খলিল ছিলেন সকলের বিপদের পরম বন্ধু। সাধারণ বিপদ সাময়িকভাবে হলেও উঁচু নিচু ভেদাভেদ ভুলিয়ে বাঙালিকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অনুপম আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ক্যান্টেন আইনুদ্দিন-এর চিঠি আসে তাঁর বেগমের কাছে। মুক্তি ইন্টেলিজেন্স এমইএসের ছদ্মবেশে সেসব চিঠি পৌছে দিতো। পকেটে তারা সেসব চিঠি আনত না। জুতার তলায় করে সেসব পত্র আসতো-যেতো। মুক্তি গোয়েন্দার অন্যতম গোপনীয় ঝুঁকির কাজটি করতেন পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের নাপিত রমণী।

চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বীর যোদ্ধা স্বামীদের পত্র বন্দি শিবিরে সবার বেঁচে থাকার, ধৈর্য ধরার, স্বাধীনতা কামনার অপরিসীম শক্তি সাহস যোগাতো। প্রিয় মিলনের, বাসর শয্যার প্রথম পরশের মতো সুখের অনুভূতির অপরিসীম আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো স্বামীর পত্র। বীর স্বামীর জায়াদের সেসব পত্র সংগৃহীত হলে মুক্তিযুদ্ধে বীর জায়াদের নীরব অবদানের, স্বামীদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার আসল চিত্র পাওয়া যেতো।

ছ। বেগম জেরিনা তাহের, চোখের ডাক্তার মেজর তাহের-এর পত্নী জেরিনা দুর্দিনেও সাথীদের ভুলেন নি। নিজের শাড়ি অন্যদের প্রয়োজনে বিলিয়ে দিতেন। তাহেরদের পরে পাকিস্তান পাচার করে।

জ। বেগম হোসেন, এনেসথিয়েস্ট মেজর হোসেন সরল বিশ্বাসে বাহার-এর খবর জানান। এপ্রিলের মাঝামাঝি আগরতলা রেডিও থেকে পাকিস্তানি আর্মির সিনিয়ার বাঙালি অফিসারদের নাম ঘোষণা করে। ঢাকা থেকে সে সিগন্যাল মেসেজ আসে কুমিল্লা। বাহারের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও নিরাপদে ইন্ডিয়া পৌছার সংবাদ বেগম হোসেন সগর্বে সবাইকে বলে দেন। অভিনয় বিনয় পটিয়সী বেগম বাহারের জন্য এ-সংবাদটি বিপর্যয় ডেকে আনে।

মারীচের মরণে কাজে ঃ 'রামায়ণে' বর্ণিত সীতা হরণে, রাবন মারীচ রাক্ষসকে ব্যবহার করেন। সে ক্ষণিকে রূপ বদলাতে পারতো। সোনার হরিণের বেশে সে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে রামের তীর নিক্ষেপে নিহত হয়। মারীচ জানতো তার মরণ। তবু তাকে যেতে হয় ঃ

"না গেলে রাবন মারে
গেলে মারে রাম"

উভয় সংকট পড়েছিলো মারীচ। পাকিস্তানি বেড়াজালে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেককে কাজ করতে হয়েছে। মারীচের মরণের কাজ করেছেন ডাক্তার মেজর কাজি সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক। তিনি ছিলেন দোজখের দারোগা। বন্দি শিবিরের তত্ত্বাবধানের অপ্রিয় কাজে তিনি জড়িত ছিলেন।

কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরালে পাজি। আজ কাজির সে দশা। মা-বাপ-ভাই-সন্তানাদির পরিবার মিলিয়ে তাঁর চৌদ্দ জনের পরিবার। কপর্দক শূন্য অফিসারটির ছেলে মেয়ের সংসার যায় অতি কষ্টে। কেউ তাঁকে অর্থবিত্তে সাহায্য করতেন না।

অফিসার পরিবার ছাড়াই সাধারণ সৈনিকদের আশিটি পরিবার বন্দি ছিলেন ইস্পাহানিতে। দুএকজন বাঙালি সারেন্ডার করলে সেকি, রাজোচিত শৌর্যের ভাবগাম্ভীর্যের জামাই আদর সম্বর্ধনা। তাঁদের ভ্রান্তি বিনোদ, পাকিস্তানি অনুগত্যের ঐকান্তিকতায় খোদ ব্রিগেড কমাণ্ডার বক্তৃতা দিতেন। সারেন্ডার করা নোয়াখালির এক জেসি ও'কে বিশেষ সম্মানে বেশ কিছু দিন রাখা হয় ইস্পাহানিতে। পাকিস্তানি আর্মি সব চেয়ে খুশি হতো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেউ স্যারেন্ডার করলে। কারণ তাঁরাই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে সেনা বিদ্রোহের নিয়ামক প্রাণ শক্তির যোদ্ধা গ্রুপ।

বন্দি শিবির ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন সশস্ত্র পাকিস্তানি হানাদার। বন্দিদের ভাষা বুঝবার জন্য পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালি পাহারাদারও থাকতেন। নিয়মিত আর্মির সাথে ইপিআর প্রহরা ছিলো। অবাঙালি ইপিআর সুবেদার বকত খান বাঙাল কম বক্তদের টাইট করে রাখতো।

বাঙালি বন্দি পরিবারগুলির জন্য কিছু নিয়ম কানুন চালু করতে গিয়ে সবার চোখে কাজি বেটা পাজি বনে যান। স্কিন স্পেশালিস্টের বাঙালি মহিলাদের স্কিনের দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিলো। পাউডার-স্নো-লিপস্টিক-আইব্রুতে এতো সাজা কেন? গাল কুম কুমে লাল, কপালে টিপ, সুগন্ধি তৈলের বাহারে কেশবিন্যাশ কেন? সুগন্ধি আতরে চতুর্দিকে আমোদিত কেন? লাল শাড়ি, নীলাম্বরি শাড়ির বাহারি শাড়িতে এতো সেজেগুজে উপর থেকে নিচে নামা কেন? পাকিস্তানি আর্মির জওয়ানদের সাথে হেসে হেসে কথা কেন? তাদের দেওয়া উপহারে সবার উৎসাহ কেন? সাধারণ সৈনিক পরিবারের দুচারজন মহিলার বিড়ি/সিগারেট পানের অভ্যাস ছিলো। তাদের কেউ পাকিস্তানি আর্মির নিকট থেকে ধূমপানের উপকরণ নিতে দেখলে কাজি চটতেন। পান বিড়ির প্রয়োজনে সে সব নিজ তত্ত্বাবধানে নিচ তলায় রাখার ব্যবস্থা করতেন কাজি। পাকিস্তানি পাহারাদাররা পান-সিগারেট-বিস্কুট-পাউডার উপহার দিয়ে বাঙালি বন্দিনীদের মন পেতে চাইতেন। বেরসিক কাজির বিচারে কাজটা গর্হিত। বেহায়া বাঙালের চৌদ্দ গোষ্ঠী তুলে ধোলাই দিতেন। ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলের বাঙালি বেয়ারারদের মাধ্যমে বাঙালি মহিলাদের সতর্ক প্রহরায় রাখতেন। রাতে বাধ্যতামূলক বাঙালি প্রহরা থাকতো নিচের তলায়। কোনো প্রকারে কোনো পশ্চিমা নরপিশাচ যাতে উপরের জেনানা মহলে প্রবেশ করতে না পারে। ছলনাময়ী মিষ্টি হাসির বাঙালি ললনাদের সাজগোজ হাসাহাসির বাড়াবাড়িতে কাজি চটতেন। তাঁদের ওপর রাগতেন। তাঁদের গালি দিতেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগীরা বাস্তবতার সাক্ষ্য দিবেন। রূঢ় আচরণের বাঙালি পুরুষ বেটা কাজি না থাকলে ইস্পাহানির বন্দি শিবিরে বাঙালি কোনো মহিলার সতীত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। দুচার বাঙালি মহিলাকে জোরাছা টেকসিং-ফিকসিং-বকসিং প্রেক্টিস করে তিনি বন্দি শিবিরের শৃংখলা ঠিক রাখতেন। গায়ে গতরে সবার সেরা বাঙালি মহিলা আলুর গুদাম মিলিকে পর্যন্ত বাগে রাখতে হয়। এখানে তাঁর বকসিং প্রেক্টিসের প্রয়োজন পড়তো। দুর্যোগ দিনের কাজিকে তিনি আজো ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর স্বামী

আইনউদ্দিন দাঁত কিড়মিড়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধায় বাঘা বৌয়ের অভিযোগ শুনে রাগত চোখের দীর্ঘশ্বাসে ফুঁসে নীরব থাকেন। হায় সে বন্দি শিবিরের অসহনীয় দিনগুলি!

বাঙালির সকল প্রকার শৃংখলা ভঙ্গের জন্য পাকিস্তানি পক্ষ কাজিকে দায়ী করতেন। উপরের পরিবারের বাচ্চারা কাঁদলে নিচে আর্মিরা ঘুমাতে না পেরে কাজির কলার ধরে টানতো। বাচ্চাদের ঠাণ্ডা রাখতে কাজি মেয়েদের ওপর রাগলে সবাই নাখোশ হতো। বাঙাল পরিবারের ঝগড়ার দায় সামলান কাজি। শিশুদের খেলাধুলায় ঝগড়ার জন্য মায়েরা জড়িয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধাতেন। বাচ্চাদের ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা, কাপড় যোগানোর দায়িত্ব কাজির। সকলের রেশন যোগানোর দায়িত্ব তাঁর। কাপড় ধোয়া ও শুকানো পর্যন্ত ঝগড়া লাগলে তাঁরই থামাতে হতো। সকলের সকল কাজের সাতখুন মাফ। যতো দোষ নন্দ ঘোষ। যা কিছু হারায় কেষ্টা বেটাই দায়ী; কাজির পান থেকে চুন খসলে বাঙালির জাতমান, অফিসার ইজ্জত রসাতলে গেলো। দুর্যোগ দিনের অসহনীয় অবস্থা, বন্দি জীবনের তিক্ততার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কেউ যেতে নারাজ। সব দোষ নচ্ছার বেটা কাজির। বাঙালির অভিশাপ তিনি আজো কুড়াচ্ছেন।

পাকিস্তানি আর্মি তাকে পুরস্কৃত করেছে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা ইনটারোগেশনের নামে পিটিয়ে তাঁর মাজা ভেঙে। শেষ পর্যন্ত তিনি পাচার হন পাকিস্তান।

বেগম জয়নাল আবেদীনের সৌজন্য ঃ বাঙালি আর্টিলারি অফিসার জামান ও জাহাঙ্গীর রক্ষা পান চরম বাঙাল বিদ্বেষী লেঃ কর্নেল ইয়াকুবের কারণে। পাকিস্তানি নেক দৃষ্টির বদৌলতে বেগম শামসুজ্জামান বন্দি শিবিরের বাঙালিদের উপকারে আসতেন। মেয়েদের বাসস্থানের লাগোয়া কমন রুমে কিছুই নেই। বেগম বাহারের টিভি, ছেলেদের খেলার বল, সুটকেস, দুর্দিনের সঞ্চয়ে কেনা কাপড়-চোপড় বেগম শামসুজ্জামান-এর সৌজন্যে পাচার হয়ে যায়। পাঠান সেন্ট্রিকে বলে আনানো খোলা জিপে উঠে সে সব যায় সিএমএইচের বাঙালি ডাক্তার মেজর জয়নাল আবেদীনের বাসায়। জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী ফাতেমা বেগমরা তখন থাকেন বাওয়ানী কোয়াটারে। বন্দি শিবিরের সামনে দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়া পাকা রাস্তা থেকে বাওয়ানী কোয়াটার অফিসার বাসস্থান দেখা যায়। পাকা রাস্তা ও বাওয়ানী কোয়াটারের মধ্যখানে একটি ছোট্ট পুকুর। সৌভাগ্যক্রমে সর্বপুবের কোয়াটারটিতে ফাতেমা বেগম থাকেন। ফলে কোয়াটার থেকে পুবের রাস্তা দেখা যায়। পুবের রাস্তা থেকে বাওয়ানী কোয়াটারের সামনে দিয়ে সেনানিবাসের ভিতর পাকা রাস্তা গেছে। তখনকার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নাপিত রমণী মোহন শীল পেশাগত কারণে সর্বত্র যেতে পারতেন। তাঁর প্রচ্ছন্ন সহায়তায় বাহারের তিন মেয়ে খেলার নাম করে বেরিয়ে ফাতেমা বেগমের বাসায় উঠেন। তাঁর নিজের এক ছেলে দুই মেয়ের সাথে বাহারের তিন মেয়েকে মায়ের আদরে গ্রহণ করেন ফাতেমা। পাকিস্তানি শাসনের যাঁতাকলে বাঙালি মাত্ররই সেনানিবাসে তখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সে দুর্দিনেও ফাতেমা বেগম মাতৃস্নেহে পরের সন্তানের দায়িত্ব নেন। মেজর জয়নালকে পাঠায় পাকিস্তান।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা নিজের ও বাহারের সন্তানদের নিয়ে যান দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুরাদ নগর থানার ভুবনগর গ্রামে। বাহার-কন্যাদের তিনি পাঠান বেগম বাহারের বাপের বাড়ি নবিনগর থানার বরাইল গ্রামে। বাহার-ভাগ্নে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল বাতেসের সাহায্যে মেয়েরা পৌঁছেন আগরতলা। বাহার মেয়েদের পাঠিয়ে দেন ৮ নং সেক্টর সদর পশ্চিম বঙ্গের কল্যাণী। জীবন মৃত্যুর ঝুঁকিতে পাকিস্তানি আর্মির চোখে চিহ্নিত প্রামাণ্য বিশ্বাসঘাতক বাহার-কন্যাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেন ফাতেমা বেগম। স্বার্থপরতার দেশে বাঙালি নারীর সহমর্মিতার সে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

বাহারের শখের সাদা-কালো টেলিভিশনও ইন্ডিয়া পৌঁছেছিল। আর্টিলারি মেজর শামসুজ্জামান বহুভাবে বাঙালি বন্দি শিবিরের উপকার করতেন। তাঁর বাসায় প্রচুর গরু-খাসির মাংস পাঠাতো পাকিস্তানি আর্মি। চারপাশের মানুষের লুটপাটের পশুর মাংস। সে সবের অনেক কিছু তিনি বন্দি শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন। মেজর শামসুদ্দিন, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, ডাক্তার মেজর জয়নাল আবেদীনদের পাকিস্তানে সরিয়ে নিলে বন্দি শিবিরের বাঙালিরা অত্যন্ত অসহায়বোধ করতেন।

বন্দি শিবিরে বহিরাগত বেসামরিক বন্দি ঃ ইস্পাহানি পাবলিক ইস্কুলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাখা হতো বেসামরিক বন্দিদের। শেষ রাতে ও সকালে তাদের ধরে আনা হতো। বন্দিদের অধিকাংশ চেহারা ও পোশাকে সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য হিন্দু। চান্দিনা থানার দিক থেকে আনত অধিক সংখ্যক হিন্দুকে। হিন্দু মা-মেয়েকে নির্যাতনের চিহ্ন ও বিপর্যস্ত অবস্থায় বিধবার ড্রেসে দেখা যেতো। বন্দিদের মধ্যে মুসলমানও থাকতো অনেক। অন্যদের দেখার মধ্যে বন্দিদের ওপর খারাপ ব্যবহার করতো না। তাদের খাবারও দিতো। রাতের শিকার দিনে শিবিরেই থাকতো। সন্ধ্যায় গাড়িতে করে নিয়ে যেতো। তাদের আর কোনো সন্ধানই মিলতো না।

গোয়েন্দা সংযোগ ঃ বন্দি শিবির ও সেনানিবাসে দু'পর্যায়ে সংযোগ ঃ

ক। হক মটর্স ঃ হক মটর্স ওয়ার্কশপের মালিক মুন্সি আবদুল হক। কুমিল্লা শাসনগাছা বাস স্টপেজে তাঁর গাড়ি মেরামতের কারখানা। অন্যতম কৌশলী মানুষ। আশ্চর্য চাতুর্যে শত্রু-মিত্র দু'দলকে তুষ্ট করে কার্য উদ্ধার করতেন। প্রথমে তিনি ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ও ব্রিগেডিয়ার আতিকের গাড়ি মেরামত করে শত্রু পক্ষকে তুষ্ট করেন। হক মটর্সের আবদুল হক ইস্পাহানি কলেজ বন্দি শিবিরে সবার সাথে দেখা করতেন। ক্যান্টনমেন্ট ও বন্দি শিবিরের সংগৃহীত বার্তা আগরতলা মুক্তি সদরে পৌঁছে দিতেন। গাড়ির যন্ত্রাংশ কেনার বাহানায় তিনি আগরতলা যেতেন। সেখান থেকে বন্দিদের প্রিয়জন বার্তা বয়ে আনতেন। দৌত্যকর্মে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অন্যান্য মুক্তি দূতেরাও তাঁর মাধ্যমে তথ্যাদি বিনিময় করতেন।

কুমিল্লার পতন তখন আসন্ন। মেজর বাহারের এককালের কোর্সমেট পাকিস্তানি মেজর বশিরের দুঃখ- "গুড ডেইজ আর কামিং ফর ইউ। উই আর ইন ডেঞ্জার–আপনাদের

সুদিন আসছে। আমরা বিপদে।" ইতোমধ্যে জেসিও, এনসিও, সাধারণ সৈনিক পরিবারকে মুক্তি দেয় পাকিস্তানি আর্মি। বাহার, গফফার, ধরনের অফিসার পরিবারের বন্দি শিবির বিমোচন। সবাই পুলিশের গাড়িতে চললেন তাঁদের বরাভয়ের আশ্রয় হক মটর্সে। বিপদের এমন সজ্জন ও একান্ত আস্থার সাথে বিশ্বাসের আপন জন কুমিল্লা ক্যান্ট বন্দি শিবিরে হক মটর্সের মতো খুব কমই ছিলেন।

খ। এম ই এস ঃ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (এম ই এস) লোকজন বিদ্যুত-পানি জাতীয় অতি প্রয়োজনীয় কাজে সেনানিবাসের ভিতরে বাইরে যাওয়া-আসা করেন। তাঁদের মাধ্যমে খবরের আদান প্রদান ভালো চলতো। ইলেক্ট্রিসিয়ানদের সাথে বেগম বাহারের পূর্ব থেকে ভালো জানাশোনা ছিলো। বন্দি শিবিরে বিদ্যুত সংযোগের প্রয়োজনে আসা ইলেক্ট্রিসিয়ান বেগম বাহারকে চিনলেন। নামাজ পড়ে বেগম বাহার নিখোঁজ স্বামীর দুশ্চিন্তায় কাঁদছেন। বাহারের কোনো কিছুই না জানায় অশান্ত মনের হা-হুতাশ হাহাকারের আহাজারিতে বুক ভাসাতেন। স্বামী অন্ত প্রাণ বাঙালি বধূ রওশন আরা অপূর্ব দীপ্তির রোশনাই ছড়িয়ে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার অভিনয় করতেন। ইলেক্ট্রিসিয়ানেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আপনি কাঁদেন কেন? স্যার তো ভালো আছেন।" ভারতের রেডিও বলছে, আমাদের লোকজন তাঁকে আগরতলা দেখেছে। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সিগন্যালের মেজর বাহার কুমিল্লায় প্রথম গ্রেফতার হন। ফলে তিনি ও তাঁর বেগম সেনানিবাসের সকল পদবির কাছে পরিচিতি লাভ করেন। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে ইলেক্ট্রিসিয়ানরা বলতো আপনারা বেশি বেশি কমপ্লেইন দিলেই আমরা আসবো। মানিক ছদ্ম নামে ২৪ অক্টোবর বাহারের চিঠি পৌঁছে রওশন আরার হাতে। মুক্তিযুদ্ধে সিগন্যাল সমন্বয়ের প্রয়োজনে মেজর বাহার ছিলেন ভ্রাম্যমাণ। তাঁর মূল আস্তানা কলকাতা। ফলে চিঠি পেতে তাঁর বেশ সময় লাগতো। এম.ই.এসের ফরিদ বাহারের চিঠি বহন করে আনেন। এম.ই.এস. লোক মারফত বিক্রির নামে বাহার-এর সাদা-কালো টেলিভিশন যায় সেনানিবাসের বাইরে। সিগন্যাল সিপাই আনু দুর্দিনে ছায়ার মতো আগলে রাখতেন বাহারের পরিবার।

গফুর পরিবারের লোক মারফত আসে মেজর গফফার-এর সংবাদ। নতুন বৌ হাসু ব্যাপার স্যাপার বুঝেনা। মুক্তির পত্রবাহক এসেছে। কে যে গফফার পত্নী সে ধরতে পারছে না। হাসুও তাকে চিনে না। চোখ টিপে হাসুকে সরিয়ে নিয়ে প্রিয়তমের প্রণয় বার্তার চেয়ে জরুরী গোপন বার্তা পৌঁছে দেন। অতি ছোট্ট চিরকুট, "আমি ভালো হাসনা।" বেগম গফফারের লিখিত চিঠি নেন মুক্তি দূত। সাত দিনের ব্যবধানে আসার *আশ্বাসে গোয়েন্দা বিদায়।*

ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের সিভিল ব্যাটম্যান মান্নান কাপড় ও চিঠি নিয়ে আসতেন। নানা ছলাকলার কৌশলে মুক্তি দূত বন্দি শিবিরে ঢুকতেন। টেইলার মাস্টাররা কাপড় বানানোর আদেশ পেয়ে মুক্তি দূতের বার্তা নিয়ে আসতেন। বন্দি শিবিরের জন্ম-মৃত্যুর খবরা-খবরে কুমিল্লা ক্যান্ট সিএমএইচের খ্রিস্টান নার্স আসতেন। তিনিও মুক্তি

ইন্টেলিজেন্সের কাজ করতেন। বন্দি শিবিরের পাকিস্তানি পাহারাদের আর্মির দাড়ি সেভ ও চুল কাটায় ঢুকতেন নাপিত রমনী মোহন। তিনি করতেন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোয়েন্দার কাজ। যাতায়াতে তাঁকে গাড়ি দিতো না। তিনি পায়ে হেঁটে শত্রুর বিভিন্ন অবস্থানে গিয়ে পেশাগত কাজ করতেন। পায়ে হাঁটা মাপের দূরত্বে শত্রু অবস্থান, তাদের অস্ত্র মোতায়েন স্থান দাগ নম্বরে মুক্তি অবস্থান আবিদপুর মেজর আসাদুজ্জামানকে পাঠাতেন। পাকিস্তানি আমলের দুজন বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তি দলে যোগ দেন। তাঁরা ঝাড়ুদারের কাজে নিয়োগ পত্র পান। কারণ তখন অধঃস্তন পদে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের ঝাড়ুদার, বাবুর্চি, মুচি, ধোপা-নাপিতের মতো লোকের বড় অভাব ছিলো। এসব কাজে লোক পাওয়া যেতো না। পাকিস্তানি আর্মি গয়রহ বাঙালি হত্যা করলেও জরুরী কাজের লোকদের হত্যা না করে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতো। প্রয়োজনীয় কাজের পালিয়ে যাওয়া সিভিল কর্মচারিদের স্থলে নতুন লোক নিয়োগ করতো। এসব পদে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লোক আনা বা বিহারি নিয়োগ পাকিস্তান আর্মির পক্ষে সম্ভব হয়নি। সিভিলিয়ান নতুন পদে লোক নিয়োগের সুযোগ নেয় মুক্তিরা। শত্রু দুর্গে প্রবেশের লাইসেন্সটা তারা এভাবে যোগাড় করেন। প্রত্যেকটি বেসামরিক কর্মচারির পরিচয় পত্র বা আইডেনটিটি কার্ড ছিলো। আইডেনটিটি কার্ড অশিক্ষিত পাকিস্তানি ফৌজের জবানে ছিলো ডান্ডি কার্ড। আশৈশব সেনাবাহিনীর নাপিতের কাজ করে দীর্ঘদিন ব্রিগেড সদরে থাকার ফলে মুক্তি গোয়েন্দা নাপিত রমণী মোহনের আর্মির নাড়ি নক্ষত্র নখদর্পণে। যতোদিন পূর্বেই হোক, কুমিল্লা সেনানিবাস বা ব্রিগেড সদরে কোনো আর্মি কাজ করে গেছেন পরবর্তীতে তাঁদের চিনতে রমনীর অসুবিধা হতোনা। পাকিস্তানি আর্মির নতুন দুই ঝাড়ুদার পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগী দুই মুক্তি চরকে দাগ নিশানায় চিনলেন রমণী। কাগজের সিগারেট বানিয়ে তার অর্ধেকে তথ্যাদি লিখে রাখতেন রমনী। আধা পোড়া সিগারেট নাপিতের রুমে পড়ে থাকতো। ঝাড়ুদার সেসব ঝাড়ু দিয়ে দিত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পৌঁছতো মাইল দশেক দূর আদিবপুর। সেখানে আছেন মুক্তি মেজর আসাদ। আবিদপুর থেকে মুক্তিরা পাকিস্তানি আর্মির গোপন তথ্য অল্প সময়ে পৌঁছে যেতো আগরতলা মুক্তি সদরে। পাকিস্তানি দুর্গে গোয়েন্দা কার্যক্রমে রমণী মোহন শীলের অক্ষয় অবদান মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

পানি-বিদ্যুত, ধোপা-নাপিত-ঝাড়ুদার, ছুতার-টেইলার-মুচি, বাবুর্চি, মেডিক্যাল এটেনডেন্ট সিভিল পিয়ন-দারোয়ান-চৌকিদার, স্কুল কেয়ারটেকার, টেলিফোন অপারেটর, বন্দিদের দেখতে আসা আত্মীয়-স্বজন মারফত বাইরের জগতের সাথে সংযোগ স্থাপিত হতো। এসেনসিয়েল সার্ভিসের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের লোকরাই মুক্তি দূতের বিশেষ ভূমিকা পালন করতো।

এম.ই.এসের লোকেরা পায়ের নিচে, জুতার চামড়ার তলা, জুতার সুখতলির নিচে করে চিঠি আনতো-নিতো। বন্দি বেগমদের চিঠি তারা নিতো। পকেটে তারা চিঠি রাখতো না।

কর্ণেল মীরের সৌজন্যে ঃ পাকিস্তানি আর্মি মেডিক্যাল কোর অফিসার কর্ণেল মীর। তিনি ছিলেন কুমিল্লা সিএমএইচের সিও। কুমিল্লা ক্যান্ট ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি। গভর্নিং বডির সেক্রেটারি কর্ণেল মীর। তাঁরই আশ্বাসের ভরসায় দুর্যোগের ঘনঘটার মাঝেও আবাসিক ছাত্ররা স্কুল হোস্টেলে। শিক্ষকরা ছিলেন শিক্ষক কোয়াটারে। স্কুল অধ্যক্ষ অবাঙালি সেনাশিক্ষা কোর রিটায়ার্ড অফিসার লেঃ কর্নেল আমিল। ১৭ মার্চ '৭১ গভর্নিং বডির সভা বসে চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সভাপতিত্বে। তাঁর সুদৃঢ় নির্দেশ স্কুল চালু থাকবে। ছাত্র না আসুক, শিক্ষক হাজিরা বাধ্যতামূলক। সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব গভর্নিং বডির সভাপতির। কেউ কোয়াটার ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

২৫ মার্চের দুর্যোগ শুরু হতেই অধ্যক্ষ শিক্ষকদের সটকে প্রকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেন। শিক্ষকদের সে সুযোগ নেয়ার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। ২৯ মার্চ গোলাগুলির স্টাফ কোয়াটারের শিক্ষকরা বন্দি হন। ৩০ মার্চ বন্দিনিবাস থেকে স্কুল অধ্যক্ষ তাঁর বাঙালি কুক খলিলকে ছুটিয়ে আনেন। বন্দি শিক্ষকদের মুক্তির আবেদন, প্রাণ ভিক্ষার আহাজারি অধ্যক্ষের মনে সাড়া জাগায়নি। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার সাহাবকে নারাজ করে শিক্ষক মুক্তির উদ্যোগ তিনি নিলেন না। গভর্নিং বডির সেক্রেটারি কর্নেল মীর ব্যাপারটি সহজভাবে নিলেন না। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের সুস্পষ্ট নির্দেশে এতোগুলি ছাত্র-শিক্ষকের মৃত্যু। স্কুল গভর্নিং বডির সেক্রেটারি হিসাবে তিনি নিজেকে দায়ী ভাবতেন। বালা বিদায় করতে তাঁকে কাশ্মীরে পোস্টিং করা হয়। শেষ পর্যন্ত এ মহাপ্রাণ ডাক্তার মীরকে মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগী বানিয়ে চাকরি চ্যুত করে দায়মুক্ত হয় পাকিস্তানি আর্মি।

মীর যতোদিন ছিলেন, বন্দি শিবিরের লোকজন ততোদিন ছিলেন নিরাপদ। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্কুলের গেইমস শিক্ষক আব্রু মিয়া কাজে যোগ দেন। ছাত্র শূন্য স্কুলে তিনি করেন কেয়ারটেকার ধরনের কাজ। বন্দি বাঙালি পরিবারের ইজ্জত-আব্রু রক্ষায় শিক্ষক আব্রু মিয়া ওরফে মিয়া স্যার বিশেষ অবদান রেখেছেন। প্রকাশ্যে চিহ্নিত বন্দি পরিবারের সাথে তিনি কথা বলতে পারতেন না। নীরব গোপনীয়তায় তিনি ছিলেন সবার বরাভয় নিরাপত্তার উৎস।

উর্ধ্বতন পাকিস্তানি অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদে আসলে বেগম বাহার সব জেনেও না-জানার অভিনয় করে পাকিস্তানি পক্ষকে যে ঘোল খাওয়াতেন তার জীবন্ত সাক্ষী আব্রু মিয়া। ইস্পাহানির পাঞ্জাবি অধ্যক্ষ আমিলের বাঙালি কুক কাম সিভিল ব্যাটম্যান খলিল লিবারেশনের পর মেজর বাহারের বাসায় কাজ করেন। দুর্যোগ দিনের জীবন্ত সাক্ষী খলিলদের অবদানধন্য মুক্তিযুদ্ধ।

পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ঃ উর্ধ্বতন পাকিস্তানি আর্মি অফিসাররা বন্দিদের স্ত্রীদের দিয়ে তাঁদের নির্দেশ মতো চিঠি লেখাতে চাইতেন। এমনি একজন ছিলেন পাকিস্তানি

আর্মি অফিসার লেঃ কর্নেল রফিক। তাঁরা স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখতে বলতেন, "তুমি স্যারেণ্ডার কর। নইলে আমাকে মেরে ফেলবে।" স্ত্রীরা সে সব এড়িয়ে যেতেন। বেগম বাহার লিখতেন, " স্যারেন্ডার করবে কি করবে না তা তোমার ব্যাপার।" এসব ব্যাপারে পাকিস্তানি পক্ষ বিশেষ খারাপ ব্যবহার করতো না।

কেউটের বাচ্চা ঃ নিজের মেয়ে রোকসানা বাহার, রোহেনা বাহার, রোমানা বাহার, সদ্য প্রসূত বোনের মেয়ে ও নিজের ৬ মাসের ছেলে আহসান ইবনে হাবিবসহ রওশন আরা বেগম পাকিস্তানি বন্দি শিবিরে। অনেক অফিসারই রওশন আরাকে ইন্টারোগেট করতে আসেন। আর্টিলারি লেঃ কর্নেল ইয়াকুব রওশন আরাকে জিজ্ঞাসাবাদে এসে পড়লেন মাসুম বাচ্চা আহসান ইবনে হাবিবের পাল্লায়। পাকিস্তানি মামা ইয়াকুবকে জুতা পেটার রোষে বেয়াকুব বানিয়ে ছাড়ে বাঙাল ভাগ্নে। পাকিস্তানি মামার বিস্ময়। ইয়ে তো বিচ্ছু কেউটে বন গিয়া। ১৯৭১ এর ইয়ে তো আভি বাপকা তরক হো গিয়া। ইয়ে তো বিচ্ছু কেউটে বন গিয়া। ১৯৭১ এর কেউটে ১৯৯২তে বুয়েটের ছাত্র। জিতে রাহো কালকেউটেরা।

প্রণতি রওশন আরা ঃ টাঙ্গাইলের ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষয়িত্রী, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ওরফে আর পি সাহার মানস কন্যা রওশন আরা। আর পি সাহাকে পাকিস্তানি আর্মি হত্যা করেছে। তাঁর বিদ্যানিকেতনের সকল ছাত্রীকে তারা হত্যা করতে পারেনি। রওশন আরার স্বামী সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার মুক্তিযুদ্ধের উষা লগ্নে নিশ্চিত মৃত্যুর অনিশ্চিত ঝুঁকির মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁর সাহসী ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। অসম সাহসে বুক বেঁধে স্বামী বাহারকে স্বগৃহে পাকিস্তানি সশস্ত্র প্রহরা উৎরে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর সে নির্ভীক সাহসিকতার চেতনা ভবিষ্যতের অবলা বঙ্গ নারীর জন্য হোক সবলার নিদর্শন। মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গ নারীর অবদানধন্য হোক রওশন আরার নাম। মেজর বাহারের নামের মতোই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রওশন আরার নাম অক্ষয় হোক।

রেফারেন্স
ক। একান্ত সাক্ষাৎকার-শ্রী রমণী মোহন শীল।
খ। একান্ত সাক্ষাৎকার -অবসর প্রাপ্ত লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, সিগন্যালস ।
গ। একান্ত সাক্ষাৎকার- রওশন আরা বেগম ওরফে বেগম বাহার।
ঘ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিল পত্র -১০ম খণ্ড।

অগ্নি কন্যা নাজিয়া

"কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?"

পলাশির কাছাকাছি দুটি ঘটনা ঃ প্রথমটির সময় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন অপরাহ্ন। দ্বিতীয়টির সূচনা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ অপরাহ্ন। প্রথমটিতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ডুবেছে। দ্বিতীয়টিতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পূর্ব তোরণে নাবারুণ রাগে পাখা মেলেছে। প্রথমটির পরিণতিতে লুৎফার নয়নমণিকে তাঁর সামনে থেকে ছিনিয়ে নিলো বাঙালি ঘাতক। ইংরেজের তিনটাকা দু'আনা মাসোহারায় সিরাজ পত্নী বেঁচে রইলেন স্বামীর কবরে কোরান পাঠে আত্মার প্রশান্তি কামনায়। সিরাজ কন্যাটির খোঁজ ইতিহাস রাখেনি। দ্বিতীয়টিতে সিরাজের প্রাণ কেড়ে নিল বাঙালি মস্তান। এ-যুগের লুৎফাও দুটি কন্যা রেখে গেলেন। আশ্চর্য দুক্ষেত্রেই দয়ার্দ্র ঘাতক কন্যাদের রেহাই দিয়ে লুৎফাদের নির্বংশ হতে রক্ষা করলেন। বাংলার আরেক সিরাজ প্রতিমেরও দুটি কন্যা ঘাতকের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে নির্বংশ হবার হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

এবার ইতিহাসের উল্টা খেলা। সিরাজ প্রতিম বেঁচে আছেন এ-যুগের লুৎফার কবরে পুষ্পার্ঘ্য দিতে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণের ৮ নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা আবু ওসমান চৌধুরী।

নাজিয়া ওসমান ঃ এতো বড় মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গ-ললনাদের অবদান যেন ছলনা করেই অবমাননা করা হচ্ছে। মহাকাব্যে উপেক্ষিতার ন্যায় গভীর দুঃখ ও বেদনায় নাজিয়া ওসমানকে স্মরণ করছি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। স্থান লাহোর। ওসমান পরিবার আনন্দে আত্মহারা। পরদিন আকাশে উড়বেন বাংলার উদ্দেশে। রাতেই এলান হলো ভারতের উপর দিয়ে প্লেন চলবে না। কারণ কাশ্মিরি প্লেন হাইজাকের হুজ্জত। হরিষে বিষাদ। চম্পাকলি ফুটলো না। নাজিয়ার নাচন বন্ধ। ওসমানের হায় হোসেন দশা। কন্যা চম্পা-কলির হাউ মাউ কাঁদনেও যখন কেউ এগিয়ে এলোনা, মেজর ওসমান তখন অচঞ্চল স্থিরমান। এবার নাজিয়ার তাজিয়া। ওসমানকে দাবড়িয়ে নাজেহাল করে ছাড়লেন। স্বামী ও শিশু কন্যা দুটির হাত ধরে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালেন। পেছনে পড়ে রইল তাঁর সংসারের যাবতীয় বেসাত।

সে রাতেই ঘর ছেড়ে সবাইকে নিয়ে হোটেলে উঠলেন নাজিয়া। লাহোরের রুবি জুয়েলার্সে হাতের সোনার বালা বেচে অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা যোগালেন। টুরিস্ট ক্লাসের স্থলে ১ম শ্রেণীতে কলম্বো ঘুরে ৬ ফেব্রুয়ারি স্বামী-কন্যাসহ সগৌরবে পদার্পণ করেন নাজিয়া, স্বপ্নের শহর ঢাকা।

ঢাকার লাল আসমান দেখে বেচইন ওসমান। দর্পিতা নাজিয়া গর্বিতার মতো চলেন। রাশভারি ওসমান নাজিয়ার উড়ন্ত ভাসমান আঁচল ধরে চলমান। স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে এসেছেন বাংলায়। না হলে যে কি হতো ভেবে শিউরে ওঠেন তিনি।

চুয়াডাঙা গমন ঃ ১৮ মার্চ ১৯৭১। সপরিবারে কর্মস্থলে চুয়াডাঙা পৌছেন ওসমান। পাকিস্তানি সম্পদের মধ্যে অন্তরালবর্তিনী নাজিয়ার চেষ্টাতেই তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদ গাড়ি করাচি-চট্টগ্রাম হয়ে চুয়াডাঙা পৌছে ২০ মার্চ ১৯৭১।

২৫ মার্চ ১৯৭১। চুয়াডাঙা ইপিআর ৪র্থ উইংয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার বুঝে নিলেন ওসমান। ইপিআররা প্রথমবারের মতো পেলেন তাদের বাঙালি কমান্ডার। চতুর্দিকে বিপুল শিহরণ, উল্লাস। দম্পতি ও তাঁদের কন্যা দু'টিকে দেখে চেনার জো নেই বাঙালি না আপ-কান্ট্রির অবাঙালি। জবান খুললে বমাল প্রমাণ হয় চোস্ত বাঙাল। ভাঙা উর্দু বোলচালেও তাঁরা সমান পারঙ্গম। অনেকদিন পাকিস্তানে থেকে পরিবারটি বাঙাল-অবাঙাল বোলচালে সমান সামাল।

সপরিবারে চুয়াডাঙার ডাক বাংলোয় উঠলেন ওসমান। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সময় নিষ্ঠ ওসমানের সময়ের ব্যত্যয় ঘটে। নাজিয়ার প্রতি নজরের তাঁর সময় নেই। ডাক বাংলো থেকে একাধিক ইতত্তেলা পাঠান নাজিয়া। ব্যাটম্যান পাঠান, স্যারকে খেতে আসতে বলো।' পিতাগত প্রাণ চম্পা-কলি মেয়ে দুটিও বাপকে ছাড়া খাবে না। খাবার ছোঁবেও না। চম্পা-কলি চুপসে যায়। নাজিয়ার অসহ্য। অভিমানিনী এবার বাসন্তি রঙের শাড়ি পরলেন। ঘোমটা টেনে দিলেন মাথায়। আঁচল জড়ালেন কোমরে মাজায়। ঘোমটার ফাঁকে সামনে থেকে মুখের সামান্য মাত্র নজরে আসে। হাতের কবজি থেকে দু'গাছি সোনার চুড়ির নড়াচড়া যেন বিদ্যুৎ চমকায়। দর্পভরে পদানত বজরের বজরপানি সৌধামিনী বালা ধাবমান। চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি ধরণিরে করি ক্লান্ত। পা নজরে আসে না। লেডিজ স্যানডেলের চটচট সঘন আওয়াজে চারপাশ প্রকম্পিত। স্যান্ডেলের জড়ির চুমকি প্রভা ছড়ায়। এমনিতে তিনি গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট নিটোল স্বাস্থ্যের মোটাগাটা সুন্দর সুশ্রী কমনীয় চেহারার মহিলা। তাঁর রঙটা যেন সাদা পেঁজা তুলার মতো। রাগলে তিনি আপেলের মতো রাঙা টুকটুকে রক্তিম লালচে হয়ে যেতেন। এবার রাগিনী রেগে এগিয়ে আসছেন। রাস্তার মানুষ অবাক। সৈনিকরা তটস্থ। বাঙালি অফিসারের স্ত্রী রাস্তায়। মাথায় ছিটটিট নেই তো!! সাধারণ মানুষও সৈনিকদের সশ্রদ্ধ সালামের সপ্রতিভ স্বীকৃতি দিলেন সামান্য হাত উঠিয়ে, মাথা নেড়ে সলজ্জ মুচকি হাসির মিষ্টি আভা ছড়িয়ে। কর্মব্যস্ত ওসমান। সর্বত্র সবাইকে কাজ বুঝিয়ে অফিসে এলেন। বিরামহীন ব্যস্ততায় অফিসার, জেসিও, এনসিওরা কাজ বুঝে নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও। হাঁকলেন কোই হ্যায়। কেউ এলো না। বেঁটেখাট ফর্সা সুন্দর চেহারার ওসমান রাগলে তাঁর নাক-কান-চোখ-গাল লালে লাল। যিনি এবার এলেন তাঁকে দেখে আনচান ওসমান একদম শান। নজরে এলো তাঁর প্রিয়তমা নাজিয়া। চল যাই খাই গিয়া। পরে

হবে কাজ। নাজিয়ার হুংকারে কিছুক্ষণ পর ডাক বাংলোয় টেলিফোন লাগলো। ওসমান হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

হানিমুনে কুষ্টিয়া ঃ আজকের দিনটি মাটি করতে নাজিয়া নারাজ। আজকের মধুযামিনী অবিস্মরণীয়। ফুলশয্যার রাত। পূর্বাহ্নেই ওসমানকে নিয়ে জয় বাইতে ধাবমাণ। নিজেদের কর্মক্ষেত্র মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ঘুরে অপরাহ্নে ফিরবেন চুয়াডাঙা। নিজেদের গাড়িতেই চললেন। সাথের গাড়িতে ইপিআরের সশস্ত্র গার্ড। কুষ্টিয়ার ডাক বাঙলোকে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করার নির্দেশ পাঠালেন। পথে বিধি বাম। একাধিকবার গাড়ি বিকল হলো। পথের বাধা ডিঙিয়ে মধ্যাহ্নের স্থলে সন্ধ্যায় পৌছুলেন কুষ্টিয়া। দুপরের খাবারই রাতে খেলেন সবাইকে নিয়ে। গাড়ির সাথে জুড়ে নিলেন অচল ঠেলা গাড়ি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত কুষ্টিয়ার ডাক বাঙলোয় কাটালেন নাজিয়ারা।

মধুকে যামিনী শক্তি সাহস সঞ্চয়ের উদ্ভাবনে কাটালেন নাজিয়া। সারা রাত নামাজ, দোয়া-দরুদ ও সেজদায় কাটালেন। আমার এই সোনার মিছিলে 'শক্তি সাহস দিয়ো' প্রার্থনার জায়নামাজে রাত কাটলো।

অবরুদ্ধ কুষ্টিয়া ত্যাগ ঃ ২৬ মার্চ ১৯৭১। স্থান কুষ্টিয়া। অবস্থান ডাকবাঙলো। সময় সোবহে সাদেক কাক ডাকা ভোর। টেলিফোন ওঠালেন ওসমান। সব ভেত। চারদিকে গুলির আওয়াজ। দরজা খুললেন। রাস্তায় পাকিস্তানি আর্মির সঘন, সদম্ভ, দৃপ্ত চলাচল। মেঘাফোনে কার্ফিউ ঘোষণা। জয় বাংলার পতাকা নামিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। উড়ানো হচ্ছে পাকিস্তানি-পতাকা নাপাকিস্তানি বাংলায় উঠছে। কুষ্টিয়াবাসী গৃহবন্দি। গুলিবিদ্ধ বাঙালি পাকিস্তানি-জনতার হাতে অজান্তে মরছে। তারা জানলো না কি তাদের অপরাধ। জয়বাংলার গানে পরাজয় মানলো বাঙালি। লালনের কুষ্টিয়া। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' গান গাইতো কুষ্টিয়াবাসী। তারা বুঝলো তাদের কুষটির চেনা প্রাণটি অচীন দেশে কিভাবে উড়ে যাচ্ছে। সোনা সোনা সোনা, তার চেয়ে খাঁটি সোনা বাংলার মাটিরে। বাংলার নিরস্ত্র দামাল ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে বেসামাল। এমন অভাবনীয় নারকীয় বীভৎসতার জন্য কেউ তৈরি ছিলো না। সোনার পাখিরা ছটফট করে বেঘোরে মরছে। জয় জয় জয়, বাংলার জয়'। হায় হায় আজ একি তার পরাজয়। অবাক চোখে চাওয়া আনল ফাগুন হাওয়া। বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্থির অঞ্চল নাজিয়া সব দেখলেন। ডাক বাঙলোর রাস্তায় পাকিস্তানি-সৈনিকদের আনাগোনার সঠীক সময় নিরুপণ করলেন। আবার ভিতরে এলেন। বরাভয়ের কাছে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলেন। নিজেই ইপিআরদের গাড়ি জুড়তে কঠোর নির্দেশ দিলেন। অচল গাড়ি সাথে বেঁধে নিতে আদেশ দিলেন। ওসমানকে রা করার সুযোগ না দিয়ে সবাই গাড়িতে উঠলেন। আল্লাহকে স্মরণ করে এক ফাঁকে কুষ্টিয়া ছাড়লেন, চুয়াডাঙার

উদ্দেশে। ইউনিফরমের ইপিআরদের দেখেও পাকিস্তানি আর্মি নিশ্চুপ রইল কেন তা রহস্যময় রয়ে গেলো। সম্ভবত সাথের জেনানাকে অবাঙালি ভেবেই তারা ছেড়ে দিলো।

ঝিনেদার জন-জোয়ারে নাজিয়া ঃ পথের উত্তাল জন তরঙ্গ সম্ভ্রমে ও অভয়ে তাঁদের রাস্তা ছেড়ে দিলো। কাফেলা ঝিনেদা পৌঁছুলো। শহরের কেন্দ্র পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি এলো। নাজিয়া দেখলেন জয়বাংলা দীপ্ত পতাকার সগৌরব সঞ্চালন। অশান্ত উন্মত্ত জনতার যুদ্ধংদেহী প্রস্তুতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিলেন। জনতা সভয়ে সরে যেতে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। ওসমানের সুপ্ত পৌরুষ মোহিনী মায়ার যাদুতে প্রদীপ্ত শিখায় জাগিয়ে তুললেন। জনতার হাতে প্রিয়তমকে ছেড়ে দিলেন।

বিশুষ্ক কণ্ঠ ওসমান জনতার কাছে এক গ্লাস পানি চাইলেন। প্রথম আবেদন তিনি শুদ্ধ বাংলায় জানালেন। পরে ডানহাতের সকম্প আংগুলি অর্ধবৃত্তাকার করে নিচ থেকে উপরে ঠোঁটের দিকে ওঠালেন। জনতা প্রথমে হতবাক। দেখতে সাহেবের মতো। খাস ইউপি ও পাঞ্জাবির মতো মালুম লাগে। আবার বাংলায় কথা কয়। জনতার হতচেতন ভাব কাটতে বেশিক্ষণ লাগেনি। কয়েকজন ডাব আনতে ছুটতেই তিনি নিষেধ করলেন। সুইট হোটেলের দিকে তিনি শুধু এক গ্লাস পানির ইঙ্গিত করলেন। সুন্দর ঝকমকে গ্লাসে পানি আসলো। তিনি পান করলেন। এদিকে রে রে হারে রে বাঙালি ইউনিফরম পরা মেজর। সাথে লাল টুকটুকে বউ বাচ্চা। ইপিআরের হাতে রাইফেল। মেজরটা রাগে না। গুলির হুকুম দেয় না। সৈন্যরা চুপচাপ। ধমক ধামক দেয় না। চোখ রাঙায় না। অস্ত্র নাচায় না। মেজরের চেয়ে বেগমের দিকে জনতার নজর বেশি। গাড়ির ভিতর যেন টকটকে রক্ত পদ্মের আভা ছড়ায় নাজিয়া। অপূর্ব ধৈর্য ও স্থির গাম্ভীর্যের প্রশান্ত মায়াময় চোখে জনতার দিকে চাইতে সবাই হতবাক। তাঁকে বেশ গ্রেসফুল ও ম্যাজিসটিক দেখতে। জনতার অবাক বিস্ময়। হায়রে মরণের যজ্ঞবেদিতে এ কোন বাঙালি মহিলা। সব অবলা খোঁজে কোন নিরালা। আর এ কোন বরাভয় দিতে এলো অভয়। সভয়ে একজন দুজন গাড়ির দিকে এগিয়ে পিছিয়ে যায়। সৈন্যরা কেউ কিছু বলে না। জনতার দ্বিধা ক্ষণিকে কেটে গেলো । আদ্যাশক্তিরূপিনী নারী, প্রেমপাত্রী, বরাভয়দাত্রী নাজিয়ার সলাজ অপলক নীরব চোখে চোখাচোখি হতেই সুগত আগ্নেয়গিরির ওসমান এবার স্কোটমান। ব্যাসতিল দুর্গ ভাংতে জনতার অধীর প্রতীক্ষা। তার চেয়েও শক্তিমান যশোর ক্যান্টনমেন্ট সেখান থেকে মাত্র ২৫ মাইল। নেতৃশূন্য জনতা যেন কোন মহানায়কের উপস্থিতি মনে প্রাণে কামনা করছিলেন। মহাসমুদ্রের শতবর্ষের গাম্ভীর্যের নীরবতা ভেঙ্গে জনতার উদ্দেশে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন ওসমান। "ভাইসব এদিকে আসেন" বলতেই হাজার হাজার উৎফুল্ল জঙ্গি জনতার বেষ্টনি জেঁকে ধরলো ওসমানকে।" আপনারা জানেন কি হয়েছে। কুষ্টিয়াতে লোক ঘরে বন্দি। কি হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারছেন সবই। আপনারা কি আমাদের সাথে থাকবেন?" মহাসমুদ্রের মহাকল্লোল শুরু হয়ে গেলো। লক্ষ জনতার গগন বিদারি

সগর্জন অভিনন্দন নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার। চেতনের ঐ কেতন উড়ে কাল বোশেখি ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। মেঘগর্জনসম মহারবে জয়বাংলা ধ্বনি মহাসমুদ্রের উত্তাল জলোচ্ছ্বাসের ফেনিল আনন্দ উদ্বেল জনতা এ যুগের সপ্তর্ষী মেঘনাদকে নেতৃপদে বরণ করে নিলো।

জয় তু মহারানী ঃ বাতাসের আগে খবর ছড়িয়ে পড়লো দিকবিদিকে। ঝিনেদার চারপাশে খবর রটে গেলো সংগ্রামী নায়ক এসেছেন। ধর হাতিয়ার হও আগুয়ান। অবরুদ্ধ কুষ্টিয়াতে সে সংবাদ আশার আলো জ্বাললো। মাগুড়া, মেহেরপুর, যশোর, খুলনায় সমর নায়কের আগমন সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ইয়া আলির তান্ডব নৃত্যে জনতা প্রচণ্ড করতালির জয়বাংলা ধ্বনিতে নাজিয়াদের ঘিরে আছে। জনতার ভিড়ে গাড়ি চালায় কার সাধ্য। সোনার হাতের সোনার কাঁকন নড়ে উঠলো। নাজিয়া গাড়ির বাইরে হাত বের করলেন। সবগুলি আঙ্গুল প্রসারিত করে চুয়াডাঙ্গার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। গাড়ির সামনের দিকের ভিড় যাদুমন্ত্রের ছাফ হয়ে গেলো। জনতার মধ্যে শিহরণমূলক চাঞ্চল্য। জয়বাংলার সাথে ভেসে এলো জয়তু মা রানী, জয়তু মহারানী। সিঁদুর পরা মহিলারা উলুধ্বনিতে মা রানীর বিদায় শুভাশীস মাঙলো। চুয়াডাঙার পথে পথে একটার পর একটা পথের ব্যারিকেড জয় তু মহারানীর মঙ্গল ঘন্টা বাজিয়ে সরে গেল। রসিক ছোকরাদের সরস মন্তব্য, "বেটি দেখিয়ে গেলো। দেখলি একটা কথাও না বলে চমক দিয়ে কাজ হাসিল করে নিলো, সাবাস বেটী, দেখা যাবে তোর মুরদ কত!! "জনতার রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে খামুশ ছোকরারা চুপসে গেলো। ভিনি-ভিতি-ভিসি এলেন, দেখলেন, জয় করে গেলেন।

বিজয়িনীর চুয়াডাঙা প্রবেশ ঃ রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণদের দলিত মথিত করে অবরুদ্ধ লংকাপুরীতে স্বামী সান্নিধ্যে প্রমিলার প্রবেশের চেয়েও এ যে ভয়ংকর। অবরুদ্ধ কুষ্টিয়া থেকে স্বামী সন্তানসহ দুস্তর বাধা ডিঙিয়ে এলেন। অসাধ্য সাধন করলেন প্রমিলা। বিজয়িনী ২৬ মার্চ বেলা ১ টায় চুয়াডাঙা পৌঁছলেন।

নাজিয়া ভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঐতিহাসিক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন ওসমান। বেসামরিক নেতৃবন্দের সহযোগিতায় শুরু হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। কারো সাথে যোগ নেই। ঢাকা, চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও যোগাযোগ নেই। আত্মশক্তি ও জনতার মনোবলে বলীয়ান সম্পূর্ণ একাকি মেজর ওসমান। এ বীরোচিত বিদ্রোহের বিচারের ভার অনাগত ইতিহাসের হাতে রইলো। এ-বিদ্রোহের নেপথ্য নায়িকা নাজিয়া ওসমান।

২৬ মার্চ ১৯৭১। স্থান ইপিআরের ৪র্থ উইং হেডকোয়ার্টার কোয়ার্টার গার্ড। বিপুল জনতা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমান। পড়ন্ত বেলা। দুরন্ত ইপিআর বিউগল বেজে উঠলো। পাকিস্তানি পতাকা নামলো স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়লো। ইপিআররা পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য, পবিত্রতা ও মর্যাদায় ফৌজি সালামে পতাকাকে বরণ করেন। সবার অলক্ষ্যে পুরো অনুষ্ঠানে অদূরে দণ্ডায়মান নাজিয়া। পতাকা উঠছে,

নাজিয়ার হাতও উঠছে। দুহাত তুলে বুকভরা আকুতির মোনাজাতে বিদায় নিলেন নাজিয়া। রুদ্ধ ধ্বনি-শ্বাসের আকুলতায় পুরা ইপিআর লাইন চঞ্চল। এবার রণরঙ্গিনী লক্ষীবাই সৈনিকদের সামনে এলেন। ডাব কেটে সৈনিকদের দিলেন দু'হাতে। বিদ্যুৎঝলকের মতো আভা বিস্তার করে সৈনিকচিত্ত জয় করলেন। ফোলডিং চেয়ারে বসে সব কিছু তদারক করলেন। সৈনিকদের চা পরিবেশন করলেন। খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন। গর্ব, আনন্দ ও উৎসাহে সৈনিকরা এ মূর্তিমতী বীরাঙ্গনা সখিনাকে আপন করে নিলো।

রণক্ষেত্রে সনাগশিশু নাগিনী ঃ কুষ্টিয়া চুয়াডাঙা রণাঙ্গণের প্রাথমিক বিভীষিকাময় দিনগুলিতে যে বীরাঙ্গনা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত তিনি নাজিয়া ওসমান। পুরুষ শাসিত বঙ্গে তাঁকে বাদ দিলে নারী জাতির প্রতি চরম অবমাননা করা হবে। বঙ্গ ললনাদের অবদান খাটো করে ইতিহাসে নিজেরাই মসি লিপ্ত হবো। বাস্তবের উজ্জ্বল সত্যকে চাপা দিলে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও বিকৃত থেকে যাবে। বিদ্রোহ করেই ওসমান স্ত্রী নাজিয়াকে দূরে সরাতে চান। ভারতের সাথে যোগাযোগের পরপরই তিনি স্ত্রী নাজিয়াকে নিরাপদ দূরত্বে পাঠাতে চাইলেন। অনেক সুহৃদই ওসমানকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিলেন। সকলি গরল ভেল। নাজিয়ার ব্যক্তিত্বের নিকট ওসমান হেরে গেলেন। সৈনিককে দূরে সরিয়ে যেমন সেনাপতি যুদ্ধ করতে পারে না। বীরাঙ্গনা নাজিয়াকে দূরে রাখাও ওসমানের পক্ষে সম্ভব হলো না।

যুদ্ধে তরুণ অফিসারদের নিয়ে ওসমান দারুণ বিপাকে পড়েছিলেন। অফিসারদের মধ্যে দুজন মাত্র বিবাহিত। একজনেরই মাত্র সন্তান ছিলো। ফলে সরস কল্পনার রোমান্টিক আবেগ নিয়ে তাঁরা গোঁৎ গোঁৎ ও খোঁৎ খোঁৎ করতেন। স্ত্রীর স্বামীর নিকট সান্নিধ্য কামনার, বিপদে ছায়ার মতো পাশে থাকার বাস্তব মানবিক দিক অফিসারদের উপলব্ধিতে ছিলো না। বিপ্লবী সখিনার রণাঙ্গনে স্বয়ং উপস্থিতি ও নেতৃত্ব গ্রহণের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া অফিসারগণ তাৎক্ষণিকভাবে সুনজরে দেখেননি। ছাত্র-জনতা জেসিও, এনসিও এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে নাজিয়ার উপস্থিতি ব্যাপক শিহরণ ও আনন্দের সঞ্চার করেছিলো। মাতৃরূপিনী নাজিয়া অনেকের দুঃখ দৈন্য দূর করে মনোবল চাঙা রেখেছিলেন। নাজিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়বেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সকল দুঃখ দৈন্য তিনি হাসিমুখে বরণ করলেন। ১৮৫৭ এর বিপ্লবে সম্রাজ্ঞী জিনাতমহল বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন। এবার হরপার্বতীর মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগ হলো। বিদ্রোহী ওসমান আর মাতঙ্গিনী নাজিয়ার রণক্ষেত্রই হলো সংসার। নাগিনী কন্যা দুটিও কম যায় না। চম্পা-কলি নাগশিশুরাও বোমাবাজিতে ফোঁস ফোঁসায়। ৬ বছরের কলির বাঁশের কঞ্চিতে জয়বাংলার পতাকা উড়িয়ে উল্লাস জুড়ে নৃত্য। মাসুম বাচ্চার সে লাস্যময়ী ভঙ্গিমা ফরাসি টেলিভিশন কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ দল তাঁদের স্মৃতিপটে জীবন্ত করে রাখতে ভুলেনি।

চুয়াডাঙার টেকটিক্যাল সদর দপ্তরের স্বল্প পরিসর একটি রুমে সকন্যা নাজিয়া রয়ে

গেলেন। নাগিনী ও নাগ কন্যাদের ইস্পাত দৃঢ় প্রতিভার কাছে সকলের সব জারিজুরি হার মানলো। কেউ কখনও নাজিয়াকে কাজ দেয়ার সুযোগ পায়নি। ঠিক সময়ে নিজের থেকে তাঁর সুযোগ্য কাজটি তিনি বেছে নিতেন। সে কাজের সুষ্ঠ সমাধানে সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পেতেন। অতিকথনের নামে তাঁকে খাটো করা হবে। সরাসরি কামান বন্দুক চালিয়ে তিনি যুদ্ধ করেননি। পিস্তল তাঁকে খুলতে জুড়তে দেখেছি। অপূর্ব কৌশলে আঁচলে তিনি ছোট চায়না পিস্তল গুঁজে রাখতেন। সম্ভবত সে সত্য অনেকেরই অজানা। নাজিয়ার নির্দেশে চুয়াডাঙার আপামর জনগণ বিপুল পরিমাণ চাল ডাল হাজির করেন। সে রসদে মুক্তিসেনা ও তাদের পরিবারের কয়েকমাস স্বচ্ছন্দে কেটেছে। তাঁরই আহ্বানে চুয়াডাঙাবাসী সৈনিকদের প্রয়োজনে ডাব-নারিকেল, চিড়া, গুড় মুড়ির পাহাড় বয়ে আনেন। ট্রাকে ট্রাকে সে সব আসতো। ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি ও কাঁধে-ভারে বয়ে আনার প্রসঙ্গ বাদই দিলাম। এ সবই আসতো স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাদানরূপে। উন্মুক্ত রণক্ষেত্র ও পরিখায় সৈনিকেরা নাজিয়ার পাঠানো ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। পশ্চাতে ফেলে যাওয়া প্রতিটি সৈনিক পরিবারের খোঁজ-খবর, আর্থিক সাহায্য, ঔষধ-চিকিৎসা, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা তিনি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় করেছিলেন। গৃহিনী হলেন ঘরনি, ভাঁড়ার ঘরের ভার নিলেন। তিনি রিয়ার কোয়ার্টার মাস্টার। সদর দপ্তরে বহুবিদ কাজে স্বামীকে সাহায্য করতেন নাজিয়া। এ ছাড়াও সামরিক-বেসামরিক অনেক অফিসারের কাজ তিনি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে করে দিতেন। অস্ত্র-শস্ত্র, এমুনিশন ও সৈনিক পরিসংখ্যান তিনি নির্ভুলভাবে রাখতে পারতেন। বাংকারে সংকটাপন্ন অবস্থায় ঔষধ ব্যান্ডেজ ইত্যাদি তিনি নিজে বয়ে নিতেন। সকল সৈনিক সম্মুখ সমরে চলে গেছে। পশ্চাতে সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের রক্ষার কেউ নেই। তিনি নিজেই পরিখার মুখে পাহারা দিয়েছেন। পরিখা থেকে পরিখায় সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। শত্রুর বিমান হামলায় ত্বরিৎগতি মাটিতে পজিশন নিতেন। এয়ার স্ট্রেপিংয়ে পরিপূর্ণ শৃংখলায় ঝটিতি ঝংকারে মাটির শয্যায় পজিশনে যেতেন।

পুরো যুদ্ধে তিনি বিরক্তি ভুলে ছিলেন। হাসিমুখে থাকতেন। রাগতেন ঠিকই। তবে তা নীল রক্তের আভিজাত্য। সে রাগ বেশিক্ষণ থাকতো না। বেনাপোলের রণক্ষেত্র। রাত দু'টা বাজে। শ্রান্ত ক্লান্ত ক্যাপ্টেন তৌফিক ও ক্যাপ্টেন সফিক নাজিয়ার স্বল্পপরিসর রুমের কড়া নাড়লেন। ওসমান তখন রণক্ষেত্রে। ঝটিতি উঠলেন। দরজা খুলেই রণক্ষেত্রের খবর নিলেন। আহত ও নিহতদের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থা জানতে চাইলেন। চেহারা দেখেই খাবার ব্যবস্থার জন্য স্টোভ জ্বালালেন। নিষেধ করেও লাভ হলো না। কিছুটা গরম পানাহার করে বসেছি। হঠাৎ ছোট্টমণি চম্পার ঘুম ভাঙলো। মেয়েটি উসখুস করছে। বদনায় হাত দিয়ে ছটফট করছে। নিঃসন্তান ও বেচেলর অফিসারদের নিয়ে বেগম ওসমানের হলো জ্বালা। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "ভাইয়া আপনারা একটু বাইরে যান, মেয়ে বদনায় পেশাব করবে।" দিনের পর দিন এভাবে সকলের কত অত্যাচার যে নাজিয়া সয়েছেন সে এক অকথিত ইতিহাস।

ঝিনেদা হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত ক্যাপ্টেন প্রফেসর চুয়াডাঙা পৌছুলেন। প্রথম সাক্ষাতেই নাজিয়ার প্রশ্ন, "প্রফেসর সাব আপনার স্ত্রী কোথায়?" প্রফেসরের বিরস জবাব, "জানি না।" এক অচেনা অদেখা দুঃখিনীর ব্যথায় তিনি হাহাকার করে উঠেছিলেন। ১৯৭৫ সালে কোরবানির ঈদের রাতে কুমিল্লাতে সে পুরনো তুচ্ছ ঘটনার তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

বিজয়িনীর প্রতি সশ্রদ্ধ তাজউদ্দিন

"রাজা করিছে রাজ্য শাসন, রাজাকে শাসিয়ে রানী,
রানীর দুঃখেতে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যতো দুঃখ গ্লানি।"

অমিততেজা বীর্যবতী নাজিয়ার কার্যকলাপ তাজউদ্দিন সাহেবের অনুভূমিতে আলোড়ন তোলে, "বোন আপনার মতো সমস্ত বাঙালি মা-বোন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার মতো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো তা'হলে এদেশে আর কিচ্ছুর অভাব হতো না, স্বাধীনতা লাভেও বিশেষ বেগ পেতে হতো না।" বিগলিত নাজিয়ার উদ্বেগ, "বৈদেশিক স্বীকৃতি না পেলে আমাদের কি উপায় হবে।" দূরদর্শী তাজের সান্ত্বনার আশ্বাস, "কিছু চিন্তা করবেন না বোন, অল্প দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাংলা নিহি ছোঁড়েংগি ঃ সুলতানা রিজিয়া উপমহাদেশের ইতিহাসে বিদ্যুৎকন্যার মতোই জ্যোতির্ময়ী। ১৮৫৭-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে উপমহাদেশ অবাক বিস্ময়ে দেখেছে রণরঙ্গিনী লক্ষ্মীবাইকে। 'মেরা ঝাঁসি নিহি ছোঁড়েংগি'র উন্মাদনায় তিনি সৈনিকদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন দেখেছে কালনাগিনী ভুজংগিনী নাজিয়াকে। মুক্তিদের প্রাথমিক সাফল্যে চুয়াডাঙা শীর্ষদেশে। চুয়াডাঙার সদর দফতর থেকেই পাকিস্তানের গৌরবদীপ্ত ব্যাটালিয়ান ২৭ বালুচকে নিশ্চিহ্ন করে জয়মাল্য ছিনিয়ে আনা অস্ত্রের সগৌরব প্রদর্শনীতে বিশ্ববাসী হতবাক। ১০ এপ্রিল, ১৯৭১। গঠিত হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিদেশের মাটিতে তর্জন গর্জন ফাটা বাঁশের মতো শোনায়।

"আঁরা চাটগাঁইয়া জোয়ান
বাহুদি ঠেয়াই দৈরার ঝড় তুফান।"

কিন্তু পাকিস্তানি তুফানকে নিপাত করা গেলো না। বঙ্গ-শার্দুলরা পানি দেখে দুলদুলের মতো পিঠ টান। সিলেটি টিলা নির্জন ভিলা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্রহ্মাস্ত্র আর ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ করলো না। ময়মনসিংহের সিংহ 'জঙ্গল-বাওড়-শিং'-এ তিন নিয়ে ময়মনসিংহের কোথাও তিষ্ঠাতে পারলো না। মধুপুরের গড় থেকেও সব সর সর। রইল বাকি চুয়াডাঙা। বঙ্গ শৌর্যের শেষ অধ্যায়। অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

ঢাক-ঢোল যতোই বাজুক রাজনৈতিক ডামাডোলে বিজয় সংহত করা যাচ্ছে না।

চুয়াডাঙার সগৌরবই তার পতনের কারণ। নির্বাক বাঙালির সবাক প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রজ্জ্বলন্ত জীবন্ত দৃশ্য ফরাসি টেলিভিশনের মরণপণ দুর্বার সটে প্রথমবারের মতো অবাক বিস্ময়ে দেখলো সারা বিশ্ব। বীর জাতি ফরাসিদের আমরা সালাম জানেই। বিচারপতির বিচার ভুল হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মরণজয়ী দৃশ্য টেলিভিশনে দেখে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী। সর্বস্তরে মিলে চুয়াডাঙা হলো পাকিস্তানি বোমারু বিমানের নিশ্চিত লক্ষ্য। সাদা চামড়াদের নিখুঁত সংবাদের প্রচারে জঙ্গি বিমানের অব্যর্থ টার্গেটে এলো চুয়াডাঙা। এসব বৈশাখি ঝড়ের পৈশাচী নৃত্যে স্থির অঞ্চল নাজিয়া চুয়াডাঙাতেই আছেন। বোমার লক্ষ্য স্থল ওসমানের হেডকোয়ার্টার। বোমা পড়ছে। ঘর পুড়ছে। আগুন জ্বলছে। লণ্ডভণ্ড প্রচণ্ড ঝড়ে দিকবিদিক একাকার। ঝটপট মাটিতে শুয়ে পড়েন, বাংকারে প্রবেশ করেন সৈনিকের সাহস ও উন্মাদনায় কাজ করেন। জীবন মৃত্যু পায়ের নৃত্য। নাগকন্যা চম্পা-কলিরা 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে'র সৈনিক উৎসাহে জেগে আছে। মৃত্যু বিভীষিকার রঙ্গমঞ্চ থেকে নায়িকা নাজিয়াকে সরানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী, সৈন্য, রণক্ষেত্র ছেড়ে তিনি যাবেনই না। আহতদের শুশ্রূষায় তিনি প্রতিশ্রুতা। চুয়াডাঙা তিনি ছাড়বেন না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায় যোজনা করে কিংবদন্তীর মহানায়কে পরিণত হলেন মেজর ওসমান। মরলোকের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অমর আলোর বিচ্ছুরণ এলো। অবিস্মরণীয় নায়িকা নাজিয়া চিরপ্রতাপময়ী আভা বিস্তারে এ-বিজয়ের সর্বত্র জড়িয়ে ও ছড়িয়ে আছেন। নিকট সান্নিধ্যের কার্যকারণ অকুলস্থ দর্শনের বিচার ছাড়া তাঁর অবদান বিচার করা যাবে না।

বাংলার মাটিতেই অস্থায়ী সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। বিজয়ী ওসমানের বিজিত রাজ্যেই সে স্থান নির্ধারিত হলো। ওসমানের বিজয় সংকুচিত হচ্ছে। যশোরের অবরোধ মুক্ত করে ঝিনেদা কুষ্টিয়া ছিনিয়ে নিয়েছে পাকিস্তানি আর্মি। বিমানে ও জমিনে তারা মরণপণে ধেয়ে চলেছে চুয়াডাঙা পানে। ওসমানের সদর দফতর ১৬ই এপ্রিল মেহেরপুরে স্থানান্তরিত হলো। প্রতিকূল অবস্থায় সস্ত্রীক ভারতের মাটিতে ওসমানের পা রাখা টের পেয়েই নাগশিশুরা ফোঁসায় ভুজংগিনী গর্জায়, 'মেরা বাংলা নিহি ছোঁড়েংগি।' বিদেশে তিনি অসহায় ফিল করেন। সহায় সম্বলহীন বাংলার মাটিতেই তিনি শেষ অবলম্বন চান। গৌরবের আবরণ কান্নায় ফিরে এলেন বাংলায়। অসহায় ওসমান গাড়ি দিয়েও পার পেলেন না। শিশুকন্যাদের হাত ধরে ভৈরবী ভৈরব নদী পার হলেন। ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করেই যেন ইছাখালির ভাঙা বিওপিতে ভাঙা পাতলেন। ইছাখালি ভাঙা ঘরে আছে বিছা, মশা, লাল পিঁপড়ার আস্তানা। বিছানাপত্রের কথা এই বাহ্য। শোবার যায়গাই নেই। দুঃখের সাগরে নেমেছি, 'সাগরে শয়ন যার শিশিরে কিবা ভয়।' নিরাভরণ ধরণিতেই রমণী করেন রজনী যাপন। সৈনিকদের আপসোস। হায় হায় হায়রে বেগম সাহেবার এ-দশা। সকালের আগে ব্যাপারটা তারা টের পাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন তিনি কয়েকশ' গজ দূরে পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বঙ্গের কোনো ডাক বাংলোয়

আছেন। সকলেই তো তাঁদের গাড়িতে যেতে দেখেছেন। সৈনিকদেরই মাঝে এমন অনাদর অযত্ন অবহেলায় মাটির শয্যায় রাত কাটালেন অফিসারের স্ত্রী। তাও সাথে মাসুম দুটি বাচ্চা। হায়রে এমন সোনার বরণীর নরম শরীর তো তুলতুলে বিছানা ছাড়া থাকেনি। হাবিলদার মেজর সুযোগ পেয়ে দিলো দাবড়ানি। শালারা দেখস কি। কাঁই কুঁই খাঁই খুঁই রাখ। না পাওয়ার বেদনা-আরাম, নাওয়া-খাওয়া, চা-নাস্তা ভুলে সবাই হতবাক নিশ্চুপ। ভাঙ্গা কেল্লায় উড়া নিশান। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। চল চল মুজিবনগর।

অভিষেক অনুষ্ঠানে নাজিয়া : 'বাজল কিরে ভোরের শানাই নিদমহলার আঁধার চুড়ে'। হাবিলদার মেজরের বাঁশি বাজলো। পূর্ব গগনে হতেছে নিশি ভোর। ধরণি তলে ভাঙে ঘুমঘোর। ১৭ই এপ্রিলের নবারুণ রাগে নিদ্রিত ধরণি জাগে। পূর্ব গগনের নিশ্বনের ভাঙে স্বপন। পাল তুলে দাও বাধা ওড়াও সিন্দাবাদ। উদীয়মান নবীন পতাকাকে উষ্ণ অভিনন্দনে বরণ করতে সবাই ছুটে চলে।

বৈদ্যনাথ তলায় বাদ্য বাজে। মেহেরপুরের পাশে আম্রকুঞ্জ। বাঙালির আশার নিকুঞ্জ। নতুন সরকারের অভিষেক। ক্যাপ্টেন প্রফেসর যাত্রা পথেই অযাত্রায় পড়লেন। কলেরায় আক্রান্ত ছাত্র-যোদ্ধাদের নিয়ে ছুটলেন ভারতীয় হাসপাতালে। সংগ্রামী ওসমানের মাথায় ঘুরে হতোদ্যম সৈন্যদের ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধের প্যাঁচ। দর্শকরা এসে গেছেন। নাট্যমঞ্চের পর্দা উঠেছে। আসল হিরো হিরোইন নেই। মূল নায়ক-নায়িকার প্রতীক্ষায় দর্শকদের চটিয়ে ভাঙচুর মারপিটের আশংকা। উপনায়ক কুশীলবরা মঞ্চে এসে সামাল দিলেন। সেনাপতির আগেই সম্রাটের আগমন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন দেশ-বিদেশের শতাধিক সাংবাদিকসহ মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। বেলা ১০টা। লোকে লোকারণ্য। কোথায় বীরকেশরী ওসমান। হায় ওসমান করে আর কি হবে? হও আগুয়ান মুক্তিফৌজ। ওসমানের শূন্যস্থান পূর্ণ করে ধন্য হলেন মাহবুব। উপস্থিত স্বল্প সংখ্যক যুদ্ধ-ক্লান্ত ইপিআর, আনসার মুজাহিদ দিয়ে প্রেসিডেন্টকে স্মার্ট গার্ড অব অনারের মাধ্যমে ডিজ-অনারের হাত থেকে সবাইকে বাঁচিয়ে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন পুলিশের এস.ডি.পি.ও. ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দিন আহমদ। নিখুঁত জীবন্ত অভিনয়ের সার্থক বাস্তবায়নে সবাইকে তাক লাগালেন মাহবুব। এ নান্দীপাঠের বন্দনা-গানে বুদ্ধি যোগালেন মেহেরপুরের এস.ডি.ও. ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী।

> "শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে মন্দমদির বাতাসে
> শতেক যুগের গীতিকা, শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকার।"

মর্মর ধ্বনির মাঝে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা ও সনদপত্র উচ্চকিত হলো। এবার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক কালজয়ী মার্চ পাস্টের আনুষ্ঠানিকতায় সরকার অভিষিক্ত হলেন। এ দুর্লভ মুহূর্তের অবিস্মরণীয় কীর্তি বাংলার

মাটিতে বাংলাদেশ সরকারকে অভিষিক্ত করে অনাগত ইতিহাসের পাতায় অমর-আসন অলংকৃত করলেন ওসমান। এ যুগান্তকারী অনুষ্ঠানে মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থেকে অর্ধেক জনসংখ্যার বাঙালি নারীদের কলংকের হাত থেকে রক্ষা করলেন নাজিয়া ওসমান। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নারীদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন আলি আজমের মা ও বোন। নাজিয়ার সঙ্গে ছিলেন তাঁর দু'টি শিশু কন্যা চম্পা-কলি।

শত্রুর হাতের ওভার-রান থেকে বাঁচাতে না পারলে অনুষ্ঠানের সবাইকে যে কেমন দৌড়ানো লাগতো তা কেউ ভাবলেন না। সাফল্যজনক অভিষেকই ওসমানের জন্য অভিশাপ হলো। গণপ্রতিনিধিরা তাঁদের যোগ্য আসনের খুঁতখুঁতানিতে বিক্ষুব্ধ হলেন। সব সামাল দিতে বেসামাল ওসমান সামরিক ও বেসামরিক দায়িত্বের অসুবিধা তাঁরা উদার দৃষ্টিতে নিলেন না। ওসমানের বিলম্বজনিত নতিজার সব দায় পড়লো নাজিয়ার উপরে। অপূর্বসাজে সেজেগুজে সাড়ম্বরে গাড়িতে করে তিনি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। স্বামী গর্বিতা নারী। তাঁকে বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর মতোই গ্লামারাস দেখাচ্ছিলো। ওসমান দম্পতির বাহ্যিক চাকচিক্য ও পোসপাস, নাজিয়ার সাজপোশাকের জৌলুস অনেক আমলা ও গণপ্রতিনিধির ভালো লাগে নেই।

গণপ্রতিনিধির পাল্লায় নাজিয়া : চুয়াডাঙ্গার গণপ্রতিনিধি ডাক্তার আসহাবুল হক ওরফে হেবা ডাক্তার। ওসমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। চুয়াডাঙ্গাকে মিষ্টি ভাষা বানাতে চাইলেন। অস্থায়ী রাজধানীর খায়েস ব্যক্ত করে নাজিয়ার হাতের পায়েস খেলেন। সাংবাদিকদের জেরায় অসাংবিধানিক তথ্য দিলেন অস্থায়ী রাজধানীর। আর যায় কোথায়! চুয়াডাঙ্গা হলো পাকিস্তানি বম্বার প্লেনের এক নম্বর ক্লিন টার্গেট। ওসমানের হেফাজতে কয়েক কোটি টাকার-সোনাদানা। যানবাহনের গাড়ি মেশুমার। বিজয়ী ও পালিয়ে আসা সৈন্যদের নিয়ে তাঁর সৈন্য বাড়ে। অস্ত্র, যানবাহন, অর্থ, সৈন্য, রসদ, জনবল সবমিলে রাজসিক কাণ্ড, বিরাট শানশওকত। দেশি বিদেশির চোখে ওসমানের গৌরব ও সম্মান অবাক করার মতো। সৈন্য হিসাব করে ব্রিগেড প্লাস সৈন্য দেখলেন আসহাবুল হক। এবার তিনি গজবুল হকের বুদ্ধি নিয়ে ওসমানকে ব্রিগেডিয়ারের র‍্যাঙ্ক পরাতে চাইলেন। উপহাসের হাসি হাসলেন ওসমান। আসহাব কাহাবি কারবার নাকি। সেনাপতি কর্নেল। আর আমি হবো ব্রিগেডিয়ার। এ ভাঁড়ামির খায়েস ছাড়ুন ডিয়ার। ওসমান নিয়মিত বোর্ডের মাধ্যমে শুধুমাত্র ট্রেজারি ও ব্যাংকের টাকাই হস্তগত করেছিলেন। সে-সবের পুংখানুপুংখ হিসাব করে প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হোসেন আলিকে কলকাতায় হস্তান্তর করেছিলেন। আসহাব সাহেব এর বাইরে ব্যক্তি বিশেষের অর্থ ও স্বর্ণ সম্পদে হাত দিয়ে নিজের উপর গজব ডেকে আনলেন। বেসরকারি বেহিসাবি সম্পদের দায়-দায়িত্ব নিতে ওসমান বেঁকে বসলেন। বিনাতেলে তেল দিতে ক্ষতি কি? নাজিয়াকে ব্রিগেডিয়ার পত্নীর সম্বোধন, সম্মান ও অভ্যর্থনা দিয়ে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করলেন গজবুল হক। এভাবেই কৃতকর্মের সেবা করলেন হেবা ডাক্তার। নিজেকে ব্রিগেডিয়ারের নাজিয়াও নিজের বাসায় ব্রিগেডিয়ারের প্রটেকশন গার্ড চাইলেন।

পত্নী বলে আনন্দ পেতেন। ওসমান থাকে মাঠে ময়দানে। বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে তাঁর দৌড়। এসবে কান দেবার তাঁর সময় কোথায়?

নাজিয়া নাজেহাল ঃ স্থান বেনাপোলের ফ্ল্যাগ পোস্ট, নাজিয়ার বাসা। কাগজপুকুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ গেলেন ভাবির হাতের চা খেতে। গেরিলাদের অন্ধকারে চুপিসারে এসে গ্রেনেড মেরে অফিসার মারার গল্প করলেন। পাকিস্তানি কমান্ডোদের বীরত্ব গাথার গল্প শোনালেন। রাশিয়ান গেরিলাদের মরণপণ যুদ্ধের গল্প বলে ভাবিকে আনন্দ দিয়ে এলেন। ব্যাচেলর মোস্তাফিজ ভাবীর মনে যে কেমন খাবি খাওয়া আতঙ্ক ছড়িয়ে এলেন বুঝতে পারেননি। হঠাৎ নাজিয়ার খেয়াল হলো ব্রিগেডিয়ারের বাসার যোগ্য প্রটেকশন নেই। লোক চেয়ে পাঠালেন। ফ্রন্ট ডিফেন্সে সে সংবাদ পৌঁছুতে নায়েব সুবেদার মুজিবর রহমান ছুটে আসতেই ওসমানের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হলেন। মোস্তাফিজকে ভর্ৎসনা করলেন ওসমান। এ ব্যাপারে ঠোঁট কাটা ক্যাপ্টেন প্রফেসর ভাবিকে ঘায়েল করে প্রশ্ন তুললেন। আরে ভাই আপনাদের এক ব্রাশেই ক্র্যাশ হবো।' ব্রিগেডিয়ারের বাড়ি নয়, দুদেশের সীমা রেখার ফ্ল্যাগ পোস্টের বাংলাদেশের পতাকা পাহারা দেবার জন্যই আমি লোক চেয়েছি। সে-দিকে তো আপনাদের খেয়াল নেই। রাতের আঁধারে কেউ যদি তা নামিয়ে দেয়। কৌশলে পাকিস্তানিরা যদি সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দেয়? স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী আর যাই বলি নাজিয়ার দূরদৃষ্টির সত্যতা পরে বুঝা গিয়েছিলো। আন্তর্জাতিক সীমারেখায় বাংলাদেশের পতাকার এমন রক্ষা ব্যবস্থাই মুক্তিরা নিয়েছিলো যে, দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত শত্রুর সাধ্য হয়নি সে পতাকার অবমাননা করে।

মা-বোনের খেয়ালে নাজিয়া ঃ ক্যাপ্টেন আলি আজম চৌধুরীর মা ও বোন অফিসারের সাথেই ছিলেন। আজম মাতা ছিলেন সবার খালাম্মা। তাঁর হাতের পানে সবাই তৃপ্ত হতেন। ওসমান পরিবারের সাথেই তাঁরা অনেকদিন ছিলেন। আজমের বোনের প্রতি অতি খবরদারি অনেকের ভালো লাগেনি। রসিকতা করে অনেকে বলতো তিনি তাকে ভ্রাতৃবধূ বানাবেন। পশ্চিম বঙ্গের বনগাঁতে এসে আজম আলাদা বাসায় সরে যেতে নাজিয়ার অহমিকায় ভীষণ আঘাত লাগে। বাইরের খবরদারি যতোই করুন একটিমাত্র অফিসারের মা-বোনকে নিজের মা-বোনের বাইরে ভাবা ছিলো নাজিয়ার সহ্যের বাইরে। দুর্ভাগ্য নাজিয়ার, পারিবারিক ঐতিহ্য তাকে ভিন্নতর কিছু শিখায়নি। ওসমানকে আগে থেকে বলে ব্যবস্থা নিলেই সব কিছুর মধুরেন সমাপেত হতো। নাজিয়ার আঁতে ঘা লাগলো যে, খালাম্মা হয়তো তার অবহেলায় সরে যাচ্ছেন। নাজিয়া ওসমানের ওপর একহাত নিলেন। "তোমার অফিসার আমাকে একা ফেলে মা-বোনকে নিয়ে গেলো, তুমি কিছু বললে না।" আজমকে অফিসে ডেকে, "আমাকে জানিয়ে এ ব্যবস্থা করলেই কি ভালো হতো না?" র ঝাল ঝাড়ে ওসমান। বাচ্চা আজম তোতলিয়ে খায় কসম। খুনের নেশায় গুমগুমায়।

সফিউল্লাহ নাখোশ ঃ বনগাঁ থেকে কৃষ্ণনগরে সেক্টর হেডকোয়ার্টার সরে যেতেই, তোমাদের সঙ্গ ছাড়ুম না বলে নাজিয়াও হাজির। শেষ পর্যন্ত কল্যাণীতে সদর দপ্তর

সরে যেতে সবাই হাঁফ ছাড়লো। নাজিয়ার নজর থেকে কমান্ডারকে দূরে আনা গেলো। উল্টা বুঝিলি রাম। রানীর কল্যাণ পরশে কল্যাণীতে সবার কল্যাণের ব্যবস্থা হলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের কল্যাণীতে স্থান সংকুলনের ব্যবস্থা করলেন নাজিয়া। কলোনি-টাইপ অনেকগুলি ফ্লাট বাড়ি সংগৃহীত হলো। এবার সবাইকে নিয়ে কলোনিতে এলেন কল্যাণীয়া। বেগম সফিউল্লাকে আগরতলা থেকে আনালেন। বোনকে নিজের সান্নিধ্যে একই বিল্ডিংয়ের ফ্লাটে রাখলেন। ব্যাটম্যান নিয়োজিত হলো। ছেলেপিলেরা পার্কে যায় দুষ্টুমি করে। ব্যাটম্যান সামলিয়ে রাখে। নানা কাজে বাধা দেয়। বাচ্চারা রেগে যায়। আব্বা-আম্মাকে অভিযোগ করে। বেচারা ব্যাটম্যানের গুডম্যান হবার রাস্তা কঠিন হলো। বাচ্চাদের বাইরের বিধি-নিষেধের কার্যকলাপে ব্যাটম্যানকেই দুচার কথা শুনতে হয়। ছেলেপিলের বকাবকি ও রাগে ব্যাটম্যান অভ্যস্ত। এবার বাচ্চাদের অভিযোগ মায়েদের কানে যায়। নিজের সন্তানের অভিযোগে ব্যাটম্যানকে দুচার বাতচিত শুনিয়ে দেন বেগম সফিউল্লাহ। সেদিনই কনফারেন্স উপলক্ষ্যে কল্যাণী আসেন বোনাই। তিনি স্ত্রী ও সন্তানের অভিযোগে ব্যাটম্যানকে ডেকে শাসিয়ে দেন। বাসায় আসতে ইউনিফরমেই ওসমানকে ডেকে ব্যাটম্যানের শাস্তির নির্দেশ আসে তাঁর তরফ থেকে। তাৎক্ষণিকভাবেই ওসমান অফিসে ফিরে গেলেন। ব্যাটম্যানকে ডাকলেন কৈফিয়ত তলব করলেন। বেচারা ব্যাটম্যানের আক্ষেপ তার অপরাধ কোথায়? কারো গায়ে সে হাত তোলেনি। শিশুদের কিছু কাজে নিষেধ করেছে মাত্র। পরিণামে সন্তান, মা-বাপ সবার গালি খেয়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা। উল্টা সে নিজেই খালি খালি সবার গালি খাবার জন্য সাশ্রুনয়নে বিচারপ্রার্থী। সেনা আইনে রণাঙ্গনে ব্যাটম্যান নিষিদ্ধ হলো। বেহুদা অন্য পরিবারের গাড়ির কোচম্যান হওয়ার ঠেলা সামলাও ওসমান।

ভায়রা সমীপে ফিরে গেলেন তেড়া ওসমান। ইউনিফর্মে স্যালুট করেই সবিনয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে শিশু ও মহিলাদের ব্যাপারে সৈনিকদের না-জড়ানোর আর্জি পেশ করেন। ব্যাটম্যানকে সরাসরি ডেকে সব তরফ থেকে তো কয়েক চোট হয়েই গেছে। বিচার করবার আর কিই বা বাকি আছে!! সফিউল্লাহর ছাফ ব্যবস্থা, সপরিবারে তড়িঘড়ি বিছানাপত্র গুছিয়ে অকল্যাণের আস্তানা কল্যাণী ত্যাগ করেন। এমন উদার দিলের দিগন্ত খুলে দিয়েছিল নাজিয়া যে, শেষ পর্যন্ত দরজা দেবার কপাট পেলোনা। বড় মুখ করে বোনকে কাছে এনেছিলো। সে বুক খালি করে চলে গেলো। পেছনে রেখে গেলো শূন্য হাহাকার।

সেক্টর থেকে নাজিয়াদের বিদায় ঃ চাণক্যদের চালে বার বার প্রতারিত হতে চাইলেন না ওসমান। তাদের গালভরা প্রতিশ্রুতিতেই সর্বনাশের সূচনা। মাসির আঁচলে ম্যাঁ ম্যাঁ করে মুখ লুকাতে ঘৃণা করতেন তিনি। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের আয়োজন মিলতো না। বানরে বানরে মারামারি করে কমজোরির আগে লংকা সেতু বাঁধেননি ভগবান রামচন্দ্র। নিজের কবর নিজে খোঁড়ার মতো বানরের তৈরি সেতুতেই

বানর রাজ্যে নরদেবতা পা রাখলেন। বানরের মতো পরস্পর যুদ্ধ করে রামানুচরের শত্রুরা কমজোর হতেই মাসির মুখে হাসি ফুটলো। তিনি এবার কমজোরদের বাঁচাতে সজোরে এগিয়ে এলেন। বানরসেনার ন্যায় মুক্তি সেনারাই রামসেনাদের ট্যাংকের সেতু তৈরি করে দিলেন। আদপেই এসবের যাতে প্রয়োজন না হয় তার পরিকল্পনাতেই সেনাপতি ওসমানী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বন্ধুরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলেন। পরিণামে নিজের সৃষ্ট সেক্টর থেকে বিনা নোটিশে সরতে হলো তাঁকে। অফিসারসুলভ সামান্য সৌজন্যমূলক বিদায় সম্ভাষণেও কেউ এগিয়ে এলেন না। প্রতিবাদ করেও শৃংখলা মেনে সরে গেলেন ওসমান। আপদ বিদায় হলেও নাজিয়া তার প্রিয় সৈনিক পরিবারকে ভুলেন নি। কলকাতা থেকে কল্যাণীতে সৈনিক পরিবারদের দেখতে আসতেন। তাদের চিরাচরিত আদর সোহাগ করতেন। সামান্য খেলনা ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতেন। প্রত্যেক কোম্পানিতে গিয়ে প্রিয়-সৈনিকদের খোঁজ নিলেন। তাঁদের থেকে আবেগে বিদায় নিলেন। সকলের মনোবল উদ্দীপ্ত করলেন। শুধুমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই দেশ স্বাধীন করার প্রেরণা জোগালেন। কোনো কোম্পানির পরাজয় ও ভাগ্যোয়াট কাপুরুষতায় দুঃখ পাবেন বলে জানিয়ে গেলেন। মুক্তিসেনাদের বিজয় শোনার জন্য উৎকর্ণ আছেন বলে জানিয়ে রাখলেন।

প্রথম দিকের কয়েকটি বিপর্যয়ে তিনি সরাসরি সৈনিকদের উপর বিরূপ হন। সৈনিকরা সখেদে মাতৃরূপী নেত্রীর নিকট অফিসারদের অনুপস্থিতির কারণে পরাজয় ও পিছে হটার কারণ ব্যক্ত করে। অফিসারদের ব্যাপারে সৈনিকদের অভিযোগ করতে নিষেধ করলেন। অফিসারের স্বল্পতা, তরুণ অফিসারদের অভিজ্ঞতার অভাব ও সদ্য কমিশন পাওয়া অফিসারদের সবকিছু বুঝে নিতে সময় লাগবে বলে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিলেন। অফিসারদের কাছে পেয়েই অভিমানিনী অভিমানে জিজ্ঞেস করেন, "ভাইসব এসব কি শুনি? সৈনিকদের মুখে আপনাদের বাহাদুরির তারিফ না শুনলে শান্তি পাইনা, গর্বে বুক ভরে না, বড় মুখ করে কথা কইতে পারিনা। আপনারা ফ্রন্টে থেকে তাদের মন জয় করেন।" ২৭ বালুচের লেঃ আতাউল্লাহ শাহ। কুষ্টিয়া থেকে পালাতে গিয়ে শৈলকুপায় ধরা পড়েন। গণ পিটনিতে মাথা কাটা ঘা অবস্থায় তাঁকে চুয়াডাঙা আনা হয়। আহত বন্দির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হন। কিভাবে কার কাছে যে অকুস্থল শৈলকুপায় ক্যাপ্টেন প্রফেসরের উপস্থিতির খবর পান জানি না। সামনা সামনি পেয়ে প্রফেসরের উপর একহাত নিলেন। "এই আপনার লেখাপড়া, ছাত্র পড়ানো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর বাহাদুরি, আপনি থাকতে বন্দিকে জঘন্য মার মারা হলো কিভাবে?" তিনি প্রফেসরের কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনই মানেননি।

বাঙালি-অবাঙালি, বিহারি-বাঙালিতে সংঘাত লেগেছে ঠিকই। চুয়াডাঙা ইপিআর সদর দফতরের ধোপারা ছিলো বিহারি। ইপিআরদের সাথেই তারা সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, বেতাই, বেনাপুল ঘুরে বনগাঁও পৌছেন। ১ম ইস্ট বেঙ্গল-এর সিপাইরা মুক্তিফৌজের মাঝে বিভীষণরূপী বিহারি ধোপাদের দেখে ক্ষেপে যান। মাতৃরূপী নাজিয়ার

কানে সে সংবাদ যেতেই তিনি ফোঁসে উঠলেন। বিহারি হোক তাতে কি? তাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবেনা। বিহারি ধোপাদের রক্ষায় ইপিআরের নায়েব সুবেদার মুজিবর রহমানকে বিশেষ উদ্যোগী হতে হয়েছিল নাজিয়ার নির্দেশে। বাঙালি, অবাঙালি, বিহারি যাই হোক, নিজ সন্তানদের পরের হাতে মরতে দিতে রাজি হননি। তাঁর কড়া নির্দেশের উপর বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর কোনো সৈনিক বা কারো পক্ষেই বিহারি ধোপাদের গায়ে হাত তোলার সাহস হয়নি। এমনি কোমল-মধুর ছিলেন নারী ব্যক্তিত্ব নাজিয়া। এমনি হাজারো জানা-অজানা স্মৃতির রেশ রেখে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। কোলকাতা থেকে একমাত্র তিনিই সবেগে ধেয়ে এসেছিলেন ব্যারাকপুর হাসপাতালে মৃত্যুপথ যাত্রী দুই আহত ক্যাপ্টেন সফিক ও মাহবুবকে দেখতে। এক্ষেত্রেও তাঁর উপস্থিতি ভালো নজরে দেখা হয়নি।

কোনো কোম্পানিতেই তিনি বেশিক্ষণ থাকতেন না। ডিফেন্সের বা দূরের কাউকে ডেকেও আনতেন না। কোম্পানি হেডকোয়াটারে রিয়ারে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সাথে দেখা করেই চলে আসতেন। তিনি একা আসতেন না। স্বামী ওসমান ও কন্যাদের নিয়েই পিকনিকের মতো বের হতেন। নিজেদের গাড়িতে করেই তাঁরা আসতেন। খাবার তাঁরা সাথে করেই নিয়ে আসতেন। সৌজন্যের চা-নাস্তা-খাবারের আপ্যায়ন তিনি সাদরে হাসিমুখে খেয়ে দেখতেন। মাছ-মুরগি কেউ দিলে পয়সা দিয়ে কিনে নিতেন। চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুরের ই কোম্পানি থেকে বিদায় নিতে যান নাজিয়া দম্পতি। ঐতিহ্যবাহী খান পরিবার তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। বাংলাদেশেরই এক জেলে তাঁদের জন্য সদ্যধরা জ্যান্ত কিছু গলদা চিংড়ি নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের চিংড়ি পেয়ে নাজিয়া খুশিতে উপছে উঠলেন। দাম দিতে গেলেন। খান পরিবারের সম্মানে আঘাত লাগলো। হালিম খান ও আজগর খান ক্ষেপে গেলেন। আপনাদের জায়গা দেওয়াই ভুল হয়েছে। পয়সা না দিয়ে ভাব খেলেন কেন? এতোজন যে এ পর্যন্ত এলেন গেলেন খেলেন তার পয়সা কই? খান পরিবার গরিব হতে পারে? তাদের ঘরে বসে বাইরের কেউ পয়সা দিয়ে জিনিস কিনেনা। খান পরিবারের উপহার গলদা চিংড়ি তাঁকে সবিনয়ে নিতে হলো।

অচেনা অজানা সেক্টর কমান্ডারের আকস্মিক আগমন, সম্মান ও গৌরব বয়ে আনা প্রতিষ্ঠাতা সেক্টর কমান্ডারের ঐতিহ্যবাহী ইপিআরের রেওয়াজের বাইরে অসম্মানজনক বিদায়ে সৈনিকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিলো। নাজিয়াদের জনপ্রিয়তাই তাদের কাল হলো। সৈনিক কোম্পানিতে গিয়ে এভাবে যেচে বিদায় নেওয়া বাংলাদেশ সেনা প্রধানরা সুনজরে দেখলেন না। নতুন সেক্টর কমান্ডার তাঁকে রীতিগত আনুষ্ঠানিক বিদায় তো দিলেনই না, বরং সেক্টরে তাঁদের উপস্থিতি তাঁর অসহ্য লাগতো। মিত্র পক্ষও এটা চাইতেন না। কেউ সাহস করে অপ্রিয় সত্যটা তাঁদের মুখের উপর বলে দিলেই পারতেন, "তোমরা অবাঞ্ছিত সেক্টর এলাকায় এসো না।"

চাণক্য বুদ্ধির জয় ঃ হঠাৎ ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদার বয়রা কোম্পানিতে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স এক বাংলাদেশি চরকে ১ লাখ টাকাসহ ধরার রব উঠলো। চরের খবর

নাজিয়া পরবর্তী সেক্টর কমান্ডারকে হত্যার জন্য ঘাতক নিয়োগের জন্য অর্থ পাঠিয়েছে। ঘাতক সংগ্রহে চরের আগমন। সাপ্লাই দিয়েই সাপ্লাই ঠিক রাখলেন চাণক্য বন্ধুরা। ওসমান ও হুদা দুজনই ছিলেন সাপ্লাই কোরের অফিসার। শার্দুলের কাছে বস্তা বওয়া দুল দুল গাধা কোন কামে লাগে। পুরো ব্যাপারটাই ধূম্রজালের রহস্যে চাপা দিয়ে মিত্ররা তাঁদের মৈত্রী বন্ধন অটুট রাখলেন। কাউকেই কৈফিয়ত দিতে হলো না। নাজিয়ার গর্ব খর্ব করে সবাই শ্যাম-কুল দুটাই ঠিক রাখলেন। কে সে চর তার খবরও দুনিয়া জানলো না।

"হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।"

পরবর্তী সেক্টর কমান্ডার বলেছিলেন, যে সব কোম্পানিতেই ঘাতক সংগ্রহে লোক গিয়েছিলো, দু'একজন কোম্পানি কমান্ডার এর সত্যতায় সন্দেহ করে প্রমাণ ও বিচার চেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন প্রফেসর তো তাঁর কোম্পানিতে অবাঞ্ছিত লোকের আগমন ও ঘাতক সংগ্রহের ব্যাপার চ্যালেঞ্জ করে প্রমাণ চাইলেন। হিসাব কষে তাঁকে বুঝানো হলো যে, তখন তিনি কোম্পানিতে ছিলেন না।

স্বাধীন বাংলায় নাজিয়া ঃ ৯৯ হাজার টাকার ব্যাংক লোনে ঢাকার অভিজাত এলাকা বনানীতে সখের বাড়ি করলেন নাজিয়া। আর যায় কোথায়। শান-শওকতের বিজয়ে সরকারের অভিষেক, বিপুল অর্থ জমা দিয়েও পার পেলেনা নাজিয়ারা। নাজিয়ার বিত্তশালী জমিদার বাবা ও বোনাইদের অস্তিত্ব কারো চোখেই লাগলো না। যুদ্ধকালীন সেনাপতির পর নতুন সেনাপতি হলেন ওসমানের ভায়রা। অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে। ওসমান পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগ পত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখের হাতে যেতেই তিনি হতবাক। পরিপূর্ণ তদন্তে নাজিয়া-ওসমান প্রসঙ্গে স্থির নিশ্চিত হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। সেনাপতিকে ডেকে ভূপাতিত করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দুজনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের হেদায়েত অন্যের জানার কথা নয়। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিব কতোটুকু তৎপর ছিলেন, এ তার খোরা-ছা নমুনা মাত্র। আমলাতন্ত্র তাঁকে ডুবিয়েছে। প্রকাশ্যে তিনি ভায়রা-দ্বয়ের হাত মিলিয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। নাবালক ভায়রা এবার সাবালক হয়ে পদোন্নতি পেলেন।

নাজিয়ার বাসা জনসমাগমে পূর্ণ। যুদ্ধকালীন সৈন্যরা মাতৃরূপী নাজিয়াকে দেখতে আসে। ৮ নং সেক্টরের প্রাক্তন যোদ্ধা ও ইপিআরদের জন্য নাজিয়ার বাসা লঙ্গরখানা। অনেকের চোখে ব্যাপারটা বিদ্ধুটে।

সিপাহি বিপলবের বলি নাজিয়া ঃ ৭ই নভেম্বর ১৯৭৭। সকাল ৭টা ইউনিফরমে ওসমান বাসায়। অফিসে যাবার গাড়ির জন্য প্রতীক্ষায় আছেন। সিপাহি বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বাস ভর্তি ইউনিফর্মের সশস্ত্র অচেনা ঘাতকরা এলেন। নাজিয়ার প্রাক্তন ইপিআরের বাবুর্চি টেনে হেঁচড়ে ঠেলে ওসমানকে দেওয়ালের বাইরে ফেলে দিলো।

ঘাতকেরা বাড়ি ঘিরে গুলির বন্যায় দরজা, জানালার কাঁচ ভাংছে। অসহায় নিরস্ত্র জনতা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে কলি ও চম্পাকে নিয়ে অকম্প নাজিয়া খাটে শুয়ে রইলেন। অজস্র গুলির বন্যায় কেয়ামতের আলামত। সকন্যা নাজিয়া আশ্রয় নিলেন দেয়ালের আড়ালে। ঘাতকরা ডাকতেই নাজিয়া গুলি বন্ধ করার আবেদন জানালেন। তিনি বেরিয়ে আসছেন বলতেই ঘাতকরা তাঁকে বেরুতে নিষেধ করলেন। তাঁকে ঘরে থাকতে বলে শুধুমাত্র কন্যাদের বাইরে পাঠাতে দিলেন। কন্যাদের চিৎকারে মা যাতে ছুটে এসে বিপদ না বাধায় তাই কলি-চম্পারা নিজের থেকেই বললেন, "আমরা বেরিয়ে আসছি, আপনারা গুলি থামান।"

রুম থেকে বেরিয়েই ছোট বোন চম্পা দেখে তাঁদের টেলিভিশন মায়ের শাড়িতে জড়িয়ে ঘাতকরা বাসে উঠাচ্ছেন, তার সখের খেলনা নিয়ে যাবার প্রতিবাদ করে, "আমার এসব নিচ্ছেন কেন?" চম্পার গলায় হাত চেপে অস্ত্র উঠালেন ঘাতক। তাঁদের কথা, "সে সব কটাকে শেষ করে।" মাসুম বাচ্চাদের হত্যায় ঘাতক সৈনিকরা দ্বিধান্বিত ও দুভাগ হলো। দয়ার্দ্র পক্ষ সদয় হয়ে তাদের গলাধাক্কা দিয়ে গেইটের বাইরে জনারণ্যে মিশে যেতে দিলেন। চঞ্চল চরণে জনারণ্যে মিশে গেলো। নিকট দূরত্বে গানের মাস্টার ফিরোজা বেগমের বাড়িতে আশ্রয় নিলো চম্পা-কলিরা।

ওসমানকে ঘাতকরা পেলো না। ঝাল উঠালো ওসমান-গিন্নির ওপর। পেছন থেকে একটা মাত্র ব্রাশ ফায়ারে স্বাধীন দেশে নারী হত্যার গৌরবে উল্লসিত হলো ঘাতকরা। নাজিয়ার ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হলো, "এক ব্রাশেই ক্র্যাশ।" পোস্ট মর্টেম, "সম্পূর্ণ কলিজা গুলিতে ঝাঁঝরা থেঁতলা।" ঘাতকদের সহৃদয়তার প্রশংসা করতে হয়। তারা নাজিয়াকে বেশি কষ্ট দেয়নি। মিনিট খানেকের মধ্যে তিনি গতায়ু হয়েছেন। যে মুখের হাসিতে মরণোন্মুখ মুক্তিযোদ্ধারা বাঁচার প্রেরণা পেতো, সে মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। যে হাত যুদ্ধের ময়দানে আহতদের পানি বিলাতো, তাকে পানি গিলাতে অন্তিমে কেউ এলো না। হায় হতভাগিনী নাজিয়া!

ঘাতকের কাজ শেষ। তারা কাঁহাতক আর অপেক্ষা করবে। নাজিয়ার উষ্ণ রক্তে সবুট দাঁড়িয়ে তারা তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সদম্ভে নিষ্ক্রান্ত হলো। ঘরের ফ্লোরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, ভিতরে রাস্তায় ও গেটে তাজা রক্তের বুটের তলার ছাপ রেখে গেলো বিজয়ী ঘাতক। শূন্য ঘরে মেহেদি রঙের রাঙা শয্যায় তারা রেখে গেলো একা নাজিয়াকে।

দূরে দাঁড়িয়ে জনতা পাকিস্তানি আর্মির পৈচাশিকতা-কেও হার মানানো পৈশাচিকতা দেখলেন। নাজিয়ার পরিণতি ১০টা নাগাদ জেনেও গানের মাস্টার ফিরোজা বেগম চম্পাকলিদের বিকালের আগে ছাড়েন নি। গেট দিয়ে ঢুকে বুকের রক্তের দাগ ধরে তারা মায়ের ঘরে এলো। নাজিয়া চম্পা-কলির ডাকে সাড়া দিলো না। নজর বন্ধ নাজিয়া। কন্যাদের দিকেও তাকালো না। উষ্ণ আশ্বাসের মায়াময় হাত বাড়ালো না। শোকে যে মানুষ কেমন কাতর জানি না। চম্পা কলিরা সে ভয়াবহ দৃশ্যে আজো

চমকায়। শিউরে ওঠে। নীরব নিস্তব্ধতায় লা-জবাব পাথর বনে যায়। কোনো কথাই বলে না। নীরবে দরজা বন্ধ করে। মা-মনির ফটো দেখে, আর বুক ভাসায় চোখের জলে।

ওসমান নাজিয়া ঃ যত হীন এবং পর্যুদস্ত অবস্থাই হোক, ওসমান দম্পতি টিপটপ থাকতেন। ভাসমান পরবাস অরণ্যবাসেও অল্পক্ষণে বসবাসের পরিবেশ উন্নত করতেন। প্রশাসনিক পরিবেশের জাঁকজমক অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। অল্পক্ষণ পরে যে অবস্থান তাঁরা ছেড়ে যাবেন, শত্রুর হাতে যার পতন হবে, সেখানেও স্থির অচঞ্চল স্বাভাবিক পরিবেশের ন্যায় কাজ করে যেতেন। পাক নাপাম বোমায় চুয়াডাঙ্গা কম্পমান। অকম্প ওসমান। বাঘ-বাঘিনী কোনোটা কম যায় না। বাচ্চাগুলিও আচ্ছা। মা-বাপের আদল পেয়েছে। পুরা জীবন-মরণ জ্বলা-পোড়াটা যেন তাদের কাছে পিকনিকের হেলাফেলার খেলা। নাজিয়া ওসমানদের স্থির অচঞ্চল দৃঢ় মনোবলের কার্যকলাপের কারণেই চুয়াডাঙায় মুক্তিযোদ্ধাদের বোমাবাজি রোধের জীবন্ত যুদ্ধ ফরাসি টেলিভিশন ক্যামেরায় বিশ্ববাসীর চোখে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১। বেনাপোলের কাগজ পুকুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। প্রথমে এলেন ব্রিটিশ এম পি ডগলাসম্যান ও পরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন। তাঁরা স্বাধীন বাংলা ঘুরে দেখলেন। ওসমানের ব্রিফিং নিলেন। নাজিয়ার হাতের চা খেলেন। এর ১ ঘণ্টা ব্যবধানে কাগজপুকুরের কমান্ড পোস্টের পতন ঘটে। চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, বেতাই, বেনাপোল, বনগাঁ, কৃষ্ণনগর কল্যাণী সর্বত্রই শেষ মুহূর্তেও কর্মদক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন ওসমান-নাজিয়া। সাধ্যমতো চেষ্টা করে কোন স্থান ছেড়ে আসার ব্যাপারে ওসমান বাধ সাধতো না। তবে উচ্ছৃংখল কাপুরুষের কাজ ওসমান ঘৃণা করতেন। পদ্ধতিগত সুশৃংখল উইথড্রয়াল তিনি কামনা করতেন। পদ্ধতিগত উইথড্রয়ালের কারণে তিনি ১৩ এপ্রিল যশোর মান্দারতলা বারবাজারের পতনের পরও ক্যাপ্টেন প্রফেসরের অবাধ্যতামূলক উইথড্রয়ালের অস্বীকৃতি মেনে নিয়েছিলেন। ১৪ এপ্রিল যশোর কালিগঞ্জের পতনের পর তাড়াহুড়ায় ঝিনেদা ছেড়ে চুয়াডাঙা যাবার জন্য তিনি ক্যাপ্টেন আজম ও ক্যাপ্টেন মাহবুবের উপর চটেছিলেন। সেদিন অপরাহ্নেই নাজিয়া ও ওসমানের তাড়া খেয়ে ক্যাপ্টেন মাহবুবকে আবার পতনোন্মুখ ঝিনেদায় ফিরে আসতে হয়েছিলো। ওসমানরা সুশৃংখল থাকার ফলে অন্যদের নিকটও উত্তম শৃংখলা আশা করতেন। ২৪ এপ্রিল বেনাপোলের যুদ্ধে নিজেদের সৈনিকদের ফেলে দৌড়ে পিছিয়ে যান সালাহউদ্দিন। পেছনে থেকে শত্রুর অগ্রগতি রোধের নামে মর্টার ছোঁড়ায় ওসমান বিপাকে পড়েন। অবস্থার মূল্যায়নে নিজের সৈনিকদের রক্ষা ও মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি পাকিস্তানি শেলের অগ্নি-বৃষ্টির মাঝেও এগিয়ে যান। সামনে ক্যাপ্টেন প্রফেসর ও অন্যদের যুদ্ধরত দেখে সালাহউদ্দিনের প্রতি ক্ষেপে যান। তাঁকে না জানিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ডাকে মুক্তির 'এ' কোম্পানি কমান্ডার সালাহউদ্দিন দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার আগে আর্টিলারির ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিলেন। তাই ইন্ডিয়ানরা তাঁকে লুফে নিলো। কিন্তু

নিজের কমান্ডারকে না জানিয়ে কোম্পানি ছেড়ে যাওয়ায় ওসমান ভীষণ চটে ছিলেন। মিত্রদের পক্ষপুট থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনতে না পেরে ওসমানের কৌশলটি সার হলো। অফিসার, জেসিও ও অন্যদের মাঝে নাজিয়া ও ওসমানের বিপুল টাকা মারার কল্পিত ফুস-মন্তর ভালো মানুষের মতো নীরবে ছাড়লেন সালাহউদ্দিন। সৈনিক ক্যাপ্টেন প্রফেসর প্রমাণ চাইলে, "তুমি জান না তোমার সুবেদার বাবুর্চ জানে," অন্যরা জানার ইঙ্গিতময়তা দিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করলেন। ঐতিহাসিক পরিণতিতে এ সালাহউদ্দিনকেই ১৯৭৭-এর সিপাহি বিপ্লবে নিজের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ছেড়ে যেতে হয়। পীরানে পীরের নুরানি আলখাল্লায় জান বাঁচাতে হয়। এভাবেই বুদ্ধিমান সালাহউদ্দিন অজান্তে পরের খাল তৈরি করে বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখে ভেসে গেলেন। ছুটি না নিয়ে কর্মস্থল থেকে দূরে থাকায় ইএমইর ক্যাপ্টেন ওহাবকে প্রকাশ্যে ভগোড়া বলে সাময়িকভাবে দূরে তাড়িয়ে ছিলেন ওসমান। গোয়ালন্দ থেকে মর্টার ফেলে চলে আসায় তিনি ইপিআরের সুবেদার শামসুল হকের চেহারা পর্যন্ত দেখতে চাননি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মর্টার শেলেই এ সুবেদারের পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমাবধি স্তর পর্যায়ে শৃংখলা আনতে গিয়ে ওসমান অপ্রিয় অপরাধের শিকার হলেন। নাজিয়াকে সাথে জড়িয়ে ওসমানকে ঘায়েলের পথ প্রশস্ত হলো।

নিজের শৌর্যে বিজয় ও রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানিকতার গৌরবে ধন্য ওসমান। যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিরক্ষাবাহিনী ও ছাত্র জনতা নিয়ে প্রাথমিক বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন, তারা আজ বিস্মৃতির অতলে। এখন প্রথম শ্রেণীর প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত। তাই সিপাহি বিপ্লবে ওসমান আজ ভাসমান। কোনো ঘরে তার ঠাঁই নেই।

শেষ শয্যায় সাজে নাজিয়া ঃ প্রমিলার শেষ স্মরণ স্বামীর সহমরণ। নাজিয়ার ভাগ্য স্বামী দুর্ভাগ্য। বড় ঘরের নাইয়রি। এলো বাপের বাড়ি। সেজেগুজে লালে লালে বসনে। মৃত্যুর শীতল কাফনে। নাজিয়ার শেষ বাসরে দামাদ ওসমান এলোনা একবার রে। কুমিল্লা মৌলবী বাড়ির পুকুর পাড়। শেষ শয্যা নাজিয়ার। প্রকৃতি বসুন্ধরা। নাজিয়ার শোকে কাঁদে অধোর ঝরে। নীরব প্রচারে। এলেন পুণ্যাত্মা কাতারে কাতারে। অচেনা লোকজন হলো অগণন। আল্লাহর ফেরেস্তা। করেন রাস্তা। জানাজার আহাজারি অশ্রু-পুষ্পবারি। করেন গুণগান। হায় নাজিয়া ওসমান সতী। অতি পুণ্যবতী। সৈয়েদেনা শহিদানা তাঁর গতি। শেষ অংকে নতুন কবরের বাংকার। মুক্তিযোদ্ধা নেত্রীর শেষ অহংকার।

নাজিয়ার স্মরণে ওসমান

আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইত এত লীলার ছল,
বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।"

কন্যা দুটিকে নিয়ে টেনিস খেলার জৌলুসে মাতে ওসমান। মেয়েদের টেনিস প্রাইজে সবাই পুলকিত। ঘরকে বাহির করেই বাপ-বেটিদের আনন্দ। ঘরের ঘরনি অভিমানে

বিদায় নিয়েছেন। ওসমানের জন্য কন্যা দুটিকে আমানত রেখে গেছেন। এ আমানতের খেয়ানত ওসমান আজো হতে দেয়নি। নাজিয়ায় শূন্য স্থান পূর্ণ হলো না। ভাবুক ওসমান। প্রেমিক ওসমান। সৈনিক ওসমান। শত্রুর চোখের বিভীষিকার ওসমান। আজ ঘরে ম্রিয়মাণ। মেয়েদের সৎমার কথায় আঁতকে ওঠে ওসমান। চোখের জলে বুক ভাসায়। দেয়ালে যুগল ছবি। বিয়ের পরের ছবি। শোয়ার বেডের সামনে বুক শেলফে নাজিয়ার কলেজ জীবনের ছবি। ছবি যেন কথা কয়। ওসমান জীবনের ধ্যানের ছবি। প্রাণের ছবি। গানের ছবি। আনন্দের ছবি। রণাঙ্গনে হতমান ওসমান। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানের কলি ভেঁজে যে ছবি চলমান রাখতো সে ছবি আজ নীরব। ঘুমে নাজিয়াকে কতোবার দেখে তার জবাবে ছল ছল আঁখিজল ওসমান। ৭ নভেম্বরে নাজিয়ার স্মৃতিতে আপ্লুত হন ওসমান। মিলাদে, নামাজে, মোনাজাতে, স্মৃতি মন্থনে কাটে দিন। বার বার হাজার বার নাজিয়ার ছবি দেখে। জায়নামাজে লুটায়। ক্ষণিকে যায় অন্তরালে। হৃদয়-ভার লাঘব করে। হাসির আড়ালে লুকাতে গিয়ে ধরা পড়ে। বন্যার মতো রুদ্ধ কান্না নীরবে ঝরে পড়ে। শত চেষ্টায় লুকাতে না পারে ওসমান। টলটলায়মান বেদনার্ত আর্তি। পানির গ্লাস হাতে কাঁপে। শেষ মুহূর্তে হায়। ভাগ্যে জুটেনি পানি নাজিয়ার। নারীর জন্য এমন বিরল ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক ওসমান। নাজিয়ার বীর পূজা সার্থক। নাজিয়া দেখে গেলোনা। শোকের দুটি দশক গত। ওসমান হাহাকারে হত। প্রিয়ার পুণ্য আসন শূন্য। এ যুগের শাহাজাহান। শোকে মুহ্যমান। বীর ভোগ্যা বঙ্গ নারী। নমিবে তোমারে হৃদয় উপাড়ি।

নাতিয়া ঃ বীরকুল তারে গেলো পাসরি। হায় বীর প্রসবিনী বঙ্গমাতা। ছি ছি একি কথা!! রেখেছ কি খবর? কোথায় নাজিয়ায় কবর। দোয়া পুষ্পহারে সাজাও তাহারে। আয় খোদা রহমান জান্নাত মানত করে পুরাও তার না বলা নীরব অভিমান।

নাজিয়া ওসমান-এর প্রশংসায় ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম

চুয়াডাঙা-কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর ওসমানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই তেজস্বী মহিলা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাহসী এই বীরের স্ত্রী বেগম ওসমান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি স্বামীকে যুদ্ধে ঠেলে দিতেন, অপরদিকে বিডিআর, জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অনুপ্রাণিত করতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি যুদ্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৭৭ সালের ৭ই নভেম্বর সেনাবাহিনীর সদস্যদের গুলিতে বেগম ওসমান নিহত হন।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র ঃ পঞ্চদশ খন্ড; ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, পৃঃ ১-৩-১০৪।

২. মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, ফরিদা আখতার সম্পাদিত। নারীরা কি শহিদ হয় না? পৃ: ১০২, প্যারা ২।

বীরাঙ্গনা-ধন্য হেমায়েত বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে অনেকেই অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। বাঙালি নরনারীর সম্মিলিত অবদান ধন্য এই মুক্তিযুদ্ধ। নির্যাতন, ধর্ষণ-জাতীয় অকথিত অত্যাচারের সিংহভাগ সইতে হয়েছে বাংলার নারীকে। মুক্তিযুদ্ধে সুসংগঠিত ও সশস্ত্র নারী মুক্তি যোদ্ধার একত্র সমাবেশ সম্ভবত হেমায়েত বাহিনীতেই বেশি।

হেমায়েত বাহিনীর কোটালি পাড়ার নারিকেল বাড়িয়া চার্চ মিশনে সংক্ষিপ্ত নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারই সান্নিধ্যে আহত-মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। হেমায়েত বাহিনীর প্রশিক্ষণ সদর কোটালিপাড়া জহরের কান্দি হাই স্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মেয়েদের নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। দক্ষ প্রশিক্ষণে তৈরি মহিলা যোদ্ধা সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। মুক্তি ছেলেদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠালেও মহিলা প্রশিক্ষণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বাংলা মাটিতেই করা হয়। গ্রেনেড, রাইফেল, স্টেন, পিস্তল, ছোরা, চাকু মারার অস্ত্র প্রশিক্ষণ পেতেন মায়েরা। ঔষধ, পথ্য, ফার্স্ট এইড, ব্যান্ডেজ, যুদ্ধাহতের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, সার্বিক নার্সিং জাতীয় শিক্ষায় মেয়েদের প্রশিক্ষণ চলে। নিয়মিত এমবিবিএস ডাক্তারের অধীনে হতো তাঁদের প্রশিক্ষণ। যুদ্ধাঞ্চলে ও সর্বত্র ক্ষুদ্র অস্ত্র গ্রেনেড, চাকু ও আর্সেনিক তাঁদের নিত্য সঙ্গী। নারী বাহিনী মাত্রেই সুইসাইডেল স্কোয়াড। ধরা পড়লে মৃত্যু, ধর্ষণ-নির্যাতন হেমায়েত নারী বাহিনীতে নেই। ধরা পড়লে চরম মুহূর্তে বিষপানে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবার শপথ নিয়েছিলো দীপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের কজনের পরিচয় ঃ-

আশালতা বৈদ্য

পরিচয় ঃ হেমায়েত নারীযোদ্ধা কমান্ডের গৌরবদীপ্ত পদ অলংকৃত করেন আশালতা বৈদ্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী হরিপদ বৈদ্যের সুযোগ্যা কন্যা আশালতা বৈদ্য। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। পিতা হরিপদের জীবনের একটাই ঐকান্তিক কামনা, আধা ডজন সন্তানের মধ্যে অন্তত একজন দেশের মুখ উজ্জ্বল করা কাজে লাগুক। পিতার আশীর্বাদধন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খ্যাত নারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আশালতা বৈদ্য। তাঁর গ্রামের ঠিকানা ঃ গ্রাম-লাটেংগা, ডাকঘর-ভাংগার হাট, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপাল গঞ্জ।

সাংগঠনিক প্রতিভা ঃ বাংলাদেশের চর অঞ্চলের লোক-প্রকৃতির ভাংগা-গড়ার কারণে সাহসী ও উদার প্রাণ। বৃহত্তর ফরিদপুরের পুরো অঞ্চলটাই নদীর ভাঙনের খেলায় বাস্তবে চরাঞ্চল। সেই চরাঞ্চলের চৌরা, ঘাউরা, জিদি মেয়ে আশালতা। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী অবস্থায় নারী নির্যাতন বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন কোটালিপাড়ায়। এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীর সামনে বাস্তব যুদ্ধের বিভীষিকা নিয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমুপস্থিত।

মা-মাতৃভূমির চোখের সামনে অবমাননা মুক্তিযুদ্ধের অগ্নি কন্যার শিরা-উপশিরার রক্ত সঞ্চালন দ্রুততর করে ছাড়ে। আত্ম-বলিদানের আত্মাহুতির মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দেশের জন্য জীবন দানের উদগ্র চেতনায় জীবন বাজি রেখে মাতৃভূমি উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধারা এক পরিবার, একই মায়ের সন্তান। গোপালগঞ্জের মেয়ের সাংগঠনিক প্রতিভাধন্য মুক্তিযুদ্ধের নারী বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে উত্তর-বরিশাল ও দক্ষিণ-ফরিদপুর তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় সংহত সংগ্রামী নারী যোদ্ধা। পঁয়তাল্লিশ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীরাঙ্গনাধন্য যোদ্ধা নারী তাঁর কমান্ডে চলতেন।

প্রশিক্ষণ ঃ নারী যোদ্ধাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিলো গোয়েন্দা কাজে। গুপ্তচরের সংবাদ সংগ্রহে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। সক্রিয় যুদ্ধে তাঁরা পুরুষ-সৈনিকদের তাক লাগিয়ে দেন। সশস্ত্র যোদ্ধার হাতই আহত যোদ্ধাদের সেবার মাতৃস্নেহ স্পর্শের কোমলতায় ভরে উঠতো। বিভিন্ন কৌশলে তাঁরা ঢাকা থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সক্রিয় যুদ্ধ সাফল্যে তিনি নারীযোদ্ধা কমান্ডার। যুদ্ধ ও সাংগঠনিক সাফল্যের স্বীকৃতির কমান্ডার পদে তিনি ধন্য ও বরেণ্য।

নারীযোদ্ধাদের জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায় তাঁদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ। হেমায়েত বাহিনী প্রধানের একান্ত তত্ত্বাবধানে চলে নারী প্রশিক্ষণ। রণ কৌশল ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় হেমায়েত তাঁর স্বাক্ষর রাখেন সকল ফাঁক ফোঁকড় মুক্ত প্রশিক্ষণ। যাতে বাংলার মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠাতে না হয়।

চব্বিশ জন মহিলা যোদ্ধার এক ক্রাক প্লাটুন গঠন করেন হেমায়েত। মৃত্যুঞ্জয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনাময় ময়দানে তাঁরা অগ্রসেনার কাজ করতেন। শত্রুর অবস্থান জানায় রেকিতে তাঁরা যেতেন। সশস্ত্র যুদ্ধে তাঁরা আত্মাহুতি বাহিনীর মতো কাজ করতেন। মরণ ছাড়া তাঁরা কিছু জানতেন না। ধরা পড়লে আত্মহত্যার ছায়ানাইড বিষ তাঁদের শেষ অস্ত্র।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ঃ আশালতা এদেশের অবলা নারীর জন্য সবলা আশার আলো। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সাফল্যের সাথে এস এস সি/এইচ এস সি/বি এ (অনার্স) সহ এম এ ডিগ্রী নেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজের আশৈশবের লীলা নিকেতন কোটালিপাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথমে প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা। পরে বিডিআর-এর সরকারি চাকরি গ্রহণ। মুক্তিযোদ্ধা মন মানসিকতার সাথে সব যে বেসুরো। সঠিক উন্নয়ন চেতনা ব্যাহত হতেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। সমাজের অবহেলিত কৃষক, মহিলা-পুরুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষে একটানা সমাজ সেবায় নিবেদিতা হন। কর্মই ধর্ম মানলেন। দিন রাত কাজে ডুবে থাকলেন। গোপালগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের সাথে বিলিয়ে দিলেন নিজেকে। দারিদ্র্যের কষাঘাত-মোচনে সূর্যমুখী সংস্থার প্রতিষ্ঠা। বহুতর স্বেচ্ছাসেবক আবেষ্টিত সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক। প্রতিনিয়ত তাঁর নিরলস শ্রম ও নিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছেন। ভিক্ষার হাতকে কর্মী হাতে না গড়লে যোদ্ধা-অযোদ্ধা কারুরই এদেশে অন্ন সংস্থান হবে না। তাঁর মহতী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ-

প্রধান কার্যালয়	আশালতা বৈদ্য, সূর্যমুখী সংস্থা, গ্রাম-জাঠিয়া, ডাকঘর-কুশলা, জিলা-গোপাল গঞ্জ।
ঢাকার কার্যালয়	আশালতা বৈদ্য, পরিচালক, সূর্যমুখী সংস্থা, ২২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় দেশ গড়ার কাজে অন্য মুক্তিরা উদ্দীপিত হলে কতোইনা কাজের হতো।

মুক্তিযোদ্ধা মনা রানী ব্যানার্জি

ভূমিকা ঃ বহুতর বীরাঙ্গনার বীরত্বের শ্রম ধন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ। সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সেবিকার স্পর্শে উজ্জীবিত নারীর কল্যাণ হাত। এমনি এক স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা বাঙালি নারী বরিশালের মনা রানী ব্যানার্জি।

পরিচয় ঃ মনা রানী ব্যানার্জি, স্বামী ঃ ডা: বি কে রঞ্জিত, সুজিত এন্ড ব্রাদার্স, গ্রাম ও পোস্টঃ পয়সার হাট, ইউনিয়নঃ বাকাল, থানা ঃ আগৈল ঝাড়া, জেলাঃ বরিশাল।

বয়স- চুয়ান্ন, ধর্ম- ক্রিস্টান, জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। শিক্ষা ঃ দশম মান পর্যন্ত। পেশাঃ প্রাইভেট পল্লি চিকিৎসক, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী।

প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা-মিশনারি হাসপাতালে সেবিকা প্রশিক্ষণ।

যাবার পাড় মিশনারি ক্লিনিকে কয়েক বছর কাজ করেন। পাক আমলে বাকাল ইউনিয়নে মহিলা সদস্যার কর্ম উদ্দীপনায় পরিবার পরিকল্পনায় মাঠ কর্মীর কাজে প্রশিক্ষণ রয়েছে। তাঁর গ্রাম থেকে তখনকার থানা সদর গৌরনদীর দূরত্ব চৌদ্দ মাইল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চরণ যুগল ভরসায় থানা সদরে যাতায়াত করতে হতো। আজ যানবাহনের উন্নতি হয়েছে। ঘরের কাছে নতুন থানা আগৈল ঝাড়া। স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক ও উন্নত যোগাযোগের যুগে পাক পরাধীন আমলের কথায় অনেকের বিশ্বাস হতে চায় না। জীবনের কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফসল ধন্য মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ সংগঠন ঃ নিজের বাড়ির আশপাশই তাঁর রণাংগন। হেমায়েত বাহিনীর পয়সার হাটের ডে কোয়াটারের হাসপাতাল তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সাধনার ফসল। হেমায়েত-এর হাতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি নারী যোদ্ধা। একাধিক যুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনই মুক্তিযোদ্ধা, ডাক্তার-সেবিকার দম্পতি যুগলের মিল মুক্তিযুদ্ধে কমই মিলবে। হেমায়েত বাহিনীতে যুদ্ধ, সেবা ও সাংগঠনিক কাজের সাফল্যে এই সাহসিনী মহিলার ভূমিকা অতুলনীয়। এ দেশে খ্রিস্টান মিশনারি মিশনের সেবা-শিক্ষার মহতী সাফল্যের এক উজ্জ্বল উপমা মনা রানী।

আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মনা রানী ব্যানার্জি পরিবার ঃ পাঁচ সন্তানের প্রতিষ্ঠিত পরিবার। বড় ছেলে শ্যামল ব্যানার্জি। বরিশাল এস.ডি.এ. মিশনে কর্মরত। তিন মেয়ে

এক ছেলের সংসার। বড় মেয়ে কবিতা ব্যানার্জি ঢাকার মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড ইউ-২৪, নিজ বাড়িতে থাকেন। তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ের সংসার। মেজো মেয়ে মমতা ব্যানার্জি স্টাফ নার্স মানিকগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে চাকরি। এক ছেলের জননী। ছোট মেয়ে অজানা ব্যানার্জি ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ বরিশাল-এ সেবা কাজে নিয়োজিত। দুই জনের পরিবারে ধন্য। ছোট ছেলে অজয় ব্যানার্জি ওয়ার্লড ভিশন বরিশাল সংস্থায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োজিত। এক ছেলে এক মেয়ের তাঁদের সুখী পরিবার।

বেতন কম, আর্থিক অনটনে মনা রানী ও তাঁর পরিবারের অনেক স্বপ্নই কেবল স্বপ্ন থেকে গেছে। আর্ত-মানবতার সেবায় পিছনে পড়ে থাকার বেদনা। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে হারিয়ে যাওয়া সম্পদের পূরণ হয়নি। পাষাণে বুক বেঁধে মা মনা রানী বড় ছেলে শ্যামল ব্যানার্জিকে ভারতে পাঠান ১৯৭১ এ। বাকি পুরো পরিবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সকল দৈন্যের মাঝেও আজ সান্ত্বনা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। মনে বড় দুঃখ স্বাধীন দেশে আজ কেন এতো অভাবের জ্বালা।

সমাজ সেবার সংগ্রামী জীবনঃ মুক্তিযুদ্ধ শেষে নিজেদের হাতে গড়া হাসপাতাল থেকে মনা রানীদের মুক্তি। চরকায় তেল দেওয়া যাদের স্বভাব তেল তারা দিবেই। সে নিজের আর পরের, পয়সার আর বিনে পয়সার যারই হোক। বরিশাল জেলা প্রধান মহিলা বিষয়ক সংগঠনের কাজে লাগেন মনা রানী। আগৈল ঝাড়া থানার বাকাল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রার্থীনী পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেল। পরবর্তী কাজ আগৈল ঝাড়া থানা মহিলা সদস্যার কাজ। আজ তিনি থানা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বোর্ডের সদস্যা। আর্ত মানবতার সেবায় তিনি জীবনে তৃপ্তি খুঁজে নিয়েছেন।

শিক্ষা বিস্তারে মুক্তি নারী ঃ শিশু শিক্ষার অবৈতনিক বেসরকারি স্কুল চালু এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি মাত্র বিশজন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে শিশু শিক্ষা সনদ স্কুলের যাত্রা শুরু। পাঁচটি বছর নিজ সঞ্চয় ও পরিশ্রমে চলে স্কুল। কলেবর বৃদ্ধি ও আর্থিক অনটনে স্কুল চালাতে অসুবিধা হয়। ১৯৯০ সালে ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ নামের আন্তর্জাতিক সংস্থায় স্কুলের দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি। সে আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। মুক্তি নারীর শিক্ষা বিস্তারেই আনন্দ। কারণ তার একদিনের অবৈতনিক শিক্ষা শিশু সদন আজ শাখা প্রশাখার ফল-ফুলে মঞ্জুরিত। স্কুল একটির স্থলে এখন তিনটি ঃ

ক। শিশু শিক্ষা সদন - ১; খ। শিশু শিক্ষা সদন - ২; গ। শিশু শিক্ষা সদন - ৩

স্কুলগুলির পরিচালনার সেবা কর্মে ম্যানেজারসহ চৌদ্দ জন স্টাফ। তিনটি স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ১৯৯৩ সালে ছিলো চারশ পঞ্চাশ। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে স্কুলের শিক্ষা দান তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তীতে ছাত্রদের সরকারি স্কুলে

ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ত্রাণ সংস্থার স্কুল পাস ছাত্রদের পরবর্তী শিক্ষার দায়দায়িত্ব ত্রাণ সংস্থার নিজেদের। বছরে এক প্রস্থ ড্রেস বাতাপত্র অবৈতনিক চিকিৎসা, স্কুল কি জাতীয় সকল দায়ভার বহন করে ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ। এই প্রজেক্টের অধীনে গ্রাম সংখ্যা নয়টি। এককালে শিক্ষার লেশমাত্র বিবর্জিত ৯টি গ্রামে পরিবার সংখ্যা পাঁচ হাজার। অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কার দারিদ্র্য পীড়িত অন্ধ পল্লিতে আজ আলো ফুটছে। মাথা গোঁজার ঠাঁইশূন্য মানুষের বাসস্থানের সুযোগ হচ্ছে। ১৯৯২ সালে অত্যন্ত পরিব শিক্ষার্থী গার্জিয়ানের ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ হাজার টাকা মূল্যের অষ্টাশিটি টিনের ঘরের সুবন্দোবস্ত করে এরা। আজ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত ফুটন্ত বিকশিত ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝে সোনার বাংলা গড়া স্বপ্ন দেখেন মুক্তি নারী। তাদের হাসিতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠে।

আর্তের সেবায় নিঃস্বার্থ প্রাণ ঃ শহরে বিলাস বহুল সুখী জীবনে সারাটি জীবন কাটাতে পারতেন এই মুক্তি নারী। অজ পাড়াগাঁয়ে আর্ত মানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। মানব সেবায় তাঁর জীবন ধন্য। যেখানে দুঃখ-দুর্দশার ডাক পড়েছে সেখানেই দৌড়ে ছুটেছেন তিনি। দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী যোগ্যতার আর্ত মানবতার সেবা কর্মীর অভাবে নিজকে বড় অসহায় ও ক্লান্ত মনে হয়। মনে আশার আলো ভগ্ন ঢাকে জয় বাদ্য বাজিয়ে যাবো যথাসাধ্য। জীবনের অন্তিম লগনে এসে পিছন ফেরার ক্লান্তি নেই। সারাটি জীবন নিভৃত পল্লি মহিলাদের সংগঠন উজ্জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের কথা শুনেছেন সুখে-দুঃখে একাত্ম হয়েছেন। বিপর্যয়ের দুর্দিনে তাদের সান্ত্বনার আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন। আজো বয়স তাঁকে অবশ করতে পারেনি। মানব কূলের আশীর্বাদধন্য ভালেবাসার স্পৃহাই তাঁকে কর্ম চঞ্চল সচল রেখেছে। এতো কর্ম ক্লান্তির মাঝেও নিজেকে অকর্মার হাড়ি ভাবনায় দুঃখ হয়। মানব সেবার আশানুরূপ সাফল্যের অভাবে নিজের কাছে নিজের সন্তুষ্টি নেই। মানবতার সেবাই যিশুর সেবা। কর্মই ধর্ম। চলার গতিই জীবন। স্থিতিতে নিশ্চিত মরণ। তাই আমৃত্যু মানব সেবার কর্মকেই ধর্ম করে নেন মুক্তি নারী।

মুক্তি যুদ্ধই মুক্তি নারীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেবাধন্য মানুষের আশীর্বাদের মধ্যে তিনি খুঁজে নেন স্রষ্টার নৈকট্য। জাগ্রত ভগবানকে সামনে জেনে সুযোগ হাতে পেয়েও ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নেই। ছোট বড় কোনো কাজকেই জীবনে অবহেলা করেন নেই। এ দেশের আর্ত মানুষের দুয়ারে মুক্তি নারীর হৃদয় আর্তির কামনা মানব সেবার সুখ শান্তির প্রশান্তিতে স্বাধীন বাংলায় শেষ শয্যা কামনা। যে মাটির স্পর্শ লাভে ধন্য লাখ মুক্তি বীর শহিদ। জয়তু মুক্তি নারী।

রেফারেন্স ঃ মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী অপ্রকাশিত গ্রন্থের অংশ

পয়সার হাট মুক্তি-হাসপাতাল

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উপায়ে লুকিয়ে-ছুপিয়ে কিছু কিছু চিকিৎসা করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ-ছাড়া রিস্কও খুব বেশি। ঔষধ, পথ্য, ডাক্তার এবং চিকিৎসার অভাবে অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবী মারা যায়। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি-দরদি স্বেচ্ছাসেবীদের সুচিকিৎসার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয় নিজস্ব হাসপাতালের।

হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েতের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় পয়সারহাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। যুদ্ধকালে প্রতিবেশি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগে বেশ অসুবিধা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ছিলো। বিশেষভাবে বর্ডারের সঙ্গে সংযোগবিহীন ফরিদপুর ও বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার খুবই অসুবিধা হচ্ছিলো। অন্যান্য সেক্টরের মতো এ-দুটি এলাকার আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো যাচ্ছিলো না। এমতাবস্থায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন হেমায়েত উদ্দিন।

হেমায়েতের অনুপ্রেরণায় উদ্দিপ্ত হন মনা রানী ব্যানার্জি ও তাঁর স্বামী বি কে রঞ্জিত। আগস্ট ১৯৭১-এ পাক-চক্ষুর আড়ালে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় পয়সারহাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। সংশ্লিষ্টরা জীবন বাজি রেখে গোপনে প্রতিষ্ঠা করেন এই হাসপাতাল। আহতদের চিকিৎসায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের ক'জনের নাম নিম্নরূপঃ

১. ডাক্তার যোগেশ্বর বিশ্বাস, বাগধা, বর্তমানে মৃত।
২. ডাক্তার কেরামত আলি, ধানডোবা, পরবর্তীকালে পিজি হাসপাতালের ডাক্তার।
৩. ডাক্তার গফুর মিয়া. বাগধা।
৪. ডাক্তার শামসুদ্দিন বাহাদুর, পয়সারহাট, বর্তমানে মৃত।
৫. ফার্মাসিস্ট আবদুল খালেক শিকদার, পয়সারহাট।
৬. ফার্মাসিস্ট শামসুদ্দিন বিশ্বাস, মধুর নাপরা।
৭. সমাজকর্মী আবদুল খালেক খান, পয়সারহাট, বর্তমানে মৃত।
৮. সমাজকর্মী শহিদউল্লাহ তালুকদার, বাগধা, পরবর্তীতে ইউনিয়নবোর্ড চেয়ারম্যান।
৯. সমাজকর্মী আবদুল খালেক ব্যাপারী, পয়সারহাট।
১০. সমাজকর্মী নবাব আলি চৌধুরী, আলবলিয়া, ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বাগধা।
১১. সমাজকর্মী আবুল কাসেম হাওলাদার।
১২. সমাজকর্মী মধু মীর, গৌরনদী নাঠেই।
১৩. সমাজকর্মী মোজাম মিয়া, চান্দবাড়ি।
১৪. ম্যাট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস, রাহুতপাড়া, [বরিশাল সদর হাসপাতালের ম্যাট্রনরূপে আইভি সেলাইন ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ওষুধপত্র পাঠাতেন। আগস্ট ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫. সেবিকা মঞ্জু রানী রায়, রঘুনন্দনপুর, মনা রানীর বোন, ক্যাথলিক সিডি প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থায় কর্মরত।

পয়সারহাট মুক্তি হাসপাতালে বিভিন্ন টিমে মুক্তিযোদ্ধারা কাজ করে যেতো। সর্বক্ষণ তারা হাসপাতাল পাহারা দিতো। মুক্তিযোদ্ধারা আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে পাঠাতো। মুক্তি টিমের ডাক্তারদের অধীনে মনা রানী ও তাঁর বোন মঞ্জু রানী মানব সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যুদ্ধাহত ও গুলিবিদ্ধ জটিল রোগীদের এখানে চিকিৎসা চলতো। নিম্নে মুক্তি হাসপাতালের আওতায় কয়েকজন সাহসী টিম কমান্ডার-এর নাম উল্লিখিত হলোঃ

কমান্ডার হেমায়েত- হেমায়েত বাহিনী প্রধান
ক্যাপ্টেন ওমর আলি
ক্যাপ্টেন বাবুল
কমান্ডার আবদুল আজিজ
কমান্ডার আবদুল খালেক পাইক
মুজিববাহিনী প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ

সে-দিনের সাহসী দামাল ছেলেরা জীবন-মৃত্যুর পরোয়া না করে যেভাবে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ভবিষ্যত, তাঁদের শৌর্যের স্মরণে আজো হতবাক না হয়ে উপায় নেই। তেমনি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয়ী ও হতাহত বীরের নাম নিম্নরূপঃ

ল্যান্স নায়েক কাঞ্চন সিকদার
কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন, পরবর্তীকালে বীর বিক্রম
মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর হোসেন
মুক্তিযোদ্ধা হাশেম আলি
মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন তালুকদার
মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম
মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুল হক
মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সাত্তার শাহ
মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত শাহ
মুক্তিযোদ্ধা আলিউজ্জামান
মুক্তিযোদ্ধা তাহের আলি গোলদার
মুক্তিযোদ্ধা মুহিবুল হক হাওলাদার
মুক্তিযোদ্ধা সেন্টু মীর।

এমনি সব নাম জানা এবং না জানা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অক্ষয় স্মৃতির স্বাক্ষরবাহী এই

মুক্তি হাসপাতাল। পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অসীম ধৈর্য-সহ্য-সাহস এবং বীরত্বের অতি উত্তম নিদর্শনের নজির স্থাপন করে কখনো সজ্ঞান অথবা কখনো অজ্ঞান অবস্থায় চিকিৎসার জন্য এসেছেন এই হাসপাতালে।তাঁদের দেখে ডাক্তার বিস্মিত হতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন রোগী বেঁচে থাকার কথা নয়। দেশপ্রেম আর যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার ঐকান্তিক মনোবল ছাড়া এমন মারাত্মক আহতরা বেঁচে থাকা অভাবিত। অসম্ভবকে সম্ভব করার আরেক নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় মনা রানী ও তাঁর স্বামী বি কে রঞ্জিত, বোন মঞ্জু রানী নিজেদের উজাড় করে বিলিয়েছেন। তাঁরা নমস্য। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁরা কোটালীপাড়ার, তাঁদের নাম মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে স্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের অনেকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতায় কায়ক্লেষে বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য অনেকে তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত অবস্থায় এখনো জীবিত। কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের এই দুই-আড়াই যুগ পরেও হাসপাতালে এসে চিকিৎসক-কর্মি-সেবিকাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতিভালোবাসা জানিয়ে যান।

সে দিনের শেল-গুলিবিদ্ধ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ আর্তনাদের দুঃখ-কষ্টের হৃদয় বিদারক দৃশ্য আজও উপস্থিত জনতা, ডাক্তার ও সেবিকাদের স্মৃতিতে অম্লান। চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে আর্ত-মানবতার নামে স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ পেয়ে মুক্তি হাসপাতালের স্টাফরা ধন্য। একে একে নিভিছে দেউটির মতো, দুর্দিনে এই মুক্তি হাসপাতালে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই মানুষগুলি ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন। বরিশাল শেরে বাংলা হাসপাতালের ম্যাট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন রক্ষাকারী মূল্যবান ঔষধ পাঠাতেন মুক্তি-হাসপাতালে। মনা রানী ব্যানার্জির মতো বহুতর মানুষের মাধ্যমে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বলে-কয়েই সুপ্রিয়াদের থেকে ঔষধ আনা হতো। অস্ত্র হাতে না নিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন রক্ষায় কি করা যায় তারই বিশ্বস্ত ও উজ্জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সুপ্রিয়া। অবসর প্রাপ্ত বয়স্কা ম্যাট্রন গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হলেন গৈলা স্মৃতি শহিদ হাসপাতালে। আজীবন যিনি মানুষের সেবা করলেন, আজ তিনিই অন্যের সেবা নিতে হাসপাতালে ভর্তি। গৈলা স্মৃতি শহিদ হাসপাতালের ডাক্তার বন্ধুরা যথেষ্ট চেষ্টা করেন আজন্ম মানবসেবী ম্যাট্রনকে বাঁচাতে। কিন্তু জাগতিক নিয়মেই ১৯৯৩-এর আগস্টে তাঁর স্বামী অশ্রু কুমার বিশ্বাসকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। আহত মুক্তি সেবায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান এ-দেশ ও জাতি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে।

মুক্তি হাসপাতালের সেবিকাদের পাক আর্মির হাতে নির্যাতিত হওয়ার জীবন্ত প্রমাণ রয়েছে। মনা রানী ব্যানার্জি দু'দুবার পাক মিলিটারির হাতে পাকরাও হন। প্রথম বার গৌরনদীতে ধরা পড়লে প্রাণে রক্ষা পান একজন রিক্সাচালকের সৌজন্যে। মুক্তি-সেবিকা আরোহিনীকে বাঁচাতে পাক মিলিটারি হাতে দুর্দান্ত মাইরে রক্ষক রিক্সাচালক রিক্সাশুদ্ধ ছাতুগুঁড়া। দ্বিতীয় বার পাক আর্মির হাতে তিনি ধৃত হন পয়সারহাটে। মরহুম

ডাক্তার শামসুদ্দিন বাহাদুর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মুক্তি-সেবিকার প্রাণ বাঁচান। কর্তব্যের খাতিরে মুক্তিযোদ্ধা নারী তখন সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে যোতেন। দেশ স্বাধীনের একাগ্রতায় দায়িত্ববোধ সামনে নিয়ে ছুটতো মুক্তি পাগল যোদ্ধা নরনারী। তাঁদের আত্মচিন্তা, কিংবা পেছনে তাকাবার সময় ছিলো না। অগণিত মানুষের স্নেহ ভালোবাসা ধন্য এই মুক্তি-সেবিকার দুঃখের প্রতিদানে তাঁদের কি দিতে পেরেছি আমরা?

এমনি মুক্তি-হাসপাতাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিলো কোটালিপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে। ১৪ মে ১৯৭১ এর উদ্বোধন করা হয়। ৫ জন নিয়মিত ডাক্তার সেখানে নার্সিং ও চিকিৎসা কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন।

স্বাধীন দেশে মুক্তি হাসপাতাল সমাচার

১৯ মার্চ ১৯৭২ ঃ 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত খবরের অনুলিপি ঃ

পয়সার হাট মুক্তিবাহিনীর জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। (সংবাদ দাতা প্রেরিত)।

গৌর নদীঃ বরিশালের একটি গ্রাম পয়সার হাট। ঐ গ্রামের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সংগ্রামী প্রেরণা স্বাধীনতা আন্দোলনে জুগিয়েছিল দুর্বার শক্তি। অস্ত্র হাতে নয় মানবতার সেবায় তারা হাত বাড়িয়েছিল।

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ১৯৭১ সনের আগস্ট মাসে পয়সার হাটে মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। ডাঃ বি. কে. রঞ্জিত, স্ত্রী মনা রানী ব্যানার্জি ও তাঁর বোন মঞ্জু রানী রায় সর্ব প্রথম অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই হাসপাতালের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে এই হাসপাতালে ৪ ডাক্তার ৪ সেবিকা ও দুইজন কম্পাউন্ডার সেবা কার্যে নিয়োজিত আছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তুলতে এই হাসপাতালও দেশবাসীর সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করে জনসাধারণের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই হাসপাতালে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বহু অসুস্থ রোগীও অসুবিধায় পড়ছে। স্থানীয় লোকের ধারণা, এই জাতীয় মহৎ কার্যে সরকার এগিয়ে এলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

স্বাধীন দেশে মুক্তিবাহিনীর হাসপাতালটি, পয়সারহাট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে রূপ নিলে তার সকল দায়দায়িত্বের ভার সরকার বহন করেন। যুদ্ধক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এতে অপার আনন্দ। কিন্তু হায় দুর্ভাগা দেশ, প্রাজ্ঞদের কে রাখে স্মরণে। মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল নামের ছোঁয়া পর্যন্ত সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন। জীবন ঝুঁকিতে যে-সব ডাক্তার, সেবিকা মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল গড়েন তাঁদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। সে-সব

অর্বাচীন ফালতুরা সরকারি কাজে নেই। প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বি কে রঞ্জিত, তাঁর স্ত্রী ধাত্রী-সেবিকা মনা রানী ও শ্যালিকা মঞ্জু রানীর জন্য আধুনিক হাসপাতালে কাজের দ্বার রুদ্ধ। নতুন দিনে ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, আয়া সবই আছেন। নেই কেবল প্রতিষ্ঠাতা বোকা ছোট লোকেরা।

মোমেলা খাতুন

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মেয়ে মোমেলা খাতুন। তাঁর ঠিকানা ঃ মোমেলা খাতুন, স্বামী ঃ বাদশা মিয়া তালুকদার, গ্রাম ঃ সোনার গেতা, থানা ঃ কোটালি পাড়া, জেলা ঃ গোপালগঞ্জ (প্রাক্তন বৃহত্তর জেলা-ফরিদপুর)। তাঁর স্বামী ও পরিবারের প্রতিটি সদস্য মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত বাহিনীর সূচনা থেকে যুদ্ধ ও সাংগঠনিক প্রতিভার বিরল গুণে গুণান্বিতা মোমেলা। তাঁর অস্ত্র চালনার সূক্ষ্ম নিপুণতা, সাহস ও বীরত্বে বহু মুক্তিসেনাই হার মেনেছেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি অন্যদের অনুকরণীয়। সশস্ত্র সম্মুখ রণে ভয়ভীতি কি তিনি জানতেন না। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সক্রিয় যুদ্ধে অকুতোভয় মহিলা শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাতেন। এককালের এই বীরাঙ্গনা সাহসিনী মহিলা আজ ছয় সন্তানের জননী। অভাবের সাথে স্বভাবতই লড়াইতে অতীত স্মৃতির চারণে আজ তাঁর দীর্ঘশ্বাস। হায় স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মুক্তি মাতা!

পুষ্প রানী হালদার

১৯৭১ সালের এস এস সি'র ছাত্রী। পাক-বাহিনীর প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যান। তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রমেশ চন্দ্র বিশ্বাসও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। জাতিতে সিডিউল কাস্ট হিন্দু হলেও সাহসে তাঁর সাথে টেক্কায় অনেকেই খাবি খেয়েছেন। সেবিকা প্রশিক্ষণের সাথে স্থানীয় প্রশিক্ষণ সেন্টারে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন তিনি। বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর সাহস ও যুদ্ধকৌশলের স্বাক্ষর রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্যা নায়িকা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কোমলমতি বাঙালি শিশুদের শোনান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চার সন্তানের জননী পুষ্পরানী পুষ্পের মতোই এদেশকে বিকশিত করুন। তাঁরই আলেখ্যে মুক্তিযুদ্ধের একটি গোপনীয় যাচাই ফরমের নমুনা দেওয়া হলোঃ

"গোপনীয়"

দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

মুক্তিযোদ্ধা বিবরণ

১.	নাম	ঃ পুষ্প রানী হালদার (বিশ্বাস)
২.	পিতার নাম	ঃ রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৩.	বর্তমান ঠিকানা	ঃ আগরকান্দা, পো: কোটালিপাড়া, উপজেলা: কোটালিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ

৪.	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ - ঐ -
৫.	জন্ম তারিখ/ বয়স	ঃ ১০/১/১৯৫৮
৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ এস এস সি পাশ
৭.	সেক্টর ও সাব-সেক্টরের নাম ও কমান্ডারের নাম	ঃ ৯ / ৮ নম্বর সেক্টর, মেজর এম. এ. জলিল
৮.	কোথায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন (ভারত/বাংলাদেশ)	ঃ বাংলাদেশ
৯.	ট্রেনিং সেন্টারের নাম ও ট্রেনিং-এর মেয়াদ	ঃ কোটালিপাড়া জহরের কান্দি ট্রেনিং সেন্টারে মেডিক্যাল সেবিকা হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
১০.	এফ এফ নং	ঃ ২১৭৬
১১.	যুদ্ধকালীন যে কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার নাম ও যেখানে যেখানে অংশগ্রহণ করিয়াছেন সেইসব স্থানের নাম ও তারিখ	ঃ কোটালিপাড়া হেমায়েত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হেমায়েতউদ্দিন বি বি, মেডিক্যাল সেবিকা
১২.	প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় কমিটির পূরণকৃত ফরম নং	ঃ - ৫ - ০১৬৫৬৩
১৩.	বর্তমানে কি করিতেছেন এবং কি করিতে ইচ্ছুক	ঃ ভালো চাকরি করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে প্রাইমারি শিক্ষয়িত্রী
১৪.	পারিবারিক বা নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতি	৮০,০০০.০০ টাকা।
১৫.	অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	সেবিকার কাজের মধ্য দিয়া সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

অঙ্গীকারপত্র

আমি পুষ্পরানী হালদার পিতা সং রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, অত্র ফরমের উপরে লিখিত বিবরণাদি যাহা আমা কর্তৃক লিখিত/বর্ণিত হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য। উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি [যদি] ভূয়া বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর নাম ও ঠিকানা — পুষ্প রানী হালদার

১। ---------- ফেরধরা, কোয়াল পাড়া, গোপালগঞ্জ

২। ---------- ফেরধরা, কোয়াল পাড়া, গোপালগঞ্জ

আবেদনকারীর উপরে লিখিত বিবরণাদি সম্পূর্ণ সত্য এবং সে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। যদি উহা ভূয়া বা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহার জন্য আমি দায়ী থাকিবো। এমতাবস্থায় আমার বিরুদ্ধে সংসদের আইনানুগ যে-কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

আঃ হাকিম বিশ্বাস	ইউনিট কমান্ডারের নাম বা পদবী
উপজেলা কমান্ডারের নাম/ পদবী	সীলমোহর ও স্বাক্ষর
	গোপালগঞ্জ উপজেলা ইউনিট আহবায়ক/কমান্ডার
এবং সীলমোহরসহ স্বাক্ষর	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরানী হালদার

পরিচয় ঃ জন্ম ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ। অতি শৈশবে পিতৃহীন। আগে পাছে যার কেউ নেই ভগবান তার সহায়। গরিব মায়ের অনেক কষ্টে-সৃষ্টে বুকে-পিঠে গড়া মেয়ে মঞ্জু। দোরে দোরে হাত পেতে মা তাঁর মেয়েকে মানুষ করেন। ম্যাট্রিক পাস করে নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন মঞ্জু রানী। এই মহতী নারীযোদ্ধার ঠিকানা ঃ

নাম ঃ মঞ্জু রানী হালদার (শিক্ষয়িত্রী), প্রযত্নে - পিটার হালদার, গ্রাম ঃ রাজিহার, থানা ঃ গৌরনদী. জেলা ঃ বরিশাল

মুক্তিযোদ্ধার নার্সিং হোম

বরিশাল জেলার তাশকোড় গ্রামে অবস্থিত এই মুক্তি হাসপাতাল। পরিত্যক্ত হিন্দু অধিকারী বাড়িতে হাসপাতালের অবস্থান। অত্যাচার ও প্রাণ ভয়ে বাড়ির সবাই পালিয়ে ভারতে শরণার্থী হয়। পরিত্যক্ত বাড়ি বিধায় সেটি শত্রুর শ্যেন দৃষ্টির বাইরে। মুক্তি হাসপাতালের আশপাশেই চলেছে দু'দলের প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাক-মুক্তি ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার যুদ্ধ। তারই মাঝে মুক্তি হাসপাতালে সেবিকার কাজে নিয়োজিত মঞ্জু রানী। অনেক বিখ্যাত-অখ্যাত যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকের পদভারে ধন্য ছোট এই মুক্তি হাসপাতাল। দূরদূরান্তের ডাক্তারগণ সপ্তাহে বা ১০/১২ দিনে একবার আসতেন। জরুরি প্রয়োজনে যেন তাঁরা মাটি খুঁড়ে তাৎক্ষণিক উদয় হতেন। রোগীর ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা, ব্যান্ডেজের যা যা করতে হবে সেবিকা মঞ্জুকে ডাক্তারগণ তার নির্দেশ দিয়ে যেতেন। রোগীর ড্রেসিং, ঔষধ সেবন, খাবার-দাবার পরিবেশনে উদয়াস্ত খাটতেন তিনি। নিষ্প্রদীপ প্রত্যন্ত অজ পাড়া গাঁয়ে রোগীর ঘর থেকে ঘর, বেড থেকে বেডে মোমবাতি/কুপি/হ্যারিকেন হাতে ছুটতেন মঞ্জু। ঔষধ-পথ্যের আহামরি তেমন বিশেষ প্রাচুর্য ছিলোনা। শত্রুর ভয়ে কুপি জ্বালানোও অনেক সময় বারণ ছিলো। অন্ধকারে আন্দাজে মায়াহরিণীর মতন ছুটতেন সেবিকা। পায়ের আওয়াজে রোগীর চাঞ্চল্য এই বুঝি এলো! বিছানার পরশে, মাথায় সেবিকা হাতের ছোঁয়ায় রোগী আশার আলো এবং

খাঁচার তাগিদ পেতেন। সব না পাওয়ার মাঝে নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেম-ভালোবাসার ডালিতে হাসিমুখে রোগীর রোগ সজ্জায় হাজির সেবিকা। দুর্যোগের কাল রাতের দিনগুলিতে আহত মুক্তিদের চোখে মা মঞ্জু রানী বাঙালি 'লেডি ইন দা ল্যাম্প ফ্লোরিয়া নাইটিংগেল'-এর মতোই মঙ্গল দাত্রীর পূজায় পূজিত ছিলেন।

আহত মুক্তিদের ক'জন ঃ অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তির করুণ আর্তনাদে ভরপুর দূর পল্লির মুক্তি হাসপাতাল। বড় আশায় বুক বেঁধে অনেক অজ্ঞান, মুমূর্ষুকে হাসপাতালে এনেছেন তাঁদের যুদ্ধসঙ্গীরা। হতকে আহত জ্ঞানে আনেন হাসপাতালে। অনেকে আনার পথে, হাসপাতালে এসে আল্লাহ ও জয়বাংলার দীর্ঘশ্বাসে বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁদের বড় আশা ছিলো ডাক্তার সেবিকার হাতে পড়লেই তাঁরা বেঁচে যাবেন। ভ্রমান্ধ মানব। দেশের তরে হারিয়ে গেলেন অনেক কৃতী সন্তান। সংজ্ঞাহীন সংজ্ঞা ফিরে পেতেই খোঁজ নেন যুদ্ধের সাথীদের, বাহিনী প্রধান হেমায়েতের। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুক্তি সহমর্মিতা। হতাহতের সঠিক হিসাব করবে অনাগত ইতিহাস। মাত্র তিন জনের স্মৃতি অনেকের মানস পর্দায় চিরঞ্জীব, ভাস্বর।

মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনের পা উড়ে যায় যুদ্ধে। মুমূর্ষু রোগী এলেন হাসাপাতাল। সংজ্ঞা ফিরে পেতেই উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। হুংকার ছেড়ে অস্ত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে পড়ে গেলেন। হায় মুক্তি! প্রাণের চেয়ে বড় তাঁদের দেশের সম্মান। সবার উপরে তাদের দেশপ্রেম। পরবর্তীতে বিদেশ থেকে নকল পা নিয়ে ফিরে আসেন। কিছুদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন। এখনো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণের জন্য বেঁচে আছেন তিনি পংগু মুক্তিযোদ্ধা নামে।

উরুতে গুলিবিদ্ধ রকিব এলেন। ন্যায়ের ধ্বজাধারী ইসলামি ফৌজের অন্যায় সমরে তিনি আহত। পলায়নপর শত্রুকে সরে পড়ার সুযোগ দিতে তাঁর অস্ত্র সংবরণ। আর তারই সুযোগে তাঁর উরুতে বিদ্ধ হয় শত্রুর গুলি। ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ আহত রকিবকে দেখলে উরু ভঙ্গ দুর্যোধনের স্মৃতিই মনে ভাসে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের যুদ্ধরীতি বহির্ভূত গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়।

শত্রুর গুলিতে আহত হাসমত এলেন হাসপাতালে। সম্মুখ সমরে তিনি আহত। হামাগুড়িতে শত্রুকে ধাওয়া করেছেন। তাঁর সাহসের মুখে শত্রুকে পালাতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তিনি আসতে চাননি। চলৎ-শক্তিহীন মুক্তিকে জোর করে চ্যাংদোলায় করে আনা হয় মুক্তি হাসপাতালে।

এমনি কতোনা অখ্যাত-বিখ্যাত পুত্রদের চিকিৎসাধন্য মুক্তি হাসপাতাল। হাসপাতালের ঔষধ আসতো পয়সার হাট, গৌরনদী, আগৈল ঝাড়া, বরিশাল শেরে বাংলা হাসপাতালের ম্যাট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস, ডাক্তার রঞ্জিত ব্যানার্জি ধরনের মহাত্মা ও বহুতর প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সৌজন্যে। এসব দান ও যৌথকর্ম শত্রুর হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু ছিলো অবধারিত। স্বাধীনতার নামে মানুষ হাসিমুখে সব বিপদ আপদ মেনে নিতো।

হায় সে-সব মুক্তি হাসপাতালের ইতিহাস ও কর্ম-পদ্ধতি স্বাধীন দেশে গৃহীত হলে এদেশের মানুষের বিনা চিকিৎসায় মরতে হতো না।

পথের বন্ধু পথই মিলায় ঃ গল্প সত্যি কথাকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষ গল্প করেও লেখে। কল্পনায় ছোয়াঁচের বিষাদ করুণ সত্যের নির্মম সত্য মঞ্জু রানীর সংসার।

মুক্তির আশ্রয়-বাড়ি সন্দেহে হিন্দু বাড়ি ঘেরাও করা হয়। রাজাকার-পাক আর্মির যৌথ অপারেশন। বাস্তবে পাক সাঙাত রাজাকাররাই মুক্তি আস্তানার সন্ধান দিয়ে খানসেনাদের নিয়ে আসে। মুক্তি মুক্ত কাফের বাড়ি। বুত পরশতির (মূর্তি পূজার) মূর্তি দেখে তাঁরা নাখোশ। মুক্তি পাওয়া যায়নি তাতে কি? ইয়ে তো জরুর কাফের মোকান। কাফের খতমে পাপ নেই।

পুরুষদের ধরে এনে তাদের দ্বারা গাছ থেকে কচি ডাব নামিয়ে পাক খাসিরা তৃষ্ণা নিবারণ করে। গাছ থেকে পাড়ানো ঝুনা নারিকেল। বাড়ির মানুষদের মাধ্যমে নারিকেল -চিড়া-মুড়ি-গুড়-কলা-দুধে তাদের উদর পূর্তি হয় ফলারে। সবার সঙ্গে তাদের অবাক করা স্বভাবের ব্যবহার। পাকবাহিনী স্পিড বোটে করে আসে। বিদায় লগ্নে তারা যেন আতিথ্যের বিদায় অভ্যর্থনার ছলে খাল পাড়ে রাখা স্পিড বোটের কাছে ডাকলো। সরল বিশ্বাসে রাজকীয় সশস্ত্র অতিথিদের বিদায়ে স্পিড বোট ঘাটের খাল পাড়ে দাঁড়ায় অনেক মানুষ। এদের নয়জনকে এক লাইনে দাঁড় করায় পাক আর্মি। তাদের সশস্ত্র মসকরায় নিহত হয় হতভাগ্য ৯ জন বাঙালি। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	বয়স	পরিণতি
১।	জয়নাল হালদার	হরিণাথ হালদার	৪০	গুলিতে তাৎক্ষণিক মৃত্যু
২।	সুমেল হালদার	হরিণাথ হালদার	৩৬	"
৩।	নরেন্দ্র নাথ হালদার	হরিণাথ হালদার	৩৫	"
৪।	টমাস হালদার	নরেন্দ্র নাথ হালদার	২৮	"
৫।	অগাসচিন হালদার	নরেন্দ্র নাথ হালদার	২৫	"
৬।	বিমল হালদার	ভোলা নাথ হালদার	৩৫	"
৭।	দানিয়েল হালদার	দেবেন্দ্র নাথ হালদার	২৭	"
৮।	সুকুমার হালদার	রাজেন্দ্র	৩৬	"
৯।	মুকুল হালদার	সুমেল	১৫	"

সবক'টার মরণের সওয়াবে ঝুলি ভরে পাক আর্মি বিদায় নেয়। হায়রে মানুষের প্রাণ। সহজে কি যায়! আহতদের মধ্যে দুই জীবন্মৃত মুমূর্ষুকে মিশনারিরা পরবর্তীতে বরিশাল

হাসপাতালে নিয়ে যান। অলৌকিক ভাবেই আহত দু'জন রক্ষা পান। এমনি আগন্তুক আহতদের কুড়িয়ে নিয়ে মিশনারিরা চিকিৎসা করেন। মিশনারিদের কুড়িয়ে নেওয়া এমনি যমঘর উতরানো রক্ষা পাওয়া হতভাগ্যদের একজন মিস্টার পিটার হালদার। পিটারের বাবা, বড় দুভাই ও এক ছোট ভাই পাক হাতে নিহত হয়। স্বজন হারানো মহাশ্মশানে পিটার আশ্চর্য ধরনের পাগল প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। অচল পিটারকে ফিট করতে যোগ্য ফিটার মিলে না। পিটারের করুণ কাহিনী জনশ্রুতির কল্প কথায় গল্পের মতন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

মায়াময়ী মঞ্জু রানী পিটারের উদ্দেশ্যে সেবার হাত বাড়াতে চাইলেন। এক নিষ্প্রাণ তরুণ বাঙালি যুবকের করুণ কাহিনী নীরব অশ্রু ঝরায়। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে জীবন্মৃত আহতের সাথে যোগাযোগ সেবার করুণা প্রেমের যমুনায় ভেসে গেলো। মুক্তি সেবিকা পাক নির্যাতিতের পূজারিনীতে আবির্ভূত। পিটারের ভালো ফিটার হিসাবেই কাজে লাগলেন। সেবার করুণা প্রেম যমুনার পরিণতি প্রেমের পরিণয়ে। অর্থ বিত্তের উর্ধ্বে ভালোবাসার বিজয়। বিয়ের সময় পিটার নিতান্ত নিঃস্ব। তাঁর তখন বিদ্যে বৈভব কিছুই ছিলোনা। সেবিকার সেবার পরশ, মায়া মমতার মোহের স্মৃতি বিজড়িত বাসর ঘর। মঞ্জু রানীর মতো দরাজ দিলের হৃদয় উজাড় প্রেমিকার স্নেহ ভালোবাসা না পেলে পিটার হালদার বাঁচতেন কিনা সন্দেহ। দৈবক্রমে বেঁচে গেলেও বদ্ধ উন্মাদ মানুষটির সুস্থ হওয়া ছিলো বিতর্কিত। প্রেমপূজারিণীর বিজয়। স্বামী পিটার পেলেন নতুন জীবন।

পূর্বে উল্লিখিত নিহত-আহতদের নয়জনের সবাই মঞ্জু রানীর শ্বশুরের আপনজন। যমের হাত ফসকে রক্ষা পাওয়াদের দুঃখ স্বাধীনতার বেদিমূলে উৎসর্গকৃত শহিদদের ব্যাপারে কি ইতিহাস বিস্মৃত! তাঁরা কি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন!

মঞ্জু রানীর সংসার ঃ ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ সংস্থায় কাজ করে স্বল্প আয়ে চলে মঞ্জুরানীর সংসার। তাঁর মা-বাবা আজ পরলোকে। তাঁর ভাই বোনদের আলাদা সংসার হয়েছে। তিন ছেলে ও এক মেয়ের সংসারে দুঃখ-কষ্টের নিত্য সাথীর সত্যি জীবনে সুখ খোঁজেন মঞ্জুরানী। স্বাধীন দেশে সে সুখের হরিণ কবে আসবে কে জানে?

স্বগত স্বস্তি ঃ স্বাধীন দেশে মানুষের স্বার্থপরতা মনকে ব্যথিত করে, বেদনা দেয়। হতবাক হয়ে ভাবি মানুষ এমন স্বার্থপর হয় কি করে? এতো জলজ্যান্ত অতীতের দুঃখ-বেদনা-হাহাকার- জীবন-মৃত্যু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত কেন? মুক্তিযুদ্ধকালে তো মানুষ এমন স্বার্থপর, মামলাবাজ, পরশ্রীকাতর, লুটেরা ছিলোনা। কোট কাচারি বন্ধ ছিলো, দেশ কি চলেনি? স্বাধীনতার স্বপ্ন-রঙিন আলোয় মদির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় মানুষ সর্বস্ব দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। হায়! এতো শীঘ্র নিকট অতীতের দুর্দিন ধুয়ে মুছে ভুলে গিয়ে পাপে ডুবছে মানুষ। চোখের জলে আত্মধিক্কারের অভিশাপের ইচ্ছে জাগে, চোখে আসে জলভরে। যে সব মানুষের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জীবনের মায়া মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা ত্যাগ করে

মুক্তিযোদ্ধারা মরণ প্রাণ পার করলো তাঁরা সামর্থ থাকতে একটা ঘষা আধলায় উপকারীর সাহায্য তো দূরের কথা মৌখিক ধন্যবাদের সৌজন্য-স্মরণেও কঞ্জুস! মুক্তির সাহায্যে কতো কিছু অসার গল্প শোনাই সার। মঞ্জু রানী ভাগ্যে কিছুই মঞ্জুর হয় না।

যে দিন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহতদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিলো না, সে দিন শূন্য হাতে সেবার মালা নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কি আছে মোর কি পেরেছি দিতে! হৃদয় উজাড় করা স্নেহ মমতা ভালবাসায় তাঁদের সেবা করেছি। সকল পাওয়া না পাওয়ার উর্ধ্বে মুক্তি-সেবিকার এটাই গৌরব। আর কিছু না পাই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন দেশ তো পেয়েছি। স্বাধীন দেশে আমার সন্তানরা বাড়ছে। আর কিছু না পারি আজীবন আপন সন্তানদের শুনিয়ে যাব নিজের চোখে দেখা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের অমর কাহিনী। জয় তু বাংলা। জয় তু শহিদান।

শ্রদ্ধাঞ্জলি 'অঞ্জলি চৌধুরী'

পাক আর্মির প্রতিশোধ স্পৃহা ঃ পাক আর্মির আতংকের ত্রাস ফরিদপুরের হেমায়েত রাজার আসনে রাজত্ব করছেন 'রাজাপুর' গ্রামে। হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়াটার তখন 'রাজাপুর'। ১৪ জুন, ১৯৭১ পাক দুর্গ 'কোটালিপাড়া' থানা দখলে মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় সাফল্যে পাকআর্মির নাভিশ্বাস ওঠে। সে নৈশ অভিযানে চব্বিশ জন পাক শত্রু জীবন্ত ধৃত। প্রায় বিশজন বাঙালি রাজাকারও নিহত হয়। মুক্তি-রতনের শ্রেষ্ঠ বীরদের অন্যতম হেমায়েত বাহিনী প্রধানের বডিগার্ড, জয়দেবপুর থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত অকুতোভয় বীর যোদ্ধা 'কাপাসিয়া' থানার ইব্রাহিমের কালজয়ী শাহাদত।

১৫ জুন, ১৯৭১ 'রাজাপুর' গ্রামে সামরিক আদালতের বিচারে চব্বিশ জন যুদ্ধ কলংকের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। 'রাজাপুর' গ্রামের অযত্ন অবহেলার নাম নিশানাবিহীন পাশাপাশি কবরে চির নিদ্রায় নিদ্রিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ দুদলই।

রাজাপুরের রাজকীয় যুদ্ধ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় 'কোটালিপাড়া' থানার যুদ্ধে ঘৃণ্য পরাজয়ের প্রতিশোধে পাক আর্মি জিঘাংসার তৃতীয় রাউন্ডের যুদ্ধ সংঘটিত হয় 'হরিণাহাটি' গ্রামে ২১ জুন। মুক্তি সদর রাজপুরে পাক-আর্মি মরিয়া আক্রমণ রচনা করে। জলাভূমির অথৈ সায়র দিয়ে তারা নৌ-পথে গাটবোট সহযোগে আক্রমণ করে। অতুলনীয় শৌর্যে অস্তিত্ব রক্ষায় মুক্তিবাহিনী মরণপণ লড়াইয়ে নামে। 'রাজপুর' মুক্তিঘাঁটি রক্ষায় নিয়োজিত মুক্তিসেনা সুইসাইডেল স্কোয়াডে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর আত্মঘাতী শৌর্যে আমৃত্যু লড়াইর দীপ্ত শপথে উদ্দীপিত। সারা অঞ্চলে যে-কোনো মূল্যে মুক্তি ঘাঁটি রক্ষায়, মানব তরঙ্গের শেষ চেষ্টায় মুক্তিবাহিনী রক্ষায় উৎসব মুখর খেলার রণ সজ্জা। বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমির মানুষের ইজ্জতের লড়াই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নরনারী নির্বিশেষে আমৃত্যু শপথে এসে দাঁড়ায় এক কাতারে। সে এক মর্মস্পর্শী জাতীয় চেতনার সঞ্চারী জনগণ চেতনার মুক্তিযোদ্ধার যার যা আছে তাই নিয়ে সবাই শত্রু হননে প্রস্তুত।

মুক্তি-জনতার মরণযজ্ঞের যুদ্ধের মুখে শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে রণে ভংগ দিয়ে 'রাজাপুর'

থেকে পালাতে হয়। রাজাপুর থেকে পশ্চিমা রাজাকারা গানবোট নিয়ে পালিয়েও রক্ষা পায়নি। তাদের প্রাণ বোট থামাতে মৃত্যুঞ্জয়ী লা-পরোয়া মুক্তির জীবন বাজিতে 'সাতলা' পর্যন্ত শত্রু গানবোটকে ধাওয়া করে শিয়াল তাড়া তাড়িয়ে নেয়।

মুক্তির আশ্রয়ে বঙ্গ মাতা ঃ সারাদিনের যুদ্ধে মুক্তিরা অভুক্ত। এলাকার মা-বোনেরা উদ্বিগ্ন। স্থানীয় সিডিউল কাস্ট শিক্ষিত চৌধুরী পরিবারের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী অঞ্জলি স্বত:স্ফূর্ত উদ্যোগে জনতা বিজয়ী মুক্তি অভ্যর্থনার আনন্দে মাতোয়ারা। মাইনরিটি এলাকার বেশ কিছু মেয়েকে সংঘবদ্ধ করেন অঞ্জলি। বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনার আনন্দে আত্মহারা মেয়েরা যার যার পুকুরে নিজেরাই জাল নিয়ে নামে মাছ ধরতে। মুক্তিসেনাদের খাবারের জোগাড়ে প্রচুর মাছ ধরা হয়। পরম মমতা ও যত্নে অনেক রকমের খাবার বানায়। মুক্তি শিবিরে খাবার আনতে বিরূপ অভ্যর্থনা। ক্যাম্প হাবিলদার মেজর আব্দুস সাত্তার মৃধা যথানিয়মে সংবাদ পাঠায় ক্যাম্প কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের নিকট। বিগলিত শ্রদ্ধার সম্ভ্রমে খাবার প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বুকভরা আশা নিয়ে আসা মেয়েদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারে সাতঘাটের বাধা ডিঙিয়ে আবেগাপ্লুত কৃতাঞ্জলিপুটে রোরুদ্ধমান অঞ্জলি হেমায়েতের সামনে। ছিঃ মুক্তি ভাই। বহু সম্মানে মুক্তি বোনের যৎসামান্য তুচ্ছ খাবারের এই প্রতিদান! স্বাধীনতা যোদ্ধার কাছে অন্যতম অস্পৃশ্য শ্রেণীর এই আদর! মুক্তি নেতার প্রশ্নের জবাবে তাঁর নির্ভীক কণ্ঠের অভিমানের উত্তর। বিজয়ী মুক্তি ভাইদের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে খাবার এনেছি। মায়ের ভালোবাসার আদরের খাবারে অবমাননা করতে নেই মুক্তি ভাই। মায়েদের কথা কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই খাবার মুক্তি ক্যাম্পে আসেনি। বীর প্রসবিনী বাংলার মায়ের দান মাতোয়ারা এলাকাবাসী মাতৃস্নেহের জারক রসে মিশ্রিত খাবার গ্রহণে বাধ্য হলেন মুক্তি কমান্ডার। মেয়েটির সাহস সবাইকে মুগ্ধ করে।

নারী মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জলি ঃ দজ্জাল মেয়েকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করেও যুদ্ধবিমুখ করা গেলো না। অঞ্জলি চৌধুরীর নেতৃত্বে পঞ্চাশটি মেয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার নামে সেদিন মুক্তিযুদ্ধের ব্রতে আত্মাহুতির দীক্ষা মন্ত্রে শহিদের রক্তের নামে মাটি ছুঁয়ে অগ্নি শপথ নেয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি লহ অঞ্জলি ঃ এমনি কতোনা অঞ্জলি চৌধুরানীরা মুক্তিযুদ্ধের রক্তে মাংসে ছড়িয়ে আছেন। কতোনা অমিত তেজোময়ী নারী যোদ্ধা আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকের যৌবন গিয়ে বুড়িয়ে গেছেন। তাঁদের গৌরবের সৌরভ ধন্য [illegible] এ-জাতি ধন্য। অনেক প্রখ্যাত নারী যোদ্ধা ভারতে প্রস্থান করেছেন। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনে, মাতৃকা স্মরণে তাঁদের অবিস্মরণীয় বিস্মরণের স্মৃতির সংরক্ষা আবশ্যক।

ইতিহাসের নির্মম সত্যের অকপট স্বীকারে লজ্জা নেই। হেমায়েত নারীবাহিনীতে অমুসলমান সংখ্যালঘু হিন্দু মেয়েদের সংখ্যা বেশি। স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টান মেয়েও মুক্তি বাহিনীকে গৌরবান্বিত করেছেন। মুক্তিবাহিনীতে হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা ছিলো কম। স্বদেশ স্বদেশই। আর বিদেশ হিন্দু-মুসলমান যারই হোক।

অঞ্জলি চৌধুরীর মতো নারী মুক্তিদের এ-দেশ এ-জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তাঁদের কোল আলো করা বীর সন্তানে স্বর্গ হোক সোনার বাংলা। অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে অবলা বাঙালি নারীরা হোন তার সবলা নিদর্শন।

অঞ্জলি পরিচয় ঃ অঞ্জলি চৌধুরী, পিতা ঃ অধর চন্দ্র চৌধুরী। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-বাগবাড়ী, পোস্ট অফিস-রামশীল, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানাঃ প্রযত্নেঃ বড় ভাই উপেন নাথ চৌধুরী, ইংরেজি ভাষার সিনিয়র শিক্ষক, আরামবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, মতিঝিল-ঢাকা -১০০০।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বর্তমানে আমেরিকায় পি এইচ ডি করছেন। জাতীয়তা-জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। জন্ম তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ। স্বাধীনতা যুদ্ধ সনদ ঃ ১. দুই নং সেক্টরের অধীনে তিনি যুদ্ধ করেন। ২. দেশ রক্ষা বিভাগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র এম. এ. জি. ওসমানী স্বাক্ষরিত; ক্রমিক নং-১,৭৫,৭২৩।

গোকুলে বাড়িছে ঃ তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। বিচ্ছু কন্যা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরাঙ্গনা মধ্যমণির গৌরবের যশোগাথায় দশদিক আমোদিত হোক। অস্ত্র চালনার যে শক্ত হাত ভাঙতে জানে তা শিখতে জানে পড়তে জানে। মেহেদি রাঙা হাত যে রণাঙ্গনে রক্ত-রঞ্জিতও হতে পারে তার প্রমাণ রাখলেন অঞ্জলি চৌধুরী। বীরঙ্গনার শক্ত হাত দেশ গড়ার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে। অবহেলিত লাঞ্ছিতা বীরাঙ্গনাদের মুখ তিনি উজ্জ্বল করলেন। তোমাদের বধিবে যে স্থলে তোমাদের রক্ষা করবে যে শাসিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তাঁর জয় হোক।

সূচনা ঃ মুক্তিযুদ্ধ দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মুছে যাচ্ছে সিঁথির সিঁদুর একজনের পর একজনের। কামানল তৃপ্ত করেও তাদের ক্রোধানল থামেনা। নারকীয় বর্বরতায় চোখের সামনে পতি-পুত্র, শিশু-বৃদ্ধ হত্যা করেও পাকিস্তানিরা বাঙালিদের রেহাই দেয় না। ধর্ষণের পর ধর্ষণে দুঃখিনীদের অশ্রুবর্ষণে সহর্ষে হাসে পাকিস্তানি-ঘাতক। কাজ সেরে তাদের গোপনাঙ্গে বেয়নেট মারে, স্তন কেটে ঝোলি খেলে। সহযোগী দালালরা সব কিছুতেই হালাল করার ইসলামি ফতোয়া দেয়। চোখের সামনে এসব দেখে অবলারা সবলা হলেন। 'বুক ফাটে তো মুখ ফাটেনা'–রমনীদের ফাটতে এবার কোনটা বাকি? বঙ্গ নারীরা অন্তরের প্রেরণায় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়ান। প্রাণ দিয়ে তাঁদের আগলে রাখেন। ঘরে ঘরে মা-বোন স্বামী-সন্তান যুদ্ধে পাঠিয়ে প্রেরণা সঞ্চার না করলে যুদ্ধ চলতো না। মাতৃমূর্তি জগদাত্রী মায়েরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণশক্তি। বিনা অস্ত্রেও অস্ত্রের চেয়ে শাণিত তেজে কিভাবে যুদ্ধে সাহায্য করা যায় তারই প্রমাণ এ বাস্তব দৃশ্য।

স্বাধীনতার যুদ্ধ কেবল পুরুষেরাই করেছেন এমনি একটা ভাব সকলের। চোখের সামনে কত বধূর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলো। স্বামী হারা, সন্তান হারার অহর্নিশ ক্রন্দন এখনো থামেনি। কিসের টানে লড়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। দেশ মাতা বাংলা-মায়ের মাঝে বিশ্বমায়ের রূপ দেখেছি। নির্যাতিত দেশবাসীর মাঝে প্রিয়জন-আপনজনের বিমূর্ত চেহারা দেখেছি। এমনি কতো দৃশ্য আজো ভাসে হৃদয়পটে। পশ্চিম বঙ্গের বনগাঁ থেকে একবার বিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে এক লক্ষ জনতার ভিড় ডিঙিয়ে যেতে হয়। মানুষের দুঃখ-দৈন্যে লা-জবাব বনে গেলাম। গাড়িতে বসা সুবেদার মেজর মোজাফফর শেষে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার আপনি আমাদের কতো আশার বাণী, বীর জীবনের কথা শোনান। আজ আপনি চুপ কেন?" নিজের অজান্তে অবিরল অশ্রুধারা কখন বয়ে গেছে জানিনা। অগণিত শরনার্থীর মাঝে দুচোখ খুঁজছে আপনজন, 'প্রিয়তমা'।

ঘরসংসার-প্রিয়তমদের হারিয়ে বাংলার নারী আমাদের আশ্রয়-শুশ্রূষা নিরাপত্তার ভার নিয়েছেন। এমনি কিছু অজ্ঞাত-অখ্যাত মহিয়সী নারীর স্মৃতি চোখে ভাসে। ঘর থেকে শুরু করি।

জয়বাংলার রেডিও সমাচার ঃ আগস্ট ১৯৭১। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানা। মিয়া যোদ্ধা ক্যাম্প। কমান্ডার গল্লাইর ইউসুফ। ফুটন্ত তারুণ্যের এম.এ. পরীক্ষার্থী। মহিচাইল মাওলা বকস মিয়ার বাড়ি। দোতালা দালানের বিরাট বাড়ি। ১১ জন মুক্তিযোদ্ধার ক্যাম্প। দালালরা লাগিয়ে দিলো, "মিয়ার বাড়িতে মুসলিম লীগের আড্ডা।"

মিয়ার বড় জামাই এ এফ এম আবদুর রব। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক। কোর্সে গেছেন লন্ডন। তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না আরা রব। ৪ কন্যা নিয়ে বাপের বাড়িতে। মিয়ার ৪র্থ জামাই ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে সরাসরি ক্যাপ্টেন। আছে কি নেই কেউ জানেনা। ক্যাপ্টেনের স্ত্রী পারভিন বেগমও মিয়ার বাড়িতে। মিয়া কন্যা রতনে ধনী। বিয়ের বাকি আরো দুজন। বিপদের দিনে মেয়েরা বাপের বাড়ি। তাই বাড়ি লোকে গম গম।

সংকটে যায় মিয়ার দিন। খানদানি পরিবার অন্যের দরজায় হাত পাততে জানে না। মুক্তিরাও জানে না কিভাবে তাদের আহার চলে।

ভিন্ন গ্রুপের সিলেটের কয়েকজন মুক্তিকে স্থানীয় স্বার্থন্বেষী কয়েকজন ক্ষেপিয়ে দিলো মিয়াবাড়ির বিরুদ্ধে। তারা জানালো মিয়ারা লীগার। পাক দালাল। চুপে চুপে মুক্তি গেরিলা ঢুকলো মিয়ার বাড়ি। দালানের পাশে জানালা বরাবর গ্রেনেড হাতে দাঁড়ান। ঘরে ৪টি মেয়ে নিয়ে জ্যোৎস্না বেগম জয়বাংলা রেডিও মুজিব নগরের খবর শুনছেন। বড় মেয়ে তাছনিমকে "মা জয়বাংলা রেডিওখান জোরে চালাতো খবরটা শুনি।" মুক্তির হাত তখন গ্রেনেডের পিনে। জানালা দিয়ে ছোঁড়ার অপেক্ষায়। অকস্মাৎ হাত থমকে গেলো। মুসলিম লীগাররা তো মুজিব নগর রেডিও শোনেনা! তবে কি ব্যাপার বানোয়াট! সকালে মুক্তি নিজেই সব বলে ক্ষমা চেয়ে গেলো। জয়বাংলা রেডিওটি আকস্মিকভাবে জ্যোৎস্নাকে বাঁচালো।

হানাদারদের পৈচাশিক বর্বরতা ঃ অক্টোবরের শেষে। বিচ্ছুর উৎপাতে কিচ্ছু ঠিক থাকছে না। খানেরা তটস্থ। ১৫ মাইলের মধ্যে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট। শেষ ভরসা। কাফের-দুষ্কৃতকারী চিনাতে তাদের জুড়ি নেই। দালালের সহযোগিতায় হালাল রুজির কাফের নিধনে বেরোয় খানেরা। কারফিউ দিয়ে পূর্ব দিক ঢুকে মুক্তি আস্তানা মহিচাইল নির্যাতনে। আসল উদ্দেশ্য নারী শিকারে লালসা মিটানো।

মুক্তিরা বসেছিল স্বাদের খাবার রুই মাছের তরকারি নিয়ে মিয়ার বাড়ি। খাবার ফেলে হাওয়ায় মিলালো মুক্তি। ফ্রি-ওয়াক ওভার পেলো খানেরা। মিয়ার ভাবনা কন্যাদের নিয়ে। নতুন বউদের ছুপান হলো পাটক্ষেতে। পাশের বাড়ির ১ দিনের নতুন বউ সকাল ১০টায় পাটক্ষেতে ঢুকেন সারাদিন পানিতে নাক জাগিয়ে বাঁচেন। সিংহবাড়িতে এক ব্রাশে শেষ ১৭ জন। নৈয়ার চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে খানরা হানা দেয়। খানদের বিভ্রান্ত করার উপায় উদ্ভাবন করলো মুক্তিরা; ৫ মাইল দূর দোল্লাই নবাবপুরে সশব্দে অয়্যারলেস সেট উড়িয়ে দেয় তারা। খানরা তড়িঘড়ি বিদায় নিলে সবাই বেঁচে যায় খানেদের অত্যাচার থেকে।

খানরা গেলো, কিন্তু দালালকে তো আর সঙ্গে নেয়নি। সুযোগ বুঝে মুক্তিরা চেয়ারম্যানকে চোখ বেঁধে নিয়ে গেলো। গা ছুঁয়ে মাপ চাইতে গেলে মরিচ লাগিয়ে মারে।

দালালের কোনো দেশেই অভাব হয় না। এবার এগিয়ে এলো জ্যোৎস্নার ভাই মাখনের শ্বশুর মুসলিম লীগার দুদু মিয়া চেয়ারম্যান। সাঙ্গ জুটালো দালাল ইউছুফ আলির ছেলে জাহাঙ্গীর রাজাকার ও মহিচাইলের চানু রাজাকারকে। এই গ্রুপ খানদের নিয়ে কঙ্গাই ধ্বংসে এগিয়ে যাচ্ছে। মিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র হানাদার। জ্যোৎস্নার ভাই মুরাদ এগিয়ে গেলো তামাশা দেখতে। রাজাকার জাহাঙ্গীর দয়াপরবশ হয়ে ইঙ্গিতে মৃত্যুর হাত থেকে মুরাদকে সরিয়ে দেয়। বাঘিনীর মতো রোষে লালে লাল জ্যোৎস্না রাইফেল নিয়ে খানদের রুখতে গেলে মুরুব্বিরা তাকে সংযত করেন।

ভোর ৪-টায় খানেরা কঙ্গাই গ্রামে যায়, ফিরে সন্ধ্যা ৬-টায়। তাদের ব্রাশ ফায়ারের শিকার ৩৭ জন। ৮ দিনের বাচ্চাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উপহাস করে মারতে তাদের বিবেকে বাঁধেনি। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। ফেরার পথে সিংহবাড়ি ঘিরে ৯ জনকে বন্দি করে। ২ জন মাত্র বৃদ্ধকে করুণা করে শতায়ু বেঁচে গতায়ুদের শোক করার জন্য রেখে যায়। বন্দিদের মহিচাইল থেকে মাধাইয়ার পথে হাঁটিয়ে আনে উটের পিঠের মতো বাগুলচির পুলে। এ অদ্ভুত ধরনের পুলে উঠানামায় হাঁটিয়ে খেজুর কাঁটা দিয়ে পিটিয়ে মেরে মজা ওড়ায় খানেরা। মহিচাইলের দুদমিয়া চেয়ারম্যান পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। খানেরা বন্দিদের গুলি করে পানিতে ফেলে দিয়ে নির্বিকার চলে যায়।

মুক্তিকর্মী জ্যোৎস্না ঃ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আর বিরোধিদের কাফের বলে হত্যার জন্য দেখিয়ে দিতো রাজাকার-আলবদররা। মহিচাইল গ্রামে ২৪ ঘন্টার কারফিউ। ঢাকা-কুমিল্লা পাকা সড়কের মাধাইয়া থেকে নবাবপুর পর্যন্ত ১০ মাইল রাস্তা টহল দিয়ে পাকিস্তানি-আর্মি যেতেই সবার হৃৎকম্প শুরু। দলে দলে শরণার্থী যায় ভারতে। নাগের বাঘের পাহারায় সুন্দরী মেয়ে জ্যোৎস্না আগুনের খেলায় মেতেছে। শরণার্থী গ্রুপের সাথে যোগাযোগ। মুক্তির আশ্রয়-বার্তা বিনিময়, খাদ্য বিশ্রাম, অর্থসংগ্রহ–এ জাতীয় কাজে উদয়াস্ত লেগে আছেন মিয়ার বেটি। এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেলে তার ফটো নিয়ে, গার্ডদের কাড়াকাড়ি– মেয়ের সৌন্দর্য তাতেই অনুমেয়। ৪ মেয়ের মা দেখলে মনে হয় কুমারী। শরতের জ্যোৎস্নার মতোই তাঁর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। বাপের আদরের জ্যোৎস্না নাম বাস্তবেও জ্যোৎস্নার মতোই কমনীয়। ভুলে তাঁকে বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আপসোসে অনেকে পস্তাতেন। এ রূপসী পাকিস্তানি নজরে পড়লে রক্ষা নেই। শরণার্থী মুক্তিরা তাদের মাতৃরূপী পরম নিরাপদ আশ্রয়কে ভারতে নিয়ে যেতে তৎপরতা চালান। ৪ মেয়েসহ নেয়া কষ্টকর বিধায় সে চেষ্টা স্থগিত থাকে।

মুক্তিদের নিয়ে ৩৫টি মুখের প্রতিদিনের আহার যোগান বিব্রতকর সমস্যা। মান-সম্মানের ব্যাপার। মুক্তিদের বলাও যায় না। গোলযোগের কারণে জ্যোৎস্নার লন্ডন প্রবাসী স্বামীর ভাতা বন্ধ। ১ ভরি সোনা ১৮১ টাকায় বেচে দুধাল গাভী কিনে আনলেন জ্যোৎস্না। নিজের শিশুকন্যা ও পুত্রপ্রতিম মুক্তিদের দুধের ব্যবস্থা করে সান্ত্বনা পেলেন। কিন্তু এতেও অর্থকষ্ট দূর হয় না। ব্রিটিশ কাউন্সিল মারফত অর্থসংস্থানের চেষ্টায়

লাগলেন। ছুটলেন ঢাকায়। ৩ মাস তাঁর স্বামী রবের খবর নেই। ইতোমধ্যে লন্ডন প্রবাসী স্বামী জানালেন স্ত্রী-ঢাকায়। ব্রিটিশ কাউন্সিল মারফত স্ত্রীর সাথে কথা বলে ৫০ পাউন্ড ব্রিটিশ সংসারের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা পেলেন।

দেবর প্রেমের বহর ঃ ঢাকায় সকন্যা উঠলেন দেবর কৃষি অফিসার মনিরের বাসায়। বাসায় হলো আকস্মিক চুরি। সন্দেহ পড়লো মেহমানের ওপর।

মাত্র দশ দিনেই তিনি দেবরের মহত্ত্ব ভালো করে টের পেলেন। বিপদে বন্ধুর পরিচয়। স্বামী টাকা পাঠান ছোট ভাইয়ের মারফত। ঈদে পাঠালেন ২০০ টাকা। ব্রিটিশ সাহায্যের হিসাব ব্রিটিশ পদ্ধতিতে করলেন মিঃ রবের ছোট ভাই। ১০ দিন বড় ভাইয়ের পরিবারের বাসায় ছিলেন। তাঁদের খাবার খরচ ১০×১৬=১৬০ টাকা তিনি কেটে রাখলেন। বাসায় রান্না দু'ধরনের। পরগাছা মেহমানদের এক রকম। আর নিজেদের অন্যরকম। বড় মোরগ জবাই করে ইলিশ মাছ ভেজে বালাম চালের ভাত পাক করেও বড় ভাইয়ের স্ত্রী-কন্যাদের ভাগ্যে জুটলো না। তাদের জন্য মোটা ভাত-ডাল। এই সে দেবর যাকে পরম আদরে জ্যোৎস্না পালন করেছিলেন। স্কুল মাস্টার স্বামীর আয় থেকেই তার পড়ার খরচ দিয়েছিলেন। বিপদের দিনে শিশুকন্যাদেরসহ দেবরের আশ্রয়ে এসে এভাবেই প্রতিদান পেলেন।

একদিন কৃষি অফিসার দেবরের নির্দেশ হলো 'চলে যান'। স্কুটার ডেকে দেবার সৌজন্যও তিনি দেখালেন না। কাজের ছেলেকে ৫ টাকা বকশিশ দিয়ে স্কুটার আনালেন ঢাকারই ইসলামপুর যাবেন বলে। এমন আত্মীয়ের মুখে ঝাঁটা। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো দেবর সান্নিধ্যের উষ্ণতা উপভোগ করলেন জোৎস্না। সাথের সাথী ভাগ্নী জামাইকে নিয়ে স্কুটারে ছুটলেন বাপের বাড়ির পথে। সেখানে যে মুক্তিপুত্রদের ফেলে এসেছেন।

পথে যাত্রাবাড়ির কাছে অযাত্রায় পড়লেন। যাত্রাবাড়ির ব্রিজের একাংশ মুক্তিরা উড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তি সন্তানদের সাফল্যে জীবন সংশয়েও যাত্রাপথে খুশি হলেন। ১ দিনেই কাঁচপুর, বাউসা ও অন্য ১টি সহ ৩টি ব্রিজ মুক্তিরা উড়িয়ে দিয়েছে। সাবাশ বাঙাল মুক্তি।

ইসলামপুর থেকে যাত্রাবাড়ি-কাঁচপুর ৪ টাকার স্থলে ১০ টাকা বাস ভাড়া। কাঁচপুরে .৫০ পয়সার অগ্রযাত্রা। কাঁচপুরেই .৫০ পয়সার স্থলে ঘাটভাড়া ১.৫০ পয়সা। বাউসিয়া ঘাটে কারফিউ পড়ার ৫ মিনিট আগে পৌছুলেন। সাথে ৪ মেয়ে। এ পর্যন্ত ১০০ টাকা গচ্ছা দিয়ে এগিয়ে চললেন।

এবার কারফিউতে ফাঁসলেন তিনি। এক নৌকাওয়ালাকে বাপ ডাকলেন। সুন্দরীর ডাকে গলে গেলেন মাঝি। জ্যোৎস্নাকে মা ডেকে তার জ্যোৎস্না রাতের আনন্দেই সার। ৯ হাত নৌকায় মাঝিসহ উঠলেন ৮ জন। সাথে ট্রাংক-সুটকেস। ধান-পাট ক্ষেতের আড়ে আড়ে সরে পড়তে চাইলেন। উদ্দেশ্য নানার আত্মীয় চেঙ্গাকান্দির লালমিয়া-আসাদ মিয়াদের বাসায় আশ্রয় নেওয়া।

গুলি ছোঁড় দেয়গা এধার আও ঃ পটাপট অন্যান্য নৌকায় সুট করে সুন্দরীর নৌকায় চোখ পড়লো খানদের। ৮টা উদ্যত রাইফেলের নল "এধার আও গুলি করেগা'। চোখের সামনে ১০ জনের একটি নৌকা তলিয়ে গেল। ১ বুড়া অতলে তলিয়ে গেলেন। অন্যরা ঝাঁপিয়ে বাঁচলেন। কুমিরছানা প্রদর্শনীর মতো সুন্দরী মাসুম কন্যাদের উপরে উঠিয়ে দেখান। ৩য় মেয়ে সালমা মুক্ত নদীর ফুর ফুরে বাতাসে আনন্দের হাসি হাসে। সুন্দরী হাসলেন ভুবন মোহিনী হাসি। খাসা মালে পশ্চিমা খাসিদের বিস্ময় আনন্দ। কিসতি পর খুব সুরত বাচ্চা আওর আওরত।। সুন্দরী জেনানার চোখ ধাঁধানো, হাড় কাঁপানো, রক্ত নাচনে চনচন মন উচাটন খানেরা।

নৌকা এগুলো। বয়স্ক খান মেজর বেরুলো ঘাটের বাংলো থেকে। সুকনা গোলাপ কুঁড়ির পাংশুমুখী জ্যোৎস্না। বাচ্চারা ভয়ে জড়সড় কাঁপছে। বাচ্চাগুলো দেখতে বিদেশির মতো। বুড়োর চোখে পলক পড়েনা ঃ-

বিধুমুখী গোমরা কেন তোমার মুখ
আমি তোমায় দিতে পারি নূরজাহানের মতোই সুখ।

গর্জে উঠলেন খান মেজর, "গুলি মাত ছোঁড়। কিসতি কিনার লাও।" গোলাপ কুঁড়ি ফুটি ফুটি, সালাম, "মেরা দুলাভাই।" রোমান্টিক সন্ধ্যা। সুন্দরীর বিলোল কটাক্ষ। বুড়ার প্রাণে শিহরণ, "কিধারছে আয়া? এতনা রাত কিউ আয়া বহিন। হাস্না হেনার মতোই সুগন্ধি ছড়ায় জ্যোৎস্না, "কাফের লোগ ব্রিজ উড়া দিয়া। ট্রান্সপোর্ট মিলনা বহুত শকত। এতনা মুছিবত মে খোদা ফেক দিয়া ভাইজান।" বড় সাব খোশ দুনিয়া বশ। খানসেনারা মাঝির সেবায় তৎপর। মেয়েদের গদিতে (কোলে) উঠিয়ে নেন। ট্রাঙ্ক দু'টা মাথায় নিলেন। মাথায় ট্রাংক কাঁধে রাইফেল। কোলে বাচ্চা হায়রে খান। বুড়ারে জেনানার খবর দিয়ে কি মুছিবত বাড়ালি।।

বেতাল মেজর, "যায়েগা কাঁহা।" চাঁদ বদনী "দাউদকান্দি পিস কমিটির চেয়ারম্যান কা-ধার জায়গা।" বুড়ার থোরা কোসেস, "এধার রা যাইয়ে না বহিন? " "জেনানার বায়না," "খালুকা ঘর জায়গা।" কালকুটে ভরা এ কাল ভুজগের এ খাসা মাল হায়না রূপী নারী লোলুপ তার সৈন্যদের খায়েস মিটায়। তার ভোগে আসবেনা। ওপারে ফোন করেন হতাশ মেজর। খান দালাল জ্যোৎস্না খালু তুজার ডাঙ্গার কাজি সাহেব খানা নিয়ে তৈয়ার। ফেরি ছোঁড় দিয়া তো কিয়া হায়। ওয়াফেস লে আও!!

এক আওরত মুসিবত মে ঘির গিয়া। ওনকা কিসতি দরিয়ামে ঘিরার বাহানায় ফেরত এলো ফেরি। পাকিস্তানি মেজর মাইনর কাজ করে না। ফেরি আর ফেরত যায় না। চায় দাঁড়িয়ে। এপার থেকে ২ খান দিলেন ওপারের খানদের সামলাতে। রাত প্রায় ৮টায় ময়নামতি থেকে পাকিস্তানি ব্রিগিডিয়ার এলেন। টর্স জ্বেলেই দিনকা বাঘিনী রাতকা কামিনী দেখে ব্রিগেডিয়ারের ব্রহ্মতালু খালু খালু। খানদের আবার বাহানা, কিসতি ঘিরার মুসিবতে আওরত। মায়াময়ীর মায়ার হাসি, "সালাম ভাইজান।" "ব্রিগেডিয়ারের

বড় তাড়া। তিনি ঢাকার পথে ধাবমান। "ওনকো পিস কমিটি কা ঘর পৌছা দো।" নিজেদের দোষে এমন শিকার হাতছাড়া। কি আর করে খান।। ওপর ওলার নির্দেশ। সুন্দর মুখের এমনি জয় হে।

খানেরা অতি সমাদরে খানদানি বেগমকে খালুর বাসায় পৌছে দিলেন। খালু দেখে হতভম্ব। বাঘিনী তুই এলি কেমনে? সে রাতেই দাউদকান্দিতে ৪ জন খান মারা যায়। পরদিন সকালে ৪০ টাকার স্কুটার ৮ টাকায় নিয়ে আসে খান বন্ধুরা। ঠিক ভোর ৬টায় ইলিয়টগঞ্জ নামে। নৌকায় ছুটে চলে পরচঙ্গা। মার চিন্তায় বিনিদ্র রজনী। ঘরে পৌছুতেই মায়ের চোখে নীরব কান্নার অভ্যর্থনা। মুক্তিপুত্রদের আনন্দ ধরে না। অর্থসংস্থান করে মা ফিরলেন। সন্তানদের দুঃখ ঘুচলো। ভালোমন্দ খাবার পেয়ে তারা খুশি। ঢাকার সর্বশেষ সংবাদ, পথের দেখা তরতাজা সংবাদে মুক্তিরা আশ্বস্ত। সর্বোপরি বিভীষিকার মৃত্যুফাঁদ পেরিয়ে সকন্যা বাঘিনীকে ফিরতে দেখে মুক্তিদের বিস্ময় কাটেনা? নেত্রী আস্থায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

মুক্তি ক্যাপ্টেনের স্ত্রী অসুস্থ ঃ নিজের বোন পারভীন মুক্তি ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। ক্যাপ্টেন সফিক যুদ্ধে আহত। জীবিত কি মৃত কেউ জানে না। সে যে কোথায় তারও হদিস নেই। পাকিস্তানি আক্রমণ ও মুক্তির ত্রস্ততায় পারভীন কাটায় ছারা বাগানে। বাংলার মহিলাদের এখন ঘর-বার-বন-বাদাড় যেন একই। পারভীনের ছুটকেস উই কেটে শেষ করে।

২৬ নভেম্বর ১৯৭১। হারালদার গেদা ব্যাপারীর বাড়ি দাওয়াত খেয়ে ফিরলেন বিকালে। সারারাত পারভীনের মাথা ধরা-বমি তিনবার দোতালা থেকে নিচে নামিয়ে টেবলেট খাওয়ানোর পর জ্বর ছাড়লো। ২৭ তারিখ সারাদিন অসহ্য মাথা ব্যথা বিকেল ৪টায় নিচের বারান্দা বমিতে সয়লাব। সামনের বারান্দায় শুয়ে চোখ টেরান আর ঠোঁট বাঁকানির আলগা চিকিৎসায়ও কাজ হলো না।

রোগীর এমতাবস্থায় আসলেন গফুর ডাক্তার। তিনি যতোনা রোগ তার চেয়ে বাড়িয়ে বলেন। নইলে তাঁর ফি বাড়বে কি করে। চিকিৎসার পূর্বক্ষণে রোগীর বিরাট বিরাট অচেনা রোগের নাম তাঁর মনে আসে। রোগীর রোগ আরো বেড়ে যায়।

অগতির গতি হেমিওপ্যাথি। সাড়ে আটটায় এলেন ভূঁইয়া বাড়ির লতিফ ডাক্তার। পূর্বেই তিনি বলেছিলেন এক্লেমশিয়া। গফুর ডাক্তারের গাফুর গুফ। টাকার ডাক্তারির খেলা। প্রথমে আলগা দোষ, ঝাড় ফুঁক। রোগ বাড়ে। ডাক্তার অনড়। আগে টাকা পরে চিকিৎসা।

খবর দিলেও ডাক্তার এলেন না। মুক্তিরা মুদগুরে ব্যবস্থা করতে চাইলেন। জ্যোৎস্না তাদের নিবৃত্ত করলেন। ছোট ভাই মোহনকে সাথে নিয়ে চললেন চামার ডাক্তার গফুরের বাড়ি। অন্ধকারে পথ চলতে সাথে নিলেন হারিকেন। দুটি মুক্তির সশস্ত্র ফেউ তাঁকে নীরবে অনুসরণ করলো।

ডাক্তারের লেপ গায়ে ঘুম। ডাকাডাকিতে সাড়া নেই। মুক্তির দুজন দিলেন সজোরে হুংকার। বোমা মেরে সব উড়িয়ে দেবো তবে বুঝবা বাচাধন।। জ্যোৎস্না তাদের ঠান্ডা রাখলেন। এতো রাতে কি করবো। ঔষধ নেই। সহজ নারী বুদ্ধিতে ডাক্তারের ছোটলোকি ব্যাপারটা ধরে ফেললেন জ্যোৎস্না। আপনি কতটাকা চান। টাকা আমি দেব। সাড়ে ন'আনার মরফিন ইনজেকশনের দাম নিলেন পঞ্চাশ টাকা। আহা কত নিবেদিত প্রাণ কর্মী এ গফুর ডাক্তার। মুক্তিদের ঘোঁৎ ঘোঁৎ-এ শাইলক গিরির জন্য তোদের কাওমীলীগ বাবা একদিন বেঘোরে মরবে। নির্জীব হবে তোদের মুজিব। সময়ে বুঝলাম কেমন কশাই আওয়ামীলীগ কর্মী। তোদের বাবা মরলে এদেশে ইনলিল্লা পড়ার কেউ থাকবেনা। যা চামার, মায়ের কথায় তোরে ছেড়ে দিলাম।।

এরই মধ্যে চোখে পড়ে রোগীর বিভৎস চেহারা। দুবার বমিতে মরে যায় যায় দশা।। একটা মরফিনের অর্ধেক দিতে রোগের অনেকটা উপশম। তাতে কি। মরার সাথে ২৭ অক্টোবর রাতে কেউ থাকতে চাননি। সমাতা জ্যোৎস্না রাত ভর মরার খাড়া আগলে রক্ত ঋণের পরীক্ষায় উৎরে গেলেন।

মুক্তি পুত্রদের আহাজারি ঃ মুক্তি ক্যাপ্টেনকে তারা অনেকেই দেখেনি। উদ্বেগে আকুল অসহায় মুখগুলি। তাদের সবল বাহু-হাতের অস্ত্র রোগের কাজে অসহায়। 'সংগ্রামী যোদ্ধার স্ত্রীকে এভাবে নিবি। আল্লাহ এই তোর বিচার।। আহা হা আমাদের ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এ ভাবে যায় রে'!!! যার সাথে পরিচয়ও নেই এমনি যোদ্ধা ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর জন্য মুক্তিদের আহাজারি সবাইকে হতবাক করেছে। এমনি ছিলো মুক্তিদের পারস্পরিক টান।

দুঃখের রজনী হয় না প্রভাত। তবুও প্রভাত হলো। ২৮ নভেম্বর ফজর সময়। পারভীন মাতা ভোর সাড়ে পাঁচটায় নামাজ পড়ে দেখেন মরার পূর্বাভাস–চোখ খোলা রোগিনীর। কলেমা পড়ে মার কানে ফুঁ। চুল দুভাগ করে সিঁথি। এখনই মরবে–উত্তর শিথানে করে রাখা।

অন্তর্যামীর কাছে জ্যোৎস্নার প্রার্থনা ঃ ঝড় ঝাপটা থেকে পাখির ডানার মতোই এতোকাল আগলে রাখলেন বোনকে। বড় শখ করে তাকে নিজের উদ্যোগে বিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সে বোন অন্তিমের পথে। জ্যোৎস্নার বুক ফাটা আর্তনাদ, "দম নাও যেতে পারে–উত্তর শিয়রে করা হবে না।" নিজের মাকে পুবের রুমে পাঠিয়ে দিলেন। "আহা বোন। তোর স্বামী নেই। ভাইদের কাছেও থাকলে না তুই। মা-বাপ থেকেও নেই। দশ মিনিট চোখ বুঁজে অন্তরময়ের কাছে ব্যথিত প্রার্থনা জানায়, "অন্তর্যামী তুমি সবই জান। আমাকে শক্তি দাও। বোনকে ভিক্ষা দাও।" আধ্যাত্মিক শক্তিতে কে যেন জ্যোৎস্নাকে ডেকে বললেন," তাকে কুমিল্লা নিয়ে যাও।"

ডুবন্ত যাত্রী খড়কুটা পেলে আঁকড়ে ধরে। জ্যোৎস্না যেন অদৃশ্য ইঙ্গিতে পথের দিশা পেলেন। কম দামি পরণের শাড়িতেই জ্যোৎস্নার গোঁ, "এখনই কুমিল্লা যাব।" পারভীনের ক্লাস ফ্রেন্ড দক্ষিণ পাড়ার শহিদকে খবর দিলেন চুপে চুপে। শহিদ তার বাপের একমাত্র ছেলে। বললে তো আর যেতেই দেবে না। তার প্রতি নির্দেশ, "বাবা মরছে তোমার ক্লাস ফ্রেন্ড, তোমাদেরই যোদ্ধা-পত্নী, যাব কুমিল্লা-কাউকে বলবে না। একটামাত্র গঞ্জি নিয়ে আস। অদূরে মহিচাইল বাজার থেকে একটা রিকসা পাঠিয়ে অপেক্ষা কর।" শহিদ হতে শহিদ যেন এক পায়ে খাড়া। পথে পথে কারফিউ। মৃত্যু সর্বত্র যেন ওঁৎ পেতে আছে। পাকিস্তানি আর্মির একশটে জীবন কাট। মরণ-চোয়াল ময়নামতির পাকিস্তানি আর্মির ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হবে। অকুতোভয় নির্বাক শহিদ সহজেই কুমিল্লা যেতে রাজি হয়।

সবাই বলছেন কারফিউতে কুমিল্লা যেওনা। বাড়ির কেউ জানলো না কুমিল্লা যাবার কথা। ঠিক সাড়ে আটটায় রওনা দেয়। এদিকে, জমিরা পাড়ার কাছে এক মহিলা কলস ভরে পানির উপরের কিছু অংশ ফেলছেন। দেখে খুশি লাগলো। ভরা কলস উপচে পড়ে। এতে প্রাণ শক্তির উচ্ছ্বাস বাড়ে! বোন তা'হলে কি প্রাণে বাঁচবে!! মাধাইয়া এলেন তাঁরা। বাসে যাবেন কুমিল্লা। আড়িখোলায় বাস আটকালো খানেরা। কাউকে কাউকে রাইফেলের বাট দিয়ে পিটিয়ে বের করছে বাস থেকে। সাথের সাথী শহীদের প্রতি "ওনকো নিকালো" রমণী রমণীয় ভুবন বিজয়ী হাসিতে, "সালাম ভাইজান। ও মেরা ছোটা ভাই হ্যায়। ছোটা বোনকা ব্যামার-এক্রেমশিয়া। এম্বুলেন্স লিয়ে কুমিল্লা যাতা হ্যায়।" হায়, এরই মধ্যে পাশের সিটের বুড়ারে ধরে রাইফেলের বাড়ি। জ্যোৎস্নার মনে তখন কেবলই হাহাকার।

সালামালেকুম ভাইজান

জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য জ্যোৎস্নালোকের মতোই। অন্ধকারেও উঁকিমারে। অবিন্যস্ত বেশবাস-কেশপাশ ঃ রূপ কি আর চাপা থাকে। সাজলেনা আবার ধরে নেয়। একমাত্র মহিলা পেসেনজার জ্যোৎস্না, "মেরা ছোটা ভাই। তালেব এ এলেম। ৮ম জমাত মে পড়তা।" "ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় বঠিয়ে।" সালামালেকুম ভাইজানের ট্রিকসে এবারও বেঁচে গেলেন সুন্দরী।

গাড়ি ছাড়লো। ময়নামতি চেকপোস্টে সুন্দরীকে আর্মির মনে ধরলো। চোখ দেখে ভয়। ধরে নেয় নেয়! বেঘোরে মুক্তি সেল আসছে কুমিল্লার দিক থেকে। সুন্দরী ছেড়ে প্রাণ ধরে বাঘাদের হাগামুতি কান্না। বৃষ্টির মতো শেল বাবাদের প্রাণ গেল গেল! জোশে পাকিস্তান এবার হেফাজতে মেহমান-আপ আগ বাড়িয়ে-চলে যাইয়ে!! খাসা মালটা গেলরে!!! মোচ তা, জিব চাটার চাউনিতে খাউনির সাধ না মিটিয়ে উপায় কি ছেড়ে দে মা কেঁদে মরি-কি আর করা। মুক্তির শেলের তোড়ে প্রাণে বাঁচলেন তিনি।

শাসন গাছা ঃ কুমিল্লা শাসন গাছা বাস স্ট্যান্ড। অজস্র শেলের মাঝে বাস থামলো। উদ্বেগে আকুল মানুষের যেন মৃত্যুর মাঝেও আনন্দ। মরণ শেলের ভয়াবহতায়ও মানুষের আনন্দ। এ যে মুক্তি শেল। মাত্র তিন মাইল দূরে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে শক্ত পাকিস্তানি ঘাঁটি। এদের উৎপাতে ঘটিবাটি নিয়ে যেন তারা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। শাসন গাছা পর্যন্তই যেন তাদের শাসন। সর্বত্র মুক্তির জয় জয়কার। সাড়ে দশটায় বেরিতে উঠতেই শেলের খাবি। গাড়িওয়ালা এক বাসায় আশ্রয় নিলেন। শেল কমলে নিয়ে যাবার আশ্বাস।

শেল কমলো। কুমিল্লার আত্মীয়ের সন্ধানে বেরুলেন। তাল পুকুর পার গীতিকার মজহারুল আনোয়ারের বাবার বাসা। গীতিকারের বাপ ফুফাত ভাই। সে ফুফাত ভাই হোসেনের বাসায় উঠতে সবার চোখ ছানাবড়া। হায় নাগিনী!! এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ময়নামতির মৃত্যু গহবর পার হলি কি করে? মুক্তি ক্যাপ্টেন-পত্নী পারভীন মৃত্যু শয্যায় শুনেই সবাইর শশব্যস্ত, টান ও আগ্রহে দুঃখ ভুলার মতো। "আমাকে একজন লেডি ডাক্তার-নার্স দেন-খরচ আমি দেব।" সবার বিস্ময়, জ্যোৎস্না তোদের নিজের বাচ্চা কই? কি করে এলি !"

চিকিৎসার সন্ধানে উৎকণ্ঠা ঃ হোসেন সাহেব কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। হোসেন সম্বন্ধী বাজগডডা চৌধুরী বাড়ির আহসান উল্লাহ চৌধুরী ছিলেন বরিশাল সদর হাসপাতালের চার্জে। বরিশালের সিভিল সার্জন আছেন কুমিল্লা সদর হাসপাতালের দায়িত্বে। ডাক্তাররা ইন্টার পোস্টিংয়ে আছেন। সম্বন্ধীর রেফারেন্সে কুমিল্লা সিভিল হাসপাতালের এম্বুলেন্স পেলেন। তখন ঘন্টায় ঘন্টায় ইনজিউর আসছে। বিকাল তিনটায় আশি টাকা ভাড়ায় একটি এম্বুলেন্স এলো।

মৃত্যু পথিকের শেষ কৃত্য ঃ সবাই হতবাক। অসম্ভবকে সম্ভব করে দুর্যোগের ঘনঘটা অতিক্রান্ত করে এম্বুলেন্স নিয়ে কুমিল্লা থেকে মহিচাইল পৌছুলেন মুক্তিমাতা। উদ্বেগে আকুল মুক্তি পুত্রদের কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সেদিন জুমা। নামাজিরা পারভীনকে ঢেকে কোরান পড়ছেন। মা দেখাচ্ছেন কবরের জায়গা। বাঁশ কাটা শেষ। আল্লাহর দরবারে মুসল্লিদের আহাজারি-কেউ পুকুর ঘাটলায় কেউ দালানে। তোমার আমার ঠিকানা কবরের বিছানা। এ পথে আল্লাহর দরবারে। আগে পরে এই যা তফাৎ। সবল পেশল মুক্তি বাহু আজ দুর্বল। তাদের হাতে অস্ত্র গর্জায় না। আগুনের ভাটায় চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। তাদের ক্যাপ্টেন-পত্নী অস্তিমের পথে। ভাষাহীন আশার চোখ ছল ছল। পারভীনের গলায় একটু একটু টুক টুক শব্দের অস্পষ্ট আওয়াজেই প্রাণের লক্ষণ। মরে নাই-মরে নাই-দাফন গোসলের অপেক্ষা!! এমনি সময় শেষ বেলা মিয়ার বাড়ি এম্বুলেন্স পৌছুলো।

মৃত্যুর হিম শীতল নীরবতার স্তব্ধতা সারা বাড়িতে। দাফনের আয়োজনে সবাই চুপচাপ। ব্যাপার-আয়োজন দেখে জ্যোৎস্নার অবয়বে অমাবস্যার কালিমা। বুকে ছেঁক। শেষ উদ্ধার হলো না--আহা সব শেষ!! চরম হতাশায়ও আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আশার ছলনে বোনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলেন। সবাই বলেন, "মরে নাই। বোধ হয় মগরেবের পর দম যাবে। ইলেকট্রিক শকের মতো আশার স্ফূরণ খেলে গেলো জ্যোৎস্নার সর্বাঙ্গে।

জেদি মেয়ের জিদ। আব্বাকে বলেন, "মরে নাই তাই কুমিল্লা নিয়ে যাবো।" বাবার রাগ, "মরাটা কেন নিবি?" জ্যোৎস্নার ঝাঁঝ, "মরাটার স্বামী কি আপনাদের দিয়ে গেছে? নিয়ে আমি যাবোই।" বাবার পারমিশন নিয়ে ঘরে গেলেন। মা গ্লুকোজ পানে শক্তি সঞ্চয় করেন। সবার স্নেহময়ী মার আজ বোধ নেই। একটা মাত্র শাড়িতে জ্যোৎস্না যাত্রা করেন কুমিল্লার পথে। এ যে সহমরণের স্থলে বোনের সাথে মরণ।

স্রষ্টার দরবারে মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা ঃ মাওলা বকস মিয়ার মেয়েকে স্ট্রেচারে উঠান হলো। অদূরে মূল রাস্তায় এম্বুলেন্স দাঁড়ানো। স্ট্রেচারে পরের কাঁধে মেয়ে। মাওলা মিয়ার দুঃখের সাথী প্রায় সত্তরজন নামাজি চললেন তাঁর মেয়ের শবাধার রূপী স্ট্রেচারের পেছনে। সবাই বলেন, মুর্দা নিয়ে যায়। বেঁচে কি আর আসবে? গাড়ির দরজায় স্ট্রেচার। মাওলার দরবারে বুক ফাটা কান্নায় হাত ওঠালেন জমিদার নন্দন মাওলা বকস মিয়া। সাথের নামাজিদের হাহাকারে বেদনার্ত সন্ধ্যার আকাশ। মুক্তিরা কাঁদে বোবা কান্না। অবোধ শিশুর নিষ্পাপ হাত আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে। সবাই একই ব্যথার ব্যথী। মাওলার দরবারে মাওলা বক্সের আহাজারি, কান্নায় কান্নায় হাত তুলে মোনাজাত, "আমি অবোধ, মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা দাও মাবুদ।"

মায়ের দোয়া ঃ আলু থালু বেশে দুঃখিনী মা ছুটে এলেন এম্বুলেন্সের পাশে। এম্বুলেন্স ও রোগী দুটার দর্শনেই রাস্তায় লোক ধরে না। গাড়ির ঝাঁকানিতে রোগ বাড়তে পারে। মায়ের প্রতি জ্যোৎস্না, "সুরা ইয়াসিন পড়ে দোয়া করো"। মা-বাবার দোয়ার পুণ্যস্নানে পুণ্যবতীর এম্বুলেন্স ছুটলো কুমিল্লা সদর হাসপাতাল।

হাসপাতালে ঃ প্রথমে সোজা সদর হাসপাতালে রোগিনী ভর্তি হলেন। সেখান থেকে সবার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। ভর্তি কি আর করতে চায়? পাঁচ টাকা করে কয়েকজনকে দিয়ে হাত করলেন জ্যোৎস্না। তাই এডমিট। ফোন পেয়ে নিজের ভাই তাজু ও ভাই হোসেন এলেন। সিভিল সার্জন এসে সব দেখলেন। আয়াকে পাঁচ টাকা দিয়ে রুম সাফ করালেন।

ট্রিটমেন্ট চলছে। রাত ৮-টায় সিভিল সার্জন সব খোঁজ-খবর নিলেন। জ্যোৎস্নাকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে ডাক্তার, "আপনার বিয়ে হয়েছে?" "শুধু বিয়েই হয়নি আমি এক হালির মা"। উত্তর শুনেই কে যেন সার্জনের মুখে সার্জারি করে দিলো।

যোদ্ধা পত্নীর সহানুভূতিতে ডাক্তার ঃ রোগীর স্বামী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন নিখোঁজ। ১-হালির মাকে খালি হাত ভেবে ডাক্তারের আশায় ছাই। সুন্দরীকে অবাক চোখে তিনি দেখছেন আর দেখছেনই। তাঁর খোলাখুলি বিস্ময়, "দেখে মনে হয় আপনার বিয়েই

হয়নি। আপনার রিস্ক নেওয়া দেখে বিস্মিত হই। পাকিস্তানি আর্মি আপনাকে ছাড়লো কেমনে?"

হৃদয়-উজাড় সহানুভূতিতে ডাক্তার উদয়াস্ত পরিশ্রম করে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় সবাই মুক্তিপত্নীর সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। উদ্বেগে আকুল ডাক্তার, "বিপদ আছে। আপনি গাছ চান না ফল চান?" অনেক ভেবে জ্যোৎস্নার উত্তর, "গাছ বাঁচলে ফল হবে।" ডাক্তার, "আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন, আমি আছি।" রোগীর সেবার চেয়ে সুন্দরীর সান্নিধ্য ডাক্তারকে উতলা করে তোলে। এবার দু'ঘন্টা পরিশ্রম করে নিজের হাতে চার্ট লিখলেন। মিনিট সেকেন্ডের যেন হেরফের না হয় তার নির্দেশ। রোগীর নাম, রোগ, ঔষধ, ইনজেকশন, পথ্য সব কিছুর পুংখানুপুংখ বিবরণ লিখলেন। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত পুরা চেক করলেন। স্টেথিসকোপ বুকে পিঠে লাগিয়ে দেখলেন। বেতনভুক ডাক্তারের এমন সাহায্য করার কথা নয়। সুন্দরীর উষ্ণ সান্নিধ্যে সবই হয় হে!

গরবিনীর অস্ত্র রূপের নিস্তেজ আগুন ঃ ট্রাকে ট্রাকে সশস্ত্র পাকিস্তানি-আর্মি পাড়া সড়কে যায়। রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করে ধ্বংসের তান্ডব। এ-ভয়াল মৃত্যু ফাঁদে সুন্দরী জ্যোৎস্নার আগমন নির্গমন। অবিন্যস্ত কেশপাশ আলুথালু বেশবাসে এক কাপড়ে যতই সঙ সাজুক না কেন কাঁচা হলুদের অনূঢ়া রূপ বুড়ির বেশে লুকাতে পারে না। কোন সময় যে হিংস্র ছোবল তার ওপর নেমে আসে আল্লাহ জানে? তার তো একটু ডরভয় নেই। "নাচতে যখন নেমেছি ঘোমটা দিয়ে আর কি হবে? ঘর পোড়া গরু কি আর সিঁদুরে মেঘে ভয় পায়? আগুন খেলায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা মুক্তিযোদ্ধাদের কি আর ছেড়ে যাওয়া যায়? জাহান্নামের আগুনে আমি হাসি পুষ্পের হাসি।"

আগুনে ঘর-বাড়ি জ্বলে। রূপের আগুনে সংসার জ্বলে, রাজ্য সম্রাজ্য পুড়ে ছারখার হয়। চাঁদের কিরণে তেজ নেই। জ্যোৎস্নার আলো সবাই ভালোবাসে। প্রতি পূর্ণিমায় সবার আনন্দ। শরতের জ্যোৎস্না ঋতু রানী। আমিও রূপের রানী রূপকুমারী জ্যোৎস্নার নিস্তেজ উত্তাপে সবার বুকে তোলপাড় আগুন ধরাবো। নইলে আমি কিসের মুক্তিযোদ্ধা? বাপের বেটি জ্যোৎস্না। লন্ডনী স্বামীর বউ জ্যোৎস্না আরা রব কি আর আমার নাম সাধে? আমি যোদ্ধা, আমি বোন--সবার ওপরে আমি মা। কটা দিন ঘুরছি মরার পথের বোনকে নিয়ে। আমার চারটি শিশুকন্যা কোথায়?

নাগ কন্যার খোঁজে ঃ বোন পারভীন কিছুটা সুস্থ। নিজের ৪টি পিঠাপিঠি শিশু কন্যার খোঁজে বেরুলেন। কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যানের শালা মুক্তিযোদ্ধা দুলাল ওরফে দুলু। কন্যাদের খোঁজে পথের পাকিস্তানি আর্মির জ্বালাও পোড়াও অভিযানের ইতিবৃত্ত পথের সাথী হলো দুলু। দুলুকে নিয়ে মহিচাইল রওনা দিলেন জ্যোৎস্না। জ্বালাও পোড়াও দেখতে দেখতে দুরুদুরু বুকে বাপের গ্রাম মহিচাইলে এলেন। বাপের বাড়ি জ্বালানো হয়নি শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। পথের বাজার কসুলপুর ঘুরিয়ে

পাকিস্তানি আর্মি। মহিচাইল বাজারে বেবি টেকসি থামতেই সবাই দৌড়ে এলেন, মসজিদের মুসল্লিরা বেরিয়ে পড়লেন রোগীর খবরে। জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্নাময়ী হাসিতে সবাই খুশি, বুঝলেন পারভীনের রোগ ভালোর দিকে।

মা-মেয়ে মিলন ঃ মেয়েগুলির উৎকণ্ঠায় শুকনা মুখ। কদিন তাদের মায়ের খবর নেই। এম্বুলেন্স-হাসপাতাল-কুমিল্লায় কিছুই তারা বুঝে না। খালার অসুখ দেখেছে। খালাও নেই-মাও নেই। নানুর বুকজুড়ে তাদের আঁকু পাঁকু। হাসিখুশি কচিমুখ শুকনা পাতার মতো চুপসে গেছে। মাকে পেয়ে ৪টা মেয়েই একসাথে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা-মেয়ের মিলনে স্বর্গীয় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সারা বাড়িতে। অপরদিকে, দুর্ভাবনায় কাজের মেয়ে মনোয়ারাকে ছাড়েননি। কাজের মেয়ে কি আর মায়ের কাজ দেয়? বাবার ক্ষোভ, "নিজের মেয়েদের মারবি। জামাই রবকে নির্বংশ করবি।"

বোনের টানে বোন ঃ ১ ঘণ্টা থেকেই সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ৪টি কন্যাসহ পুনরায় কুমিল্লা চললেন বাঘিনী। সবাই বলে, "জ্যোৎস্না তুই কি পাগল হলি। মেয়েদের নিয়ে অন্ধকারে রাক্ষসী তুই যাস কই? " মুক্তির স্ত্রী আমার বোন পারভীন মরে হাসপাতালে–আমি এখানে আরাম করবো তোমরা ভাবলে কি করে?"

রোগীর প্রতি ডাক্তারের সৌজন্য ঃ সিভিল সার্জন নিজে দায়িত্ব নিলেন। চিকিৎসা চলছে। রাত সাড়ে এগারোটায় রোগীর ঘের ঘের আওয়াজ বেড়ে চলছে। বাঁ দিকে ফিরতে প্রথম ঘের ঘের আওয়াজ নাকে মুখে দুধের ক্ষিরের মত নিকালছে। আয়া সাফ করে না। জ্যোৎস্নারে সাফ করতে কয়। "আয়াদের সরকার টাকা দেয়, আর আমি করবো সাফ? আসুক ডাক্তার দেখা যাবে?" ডাক্তারের কথায় আয়ার গায়ের ছায়া নড়ে মুখে পড়ে চুন। এবার সুর সুর করে ময়লা সাফ করে আয়া। ডাক্তারের সতর্ক দৃষ্টির কারণে সবাই রোগীর প্রতি যত্ন নিয়েছেন। ডাক্তারদের মহান পেশায় তাঁদের সেবার প্রতিদান দেওয়া যাবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মুক্তিনেত্রীর দায়িত্ব ঃ মরণ খেলায় মেতেছে নেত্রী। সাপে নেউলের মরণ ছোবল চলছে। মুক্তিদের গোপন দূতীর কাজের স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন মুক্তি-মাতা। হাবিয়া দোজখের চেয়েও বিভীষিকার মৃত্যুভয়াল মরণ ফাঁদ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট দেখে-শুনে পেরিয়ে যাওয়া। মুক্তিদের সাংকেতিক খবর পৌঁছে দেয়া। নেত্রীকে ধরেও কিছুই পাবার সম্ভাবনা নেই। মুক্তি-মাতাও জানে না সন্তানের বিটলামি। খবরের গুরুত্ব ও উৎস তাঁর জানা নেই। এ এক অদ্ভুত মরণ খেলা। নারী না নাগিনী-সাপিনী। যুদ্ধে নারী শক্তির খেলা অনেকের জানা নেই।

বাঘিনী কন্যাদের বাঘের ছোবল থেকে বাঁচালেন। তাদের নিরাপদ স্থানে সরালেন। বোনের গলার ঘের ঘের আওয়াজের টানটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। রোগী কিছুটা ফ্রি ফ্রি বোধ করছে। ২৯ নভেম্বর চিকিৎসা চলছে। সেদিনই সকালে আকস্মিক খবর

এলো চান্দিনা এলাকায় আর্মি নজিরবিহীন বর্বরতায় নেমেছে। মহিচাইলে কার্ফিউ লাগিয়ে মুক্তি খুঁজছে। উন্মাদিনীর মতো মুছিমাতা ২৯ নভেম্বর ছুটে চললেন পেছনে ফেলে আসা অসহায় মুক্তি পুত্রদের পাশে। সব যোগাযোগের দৌত্যকার্য ও সাংগঠনিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ করে দ্রুত ছুটলেন কুমিল্লা।

তোলপাড় কুমিল্লা ঃ এবার সাথে করে মাকে নিয়ে গেলেন জ্যোৎস্না। রিকসায় সদর হাসপাতালের গেইটে পৌঁছুতেই শোনা যায় পারভীনের কাঁপা গলার মা বলে চিৎকার। রিকসাওয়ালাকে তাড়া দেন, শীঘ্র চালান। ঘরে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে ডাক্তারের চেক আপ শেষ। জোয়ানীর সাথে বুড়িকে দেখে ডাক্তারের দ্রুত প্রস্থান। সুন্দরীর উষ্ণ সান্নিধ্য তো আর মিলবে না। ডাক্তার চেক কি আর অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন!! তাই দেখছেন, চেক করছেন লেডি ডাক্তার।

কুমিল্লা এয়ারপোর্ট মুক্তি শেলে সয়লাব। পুরান এয়ারপোর্টের চুলু পারা থেকে আসছে কেবল শেল আর শেল। শেলের ভয়াবহতায় নিজের ৪ মেয়েকে রাখার দুর্ভাবনায় পড়লেন মুক্তি নেত্রী। ২৯ নভেম্বর রাতে ৪ মেয়েকে মুক্তি দুলালের সঙ্গে দিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যানের বাসায় পাঠালেন। এদিকে, নিজেদের থাকা খাওয়ার সমস্যা। আত্মীয়রা ভরসা। জাতীয় দুর্দিনে আত্মীয়রাও সাহায্যে এগিয়ে এলেন। পুরা বাঙালি যেন এক আত্মীয় পরিবার। তাজুল ইসলাম সাহেবের বাসা থেকে সবাই খেয়ে আসতেন। মেহমানদের খানা তাঁরা হাসপাতালেও পৌঁছে দিতেন। নিজের ছোট-মার বাসা থেকে খেয়ে আসতেন। পারভীনের জন্যেও তিনি খানা পাঠাতেন। বিপদে বড় মা-ছোট মা-আপন মা-সৎমা সব একাকার। শেলের জন্য যাতায়াতের বিলম্বে গেস্ট-হোস্ট সবার বিড়ম্বনা।

দুর্যোগের কাল রাত ঘনিয়ে আসছে। দুপক্ষে ব্যাপক হতাহত হচ্ছে। মুক্তি আস্তানায় খবর দেওয়া প্রয়োজন। ৩০ নভেম্বর সকালে মহিচাইল গেলেন জ্যোৎস্না। দৌত্যকার্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সেদিন সন্ধ্যাই ফিরে এলেন। পারভীনের খবর দিয়ে এলেন বাবা ও মুক্তিদের। এসব বিভীষিকায় নিত্য সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধা দুলাল।

মুক্তি ক্যাপ্টেন দেখলো না তার সন্তান ঃ মুক্তি ক্যাপ্টেনের প্রথম সন্তান আসছে। সবাই উদ্বিগ্ন। তার বাবারই খবর নেই। বাড়ি থেকে আসতে আসতে রাত সাড়ে আটটা। হাসপাতালের স্ট্রেচারে প্রায় সাড়ে- নয় পাউন্ডের বাচ্চা। পারভীন-মাতা ভাবগম্ভীর ধ্যানমূর্তি চুপচাপ বসে আছেন। প্রসূতির প্রবল ব্লিডিং। আধা পাউন্ড কটন ব্যবহারেও রক্তপাত থামছেনা। প্রচেষ্টা চলছে। বেহুঁশ হালে ভেলিভারি হলো।

জ্যোৎস্নার জন্যই সিস্টার অপেক্ষা করছেন। তাদের জিজ্ঞাসা, "বাচ্চাকে কি করবেন?" সবাইকে বকশিশ দিতে ভুললেন না। "বাচ্চার টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না। কবর দেবেন" ওয়াদায় স্ট্রেচারে নিয়ে গেলো। ৪ঠা ডিসেম্বর পৃথিবীর মুখ দেখেই মুক্তি কন্যা সবাইকে ছেড়ে চলে গেলো।

ফল তো গেলো গাছ! ৪ঠা ডিসেম্বর সারাদিন মরা নিয়ে গেলো। রোগীর একটু নাড়াচাড়া আছে, কোনো শক্তি নেই। ইনজেকশন ও সেলাইন চলছে-প্রাণের আশা কম। তার খাওয়া নেই।

রাত ১০টা সমাতা জ্যোৎস্না বসে আছেন। পারভীনের প্রথম প্রাণের লক্ষ্মণ নাকানি আওয়াজ- "মা একটু পানি।" আনন্দ ধরে না। সিদ্ধ পানি রেডি। নেকড়ার পানিতে প্রথমে ঠোঁট ভিজিয়ে দিলেন জ্যোৎস্না। ছোট্ট পাখির বাচ্চার মতো যেন ঠোঁট দিয়ে পানি চোষে। হঠাৎ পানি দিলে দম আটকে মরতে পারে তাই সতর্কতা। প্রথমে শুধু জিব নাড়া সার। ধীরে ধীরে ঠোঁট নড়তে সাদা পানি ও গ্লুকোজ দিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর রোগীর বোধ ফিরে আসতে দেখে ডাক্তার খুশি। যুদ্ধের আতংক, শেলের বিভীষিকা, আহত-নিহতদের আনা-নেওয়ায় হাসপাতালে চরম উৎকণ্ঠা। রোগীদের দোতালা থেকে নামান হচ্ছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্লোরিংয়েও স্থান হচ্ছে না। সবাইকে বিদায় দিচ্ছে। ৪ঠা ডিসেম্বরে রোগীর মুখে মা দিলেন কমলার কোয়া। একটু চাখতে সবার আনন্দ। সবাই ছোটমার বাসার খাবার আনন্দে খেলেন। পারভীন একটু উঠে বসতেই সবাইর মুখে হাসি। হাসপাতালে মৃত্যুর শীতল বিভীষিকা। চতুর্দিকে থমথমে পরিবেশ।

এলো ৪ঠা ডিসেম্বর। ইন্দিরার যুদ্ধ ঘোষণার পর শুরু হয় শেল আক্রমণ। হাসপাতালে শেল ফাটছে। অদূরের এয়ার পোর্টের শেলের টুকরা হাসপাতালে পড়ছে। সব রোগীকে বেড থেকে ফ্লোরে নামানো হলো। পারভীনের বেডও নামলো ফ্লোরে। শেলের হাত থেকে রোগীদের বাঁচানোতেই সবাই তটস্থ। সবাই বসে বিনিদ্র রাত কাটালেন। দেশে পুরাদমে যুদ্ধ শুরু। এতোদিন ছিলো মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি আর্মিতে যুদ্ধ। এবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। সবাইর চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কিসের রোগী আর কিসের হাসপাতাল। ৫ ডিসেম্বর হাসপাতালের সবাই রিলিজ। বিশ্বব্যাপী ইন্দিরার সাহসের তারিফ।

মৃত্যুর মুখে বাড়ির পথে ঃ সুন্দরীর সান্নিধ্যে শেষ। ডাক্তারের পাংশু মুখ। ডাক্তার অভয় দিলেন। আর ভয় নেই। উপযুক্ত ডাইটের নির্দেশ। চারদিকে বৃষ্টির মতো শেল। তারই মাঝে প্রাণের দায়ে ঘরমুখো। শহর এখন কসাইখানা। চিরশান্তির নীড় গ্রামে চল। স্কুটারে সবাই চলছেন। ক্যান্টনমেন্টে স্কুটার আকটালো। লটর বটর দেখে পাকিস্তানি-আর্মির প্রাণ ছটর ফটর। বিস্কুটের টিন, পানির বোতল, স্কোয়াশ জাতীয় লাগেজ গজগজ করে সেন্ট্রির নির্দেশ সব কুছ নিকাল-চেক হোগা। মালের চেয়েও তাদের নজর সুন্দরীর দিকে। বড় দুঃসময় পাকিস্তানি আর্মির। সুন্দরীর চেয়েও নিজেদের প্রাণের মায়া তাদের বেশি। নিকট দূরত্বে সশব্দে এক শত্রু শেল ব্রাস্ট হতেই বেবি টেকসিওয়ালাকে এক থাপ্পর দিয়ে শালা ভাগ। আগুনের লেলিহান শিখা, শেলের অগ্নি বৃষ্টির জীবন মৃত্যুর খেলায় মরাটাকে জ্যান্ত করে বাড়ি ফিরলেন জ্যোৎস্না। পাড়ার মানুষের বিস্ময়। মুক্তিরা চরম মুহূর্তে নেত্রীকে কাছে পেলেন।

স্বামীর অপেক্ষায় ঃ দেশ স্বাধীন হলো ১৬ ডিসেম্বর। মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরছেন। যোদ্ধার কথায়, পদশব্দে চকিত হরিণের মতো ইতিউতি চায় পারভীন। বড় আশায় বুক বেঁধে আছে যোদ্ধার স্ত্রী। ক্যাপ্টেন সফিকের কোনোই খবর নেই।

মৃত্যু পাণ্ডুর চোখে অশ্রু ঝরে পারভীনের। কোনো কূলে আশার আলো নেই। হতভাগিনী গিয়ে লুটিয়ে পড়ে জেনারেল ওসমানীর পায়ে। "দেশ স্বাধীনের পর তিনমাস গত হলো। যোদ্ধারা সব ঘরে ফিরেছে। আমার স্বামী কই? মারা গিয়ে থাকলে সহজে আমাকে বলে দিতে দোষ কোথায়?"

ওসমানী ব্যক্তিগতভাবে ক্যাপ্টেন সফিককে চিনতেন। তার যুদ্ধে আহত হবার সংবাদ জানতেন। ক্যাপ্টেন সফিকের কোম্পানির মুক্ত অঞ্চল ওসমানী সফর করেছেন। মিলিশিয়া ক্যাম্পে তিন হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী মুক্তিযোদ্ধা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ক্যাপ্টেনকে পেলেন ব্রিগেড কমান্ডার। সকলকে ছুটি পাঠিয়ে নিজ কমান্ডের সকল যোদ্ধা পরিবারের খবর নিয়ে নিজের পরিবার যদি বেঁচে থাকে তার খবর নেবেন। ক্যাপ্টেনের ধনুর্ভঙ্গপণ। এদিকে স্বাধীনদেশে তার স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়।

তিন হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহীর প্রজ্জ্বলন্ত আগুন ঠাণ্ডা পানিতে নিবিয়ে দিলেন ব্রিগেড কমান্ডার। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনে বিদ্রোহীরা অস্ত্র ত্যাগ করে শান্ত হলো। ক্যাপ্টেন রওয়ানা হলেন ঘরের পানে।

আগন্তুকের আগমন ঃ যোদ্ধার ছোট ভাই চিকিৎসার জন্য পারভীনকে ঢাকা দিয়ে গেলেন। অধীর প্রতীক্ষায় যোদ্ধার নিরাপদ জীবন কামনা করছেন সবাই। যোদ্ধা নেত্রীর স্বামী লন্ডনে। মার্চের শেষ। বাইরের যোদ্ধারা সবাই বিদায় নিয়েছেন। প্রতিবেশী যোদ্ধারা আসছে। তারা নেত্রীকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করেন। একদিন কুল পাড়ছেন। এক দাড়িওয়ালা আগন্তুক এসে পারভীন ও তার স্বামীর খোঁজ নিতে এলেন। জানালেন তাঁরা নেই। জানালেন ক্যাপ্টেন বেঁচে আছেন। তিনি আসবেন। বড় নরম স্থানে ঘা দিয়ে গেল আগন্তুক?

পাগলের আগমন ঃ ঝাল লবণে কুল খাওয়ার স্বাদ বিস্বাদ করে দিয়ে গেলো আগন্তুক। ক্যাপ্টেনের ব্যাটম্যান দাড়িওয়ালা আনুমিয়াও নিজের পয়সা খরচ করে ক্যাপ্টেন পত্নীকে দেখে গেছেন। সে-তো স্বাধীনের আগে। খবর খবরই সার। সে তো আর এলো না। হতভাগিনী দুঃখিনী পারভীনের কান্নাই সার। স্মৃতির মন্দিরে জ্বলে বিস্মৃতির আগুন।

সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে পাগলের পুনরাবির্ভাব। কাঁচা কুল-লবণ-মরিচের চেয়েও তার ঝাল। কাঁধে এক ব্যাগ। পাশের গ্রামের একজন তারে ধরলো গরু দাগানের জন্য। দাড়িওয়ালাকে দেখতে যেন ঠিক গরুদাগানো ঘোষের মতো। সবাই তারে আলা হজরতের মতো সালাম দেয়। সে এক বিদঘুটে কাণ্ড।

জ্যোৎস্নারা পাগলকে দেখে ভূত দেখার ভয়ে আছেন। জ্যান্ত মুক্তিযোদ্ধাকে পেয়ে সবার আনন্দ। এবার বৌ পাগলারে সামলানো দায়। এক বৎসর পর শ্বশুর বাড়ি আসে। বৌ বেঁচে থেকেও গরহাজির। কৌতুকে ছোটবোন ইয়াসমিনের রসিকতা, "আপা মরে গেলে কি করতেন?" পাগলার পাগলামি সবার সামনে শালীকে সশব্দে চুমো খেয়ে, "এক নম্বরে তোমাকে শাদি করতাম।" শালীর রাগ, "আমরা কি আপার স্ট্যান্ড বাই না প্রকসি দিমু" আহারে পাগল, "শ্বশুর বাড়ির তোরা সব এক।" সবার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে যেন নিজে ঠাণ্ডা হয়।

জ্যোৎস্নার স্বগত প্রশান্তি ঃ যোদ্ধাদের সাহায্যের সাথে নিজের ঘরসংসার ভুলে একজন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে রক্ষা করে তার হাতে দেয়ার মধ্যে আমার গৌরব। সময়ে ও শান্তিতে হোমফ্রন্টে মুক্তি যুদ্ধে এখানেই তাদের মাধুর্য।

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET